নারায়ণ সান্যাল

বাঙালিয়ানা

কুন্ডু ক্লাসিক পাঠাগার

www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

আমার কথা

বাংলা বইয়ের ফর্মাগুলি আমার সংগ্রহে আছে। যে বইগুলো আমার পছন্দ এবং ইতিমধ্যে ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো নতুন করে স্ক্যান বা করে পুরোগুলো বা এডিট করে নতুন ভাবে দেবো। যেগুলো পাওয়া যাবেনা, সেগুলো স্ক্যান করে উপহার দেবো। আমার উদ্দেশ্য ব্যবসায়িক নয়। শুধুই বৃহত্তর পাঠকের কাছে বই পড়ার অভ্যেস ধরে রাখা। আমার অগ্রণী বইয়ের সাইট সৃষ্টিকর্তাদের অগ্রিম ধন্যবাদ আনাচ্ছি যাদের বই আমি শেয়ার করব। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বন্ধু অপ্টিমাস প্রাইম ও পি. ব্যান্ডস কে - যারা আমাকে এডিট করা দারুণ ভাবে শিখিয়েছেন। আমাদের আর একটি প্রয়াস পুরোনো বিস্মৃত পত্রিকা নতুন ভাবে ফিরিয়ে আনা। আগ্রহীরা দেখতে পারেন www.dhulokhela.blogspot.in সাইটটি।

আপনাদের কাছে যদি এমন কোনো বইয়ের কপি থাকে এবং তা শেয়ার করতে চান - যোগাযোগ করুন - *subhajit819@gmail.com.*

PDF বই কখনই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না। যদি এই বইটি আপনার ভালো লেগে থাকে, এবং বাজারে হার্ড কপি পাওয়া যায় - তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল। হার্ড কপি যতে নেওয়ার মজা, সুবিধে আমরা মানি। PDF করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষণ এবং দূর দূরান্তের সকল পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

There is no wealth like knowledge, No poverty like ignorance

SUBHAJIT KUNDU

বাঙালিয়ানা

নারায়ণ সান্যাল

করুণা প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৭০০ ০০৯

Bangaliyana *By Narayan Sanyal*
(Assessment of Bengali Culture
& its present day nature)

ISBN : 978-81-8437-216-8

প্রথম প্রকাশ ঃ কলকাতা বইমেলা ২০০৪
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ সেপ্টেম্বর ২০১৩

গ্রন্থক্রমিক ঃ 130

গ্রন্থস্বত্ব ঃ লেখক

প্রকাশক ঃ
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ টেমার লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ ঃ চণ্ডী লাহিড়ী

অলঙ্করণ ঃ চণ্ডী লাহিড়ী, উদয় সেনগুপ্ত, লেখক

বর্ণ গ্রন্থন ঃ
রেজ ডট কম
৪৪/১এ, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর ঃ
তারকেশ্বর প্রেস
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলকাতা-৬

মূল্য ঃ ১০০.০০

নিঃশেষজাড্যাপহ

বুধাগ্রগণ্য মহাপণ্ডিত

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

শ্রীচরণারবিন্দেষু

চারিত্রিক দার্ঢ্যে, ন্যায়ানুবর্তিতায়, নিয়মানুগত্যে এবং সংস্কারমুক্ত মনে তুমি ছিলে খাঁটি ইংরাজ। অথচ পোশাকে-আচরণে, আহারে-বিহারে, দয়ায়-দাক্ষিণ্যে তুমি খাঁটি বাঙালি—সর্বোপরি তোমার হৃদয়টি ছিল পুণ্যসলিলা জাহ্নবীর মতো খাঁটি বাঙালি মায়ের।

একথা বলে গেছেন তোমারই স্নেহধন্য সুহৃদ কপোতাক্ষতীরবাসী মহাকবি।

তাই তোমার উৎক্ষিপ্তশুণ্ড যুগ্মগজরাজপ্রতিম পাদুকাদ্বয়ের একান্তে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি উৎসর্গের আকিঞ্চন এই অকিঞ্চনের।

শ্রীচরণাশ্রিত সারস্বতমন্দির-মার্জনাকারী

শ্রীনারায়ণদাস দেবশর্মণঃ (বাৎস গোত্রস্য সান্যালস্য)

পৌষ সংক্রান্তি ১৪১০
গ্রন্থমেলা ২০০৪

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই :

সত্যকাম

মহাকালের মন্দির

আমি রাসবিহারীকে দেখেছি

মিলনান্তক

অগ্নিকন্যা মমতা

তিমি-তিমিঙ্গিল

বাংলার মাটি, বাংলার জল
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক
হে ভগবান।।
বাংলার ঘর, বাংলার হাট,
বংলার বন, বাংলার মাঠ—
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক
হে ভগবান।।
বাঙালির পণ, বাঙালির আশা,
বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা—
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক
হে ভগবান।।
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন,
বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন—
এক হউক, এক হউক, এক হউক
হে ভগবান।।

"আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না, আড়ম্বর করি, কাজ করি না, যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না, যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না, ভূরি পরিমাণ বাক্যরচনা করিতে পারি, তিল পরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না, আমরা অহঙ্কার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতালাভের চেষ্টা করি না, আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি, পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স এবং নিজের বাকচাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তি বিহ্বল হইয়া ওঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি..."

* * *

পূণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে
হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি তব গৃহ ক্রোড়ে
চিরশিশু করে আর রাখিও না ধরে।
দেশদেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।
পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিও না ভালোছেলে করে।
প্রাণ দিয়ে, দুঃখ সয়ে, আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালোমন্দ সাথে।
শীর্ণ শান্ত সাধু তর পুত্রদের ধরে
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে।
সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি।

॥ কৈফিয়ত ॥

এ গ্রন্থের চারটি রচনাই—তাদের প্রবন্ধ, নিবন্ধ, রম্যরচনা, ছাইপাঁশ যাই বলুন, রচিত হয়েছে একই বছরে, একই মূল সূর্যকে পরিক্রমা করে : বাঙালিয়ানা। নিতান্ত ঘটনাচক্রে। তার মধ্যে তিনটিই সাময়িক পত্র-পত্রিকার ফরমায়েসে। জানি না, শনি-মঙ্গলের কী জাতির চক্করে পড়ে একই সময়ে হঠাৎ ভেঙে গেল বাঙালির কাঁচাঘুম। একের পর এক আমন্ত্রণ এল বাঙালি-জীবনের নানা সমস্যার বিষয়ে লেখার।

প্রথমটি বাস্তুসমস্যা। *দেশ* পাক্ষিক পত্রিকার অনুরোধে। বছরের প্রথম সংখ্যাটিতেই তাঁরা সমস্যা-জর্জরিত বাঙালি-জীবনের নানা বিড়ম্বনার বিষয়ে আলোচনার আয়োজন করেন। 'বাস্তুসমস্যা' তারই অন্যতম অনুক্রম। বিষয়টা শুধু জটিল নয়, শ্লীহাচমৎকারী। বনিয়াদের গভীরে বাস করেন বাবা বাস্তুনাগ। উদ্যত ফণা বিষধর। সাহিত্যিককুলে সাপুড়ে দুর্লভ। তাই ভস্মনিক্ষেপণ-মানসে ডাক পড়ল এই ভগ্নসূর্পের—দীর্ঘ এক কুড়ি-দু'বছর পরে। মার্জারভাগ্যে আবার একবার শিকে ছিঁড়ল।

দ্বিতীয়টির প্রাইম-মুভার *সুখী-গৃহকোণ*। সম্পাদকমণ্ডলীর আশঙ্কা হয়েছে বাঙালি ইদানীং জাতিগতভাবে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে। পড়ছে, কি পড়ছে না, পড়লে কেন এই অধঃপতন, আর কীভাবে সেই অপবাদ দূরীকরণ সম্ভব এটা জানতে তারা উৎসাহী।

তৃতীয়টি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের *মাতৃশক্তি* পত্রিকার সম্পাদক কল্যাণীয় কুশল চৌধুরীর খেয়ালে। সে হঠাৎ বামাক্ষ্যাপা হয়ে ওঠায়। সে জানতে চাইল শ্যামামায়ের ভক্তরা সেকালে কী আহার করতেন, একালেই বা কী খায়। কেন খায় মায়ের কী প্রসাদ তারা খেতে যায়—ভুল করে চায়, পায় না, আর কী খেতে চায় না অথচ রাজনির্দেশে গলাধঃকরণে বাধ্য হয়! কুশলের সেই উচাটন সামলে দিতেই এই দাওয়াই—'বাঙালির খাদ্য-বিহার!'

চতুর্থ রচনাটি অবশ্য কোন সাময়িক পত্রিকা সম্পাদকের উসকানিতে নয়। জনৈক ভারতখ্যাত 'সাম্প্রদায়িক' বঙ্গসন্তানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশে উদযোগী হয়ে পড়েন কিছু বিদগ্ধ বুধ—বুদ্ধিজীবী বাঙালি। যাঁরা মহাকালীপূজার রাত্রে মাত্রাতিরিক্ত কারণবারি সেবনান্তে তূরীয় হয়ে পড়েননি—কোনও ইজম্-চক্রে নাম লেখাননি। তাঁদেরই অনুরোধে সেই বাঙালি শহিদের প্রতি ওটি আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য।

করুণা প্রকাশনীর বন্ধুবর বামাচরণ এই চারটি রচনাকে একসূত্রে বেঁধে দিতে চাইল।

মহামতি ফ্যুরারের ইহুদি-নিধন মহাযজ্ঞের কুম্ভিপাক থেকে মুক্তি পেয়েই ভেবেছিলাম বাসু-সাহেবের দ্বারস্থ হব। আমাদের এন্-এথ্তমা ঠাম্মার একটা হিল্লে করতে। দীর্ঘ চৌদ্দ বছর ধরে তিনি কাশীনরেশের কারাগারে বন্দিনী। তাঁর জন্য একটা 'হেবিয়াস-কর্পাস' দরখাস্ত বানাবার আবেদন করব ভাবছিলাম। হল না। বঙ্গজননীর 'সাত' কোটি (না, ভুল হল—মা ষষ্ঠীর কৃপায় 'গোত্রং নঃ বর্ধতাম্' মন্ত্র জপতে জপতে আমরা অন্তত এই একটি ব্যাপারে প্রায় তিনগুণ সাফল্য লাভ করেছি) সন্তানের সমস্যাচক্করে পড়ে গেলাম। আপনাদের বিড়ম্বনা বৃদ্ধি পেল। আমারও। প্রতি সপ্তাহে পত্রে, দূরভাষণে ক্রমাগত তাগাদা পাই। পথে- ঘাটে, সভা-সমিতিতে নিত্য গঞ্জনা সইতে হয় : মা আর কদ্দিন বন্দিনী থাকবেন?

কী জানেন? আমার রূপমঞ্জরী মা তো দুশো বছর আগেই স্বর্গলাভ করেছেন। আর আমার বাঙালি ভাই-বোন, নাতি-নাতনিরা সব যন্ত্রণা, সব গঞ্জনা সহ্য করেও টিকে আছে। মরেও তারা শ্মশানে যাবার সুযোগ পায় না, যদি গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা গোটা সড়ক জুড়ে 'মানছি না, মানব না' হাঁকাড় পাড়তে পাড়তে চলতে থাকেন। তাই এই ধাষ্টামো!

পারলে ক্ষমা-ঘেন্না করে আমাকে মার্জনা করবেন।

বারিন্দিরদের বদনাম আছে। সুযোগ পেলেই বারিন্দিরকে লেঙ্গি মারার বিষয়ে। বন্ধুবর চণ্ডী লাহিড়ী বারিন্দিরকুলের এক ব্যতিক্রম। লেখার আকর্ষণে হোক-না-হোক কার্টুন দেখার লোভেও আপনাদের এ বইয়ের পাতা ওল্টাতে হবে।

কল্যাণীয়া চিত্রা-মা তার খুড়-শ্বশুরকে যথাযথ সম্মান জানিয়ে সবিনয়ে লেখকের কিছু বর্ণাশুদ্ধি ও বর্ণনাশুদ্ধি মার্জনা করেছে। তাকে জানাই আশীর্বাদ।

আর আছেন আমার যাবতীয় সারস্বত পূজা-আয়োজনের কাঁঠালি কলা। আমাকে ধাঁধায় পড়তে দেখলেই তিনি নানান প্রামাণ্যগ্রন্থের গন্ধমাদনসহ হাজির হন। প্রথমেই একটি চতুষ্কোণ বাক্স আমার নাকের ডগায় বাড়িয়ে ধরে বলেন, 'সবার আগে বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁওয়া দিয়ে নিন, ছোটমামু!'

আপনাদের ভালো লাগুক না লাগুক আমি কিন্তু লেখক হিসাবে তৃপ্ত। আজ্ঞে না, রচনা-চতুষ্টয়ের জন্য নয়—উৎসর্গপত্রটি রচনার সুযোগ লাভে।

একশ উনত্রিশখানা আবোল-তাবোল লেখার পরে হঠাৎ খেয়াল হল; বাঙলা-ভাষার জনককে তো অ্যাদ্দিন আমার শ্রদ্ধানম্র সাষ্টাঙ্গ প্রণামটা জানানো হয়নি।

শ্যামাপূজা — নারায়ণ সান্যাল

১৪১০

বাঙালির বাস্তুসমস্যা

বিগত সহস্রাব্দে বাঙালির জীবনযাত্রায় হরেক কিসিমের সমস্যার উদয় হয়েছে বটে, কিন্তু গৃহসমস্যাটা ছিল নিতান্ত গৌণ। হয়তো তা ছিল ব্যতিক্রমী বাঙালির বদনসিবে। তা এখনকার মতো সর্বগ্রাসী ছিল না। চর্যাপদের যুগে ধরুন, পদকর্তারা দুগ্ধসযুক্তা 'ওগ্গর ভত্তা'র কথা বলেছেন। তা ঘৃত সুরভিত এবং মৌরলা-মৎস্য সংযুক্ত হবার কথাও। ফলে শুধু অন্নচিন্তা চমৎকারা নয়, ঘৃত এবং মৎস্যসমস্যাও ছিল; কিন্তু গৃহসমস্যার কোনও ইঙ্গিত চর্যাপদে পাইনি। তারও পূর্ব যুগে বকধার্মিকের সওয়ালের জবাবে ধর্মপুত্র সুখী মানুষের প্রসঙ্গে অঋণী, অপ্রবাসী, শাকান্নসেবীর কথা বলেছেন, কিন্তু 'শয়নং হট্টমন্দিরে' না হবার প্রসঙ্গ তোলেননি। আবার আজ থেকে আড়াইশ বছর আগে লক্ষ্য করে দেখুন, ঈশ্বরী পাটনী স্বয়ং ঈশ্বরীর কাছে কী প্রার্থনা করেছিল? 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'। মাথার উপর ছাদের কথা কি তিনি বলেছিলেন? সুতরাং আপনাকে মানতেই হবে গৃহসমস্যাটা নিতান্ত হাল আমলের এক উটকো আপদ—বিন লাদেন, সন্ত্রাসবাদ বা এড্‌স্‌-এর মতো। ধরুন বাঙালির জীবনযাত্রার বার্ষিক অকালবোধন ব্যাপারটা তো স্মরণাতীত কালের ঐতিহ্যবাহী। বছর বছর মা দুর্গার কাছে আমরা চরম হ্যাংলামি করে এসেছি। মহালয়ার দিন মায়ের কাছে কী না চেয়েছি! ধন চেয়েছি, মান চেয়েছি, রূপ-জয়-যশ (মায়, মনে মনে টুকটুকে একটা বউ পর্যন্ত) চেয়েছি। চাওয়ার যেন আর অন্ত নেই! কিন্তু একটা তিন-কামরার নিজস্ব অ্যাপার্টমেন্ট? চেয়েছি? নেভার!

স্বাধীনতার পূর্ব যুগে কবিপত্নীকে—হ্যাঁ, মনে আছে—একবার নথনাড়া দিতে দেখেছিলাম, 'মাথার উপরে বাড়ি পড় পড় তার খোঁজ রাখ কি?'

না, রাখেন না। কবির তাতে ভ্রূক্ষেপই নেই। রুফট্রার্স-এর বিমবরগাগুলো উই পোকায় ঝরঝরে করে দিল কি না নজরেই পড়ে না। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য; 'দু-একটি কাঁটা করি দিব দূর তার পর ছুটি নিব।'

কবির রচনায় যে 'একটুকু বাসা'র কথা হয়েছে সেটা নেহাতই কাব্যোচ্ছ্বাস। কবিকল্পনার ভাপে ভরা ফানুস! সে বাসা ইট-কাঠ সিমেন্টের নয়, সেটা "চলতি মুহূর্তের খসে-পড়া উড়ে আসা সঞ্চয় দিয়ে গাঁথা, তার মূল্য ছিল তার রচনায়, নয় তার বস্তুতে!"

অর্থাৎ সে বাসা : ভালবাসা! মাথা নয়, মন গোঁজার ঠাঁই!

এটাই তো স্বাভাবিক। এন্তাই তো হোন্দাই রহ্‌তা। তার হেতু বাঙালিকে প্রতিটি প্রজন্মে মাথা-গোঁজার কথা চিন্তা করতে হয়নি। কেন হবে? সে চিন্তা তো চিন্তামণির আশীর্বাদে, আর সাতপুরুষের হাতযশে বহু পূর্বেই সমূলে উৎপাটিত। 'সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ' সে জমিটাই শুধু নয়, সেই ভিটেখানিও যে সোনার বাড়া! মাঝে-মাঝে দেওয়ালে গোবরমাটির প্রলেপ দাও, উঠান নিকিয়ে শঙ্খলতার আলপনা আঁকো—এসব কাজ মা-বোনেরা বা গৃহস্বামিনী স্বহস্তে করতেন; দিনমজুর লাগিয়ে নয়; আর কালবৈশাখী শুরু হবার আগেই বাড়ির পাগড়িতে কিছু পালক—'পোয়ালগুছি'র জোগান দেওয়া—ব্যস! বাস্তুসমস্যা খতম। ভিতের নিচে সাতপুরুষ ধরে বাস্তুনাগ আছেন, বছর-বছর হালখাতায় 'বাস্তুপুরুষায় নমঃ' বলে ফুল বেলপাতার অঞ্জলি দেওয়া হয়, মাধবী বেড়ার কিনার ঘেঁষে নিপুণ হাতে আলপনা আঁকা তুলসীমঞ্চে স্বয়ং নারায়ণ আছেন, গোটা কার্তিক মাস ধরে গোধূলিবেলায় আকাশে মিটমিটে আলোয় প্রয়াত পূর্বপুরুষেরা লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে 'অ্যানুয়াল ইন্সপেক্‌শন' করে যান—তাহলে বাস্তুসমস্যাটা থাকবে কেমন করে?

গত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে, অর্থাৎ স্বাধীনতার ঊষাযুগ থেকে দৈত্যটা গোটা ভারতেই মাথাচাড়া দিতে শুরু করে। সমস্যার দৌড়ে সে তখন তিন নম্বর দৌড়বীর। 'রোটি' আর 'কাপড়া'র ঠিক পরেই ছুটছে তখন তৃতীয় প্রতিযোগী : 'মোকান'। কিন্তু সেটা হিন্দি বলয়ে। বাস্তুচ্যুত

বাঙালির পোড়া কপালে দেখ্-না-দেখ্ সেটাই হয়ে উঠল প্রধানতম সমস্যা। 'রুটি' না হলে উপোস দেওয়া যায়, স্বর্ণপ্রসূ বাঙালির দগ্ধললাটে সে রুটিহীনতা তো বাঁধা রুটিন ; 'কাপড়া' না হলেও সেলাই করে লজ্জা-নিবারণ সম্ভব। সমকালীন ছায়াছবি 'উদয়ের পথে'-তে যাকে বলা হয়েছিল 'সূচের মতো সামান্য অস্ত্র দিয়ে দারিদ্র্য-দৈত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।' গোলিয়াথের বিরুদ্ধে ডেভিডের মতো তা করে যেতেন সে যুগের উদ্বাস্তু মা-বোনেরা। কিন্তু নিরাপদ আশ্রয় না হলে সোমত্থ মেয়ে, সদ্যজননী পুত্রবধূকে নিয়ে কেমন করে বাস করবেন গাছতলায়? বেনাপোলে, বিভিন্ন বর্ডারের গাছতলায় এই মর্মান্তিক প্রশ্নটি স্বকর্ণে শুনেছি—বারেবারে—পাঁচ-ছয় দশক পূর্বে। বাঙালির 'একটুকু বাসা'র সেই প্রথম আঁতুড় ঘরের আতুর আর্তনাদ।

রাজাজির সহজ সমাধান-সূত্রটাই মেনে নিল কংগ্রেস। বাংলা আর পঞ্জাবের জোড়াপাঁঠা বলি দিয়ে আধ-আধখানা দিয়ে দাও জিন্নাসাহেবকে। ব্যস্! তাহলেই বাকি ভারত ঝড়াক্‌সে আজাদি পেয়ে যাবে। তাই পেল। তাতে অবশ্য গোটা ভারতে গৃহসমস্যা দেখা দেয়নি। এমন কী পঞ্জাবেও নয়। পশ্চিম পঞ্জাব থেকে যখন গৃহহারার দল কাতারে-কাতারে এপারে চলে এল তখন এপারবাসীও নিল পাল্টা ব্যবস্থা। পূর্ব পঞ্জাবের 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'-এর দল জান-মান নিয়ে চলে গেল ওপারে। জমি-বাড়ি ফেলে। তাই পূর্ব পঞ্জাবে জমি বা গৃহসমস্যা দেখা দেয়নি আদৌ—স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে।

সমগ্র ভারতের মধ্যে শুধু পশ্চিম বাংলা—একমাত্র পশ্চিম বাংলা—দধীচির ভূমিকাটা অভিনয় করে গেল। পশ্চিম বাংলায় জমি হয়ে গেল অর্ধেক, লোকসংখ্যা দ্বিগুণ। আশ্চর্য! পরম আশ্চর্য! নবাগতদের জবরদখলের কারণে এপার-বাংলায় কোথাও মারদাঙ্গা হল না। এপার বাংলার বাঙালি পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সঙ্গে অন্নপান ভাগ করে খেতে রাজি হয়ে গেল। হাসিমুখে নয়, কান্নায় ভেসে। গাঁধীজি অস্বীকৃত এবং নেতাজি অনুপস্থিত থাকায় যে ভদ্রলোক সদ্য-স্বাধীন ভারতের গদিতে উঠে বসলেন সেই দেবরাজ ইন্দ্রের হাতে তখন নিরঙ্কুশ বজ্র। নেতাজির

মৃত্যু রটনা প্রতিষ্ঠিত করা অথবা শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু ত্বরান্বিত করতে বজ্রধর তখন বদ্ধপরিকর। এদিকে পাঁজরা হারিয়ে দধীচিমুনি তখন ধুঁকছে—পেট্রোপোলে, বেনাপোলের উদ্বাস্তু শিবিরে, অসংখ্য পি. এল. ক্যাম্পে। আগেই বলেছি, বাঙালির গৃহসমস্যার সেটাই সূত্রপাত।

গৃহের ন্যূনতম মান কত? মানছি, সেটা নির্ভর করে গৃহবাসীর সংখ্যার উপর। কিন্তু বাস্তুশাস্ত্র মতে মাথাপিছু কতটা? টলস্টয় বলেছিলেন, চার হাত বাই দু' হাত। সেটা আখেরি হিসাব। তাছাড়া টলস্টয় বাস্তুকার ছিলেন না। আমার ঠাম্মাও তা ছিলেন না অবশ্য। তবে আমার নিকারবোকার-যুগে তিনি এ বিষয়ে একটি জব্বর গল্প শুনিয়েছিলেন। প্রথমে আপনাদের সঙ্গে সেই গল্পটা ভাগ করে নিই বরং :

ভূষণের অনেকগুলি পুষ্যি। ছেলে-মেয়ে-বোন-গিন্নি। এছাড়া একটি গরু, দুটি ছাগল, গোটা চারেক হাঁস। কিন্তু ঘর বেচারির একটিই। ভূষণের ভা—রি ইচ্ছে আর একখানা ঘর তোলার। এ ঘরে থাকবে ওরা দুজন, আর ও-ঘরে খোকাখুকু আর তাদের মা—থুড়ি, পিসি। কিন্তু তার নুন-আনতে পান্তা ফুরানোর সংসারে সেটা কিছুতেই হয়ে ওঠে না। শেষমেশ সে তার গুরুদেবকে ধরে পড়ল, 'ঠাউর, য্যামন-ত্যামন করি—এক্‌খান ঘর তুলি দাও কেনে। এই অ্যাকটিমাত্তর ঘরে পরানডা দিনরাত ঘাই দিয়ে দিয়ে ওঠে, জালে-পড়া কাতল মাছের পারা।'

গুরু সব দেখলেন। শুনলেন। শেষে বললেন, 'তোর ঘর আমি করে দেব। তবে পুরো একটি বছর তোকে আমার কথামতো চলতে হবে।'

এক বছরের মধ্যেই আর একখানা ঘর হয়ে যাবে শুনে ভূষণ তো আহ্লাদে আটখানা। হাত দুটি জোড় করে বলে, আদেশ কর প্রভু!

—'প্রথম কথা, গোরুটিকে তুই গাছতলায় বেঁধে রাখিস না। হাজার হোক, মা ভগবতী বলে কথা। আপাতত ওঁকে তোর ঘরের একপাশে ঠাঁই দে। আমি তিন মাস পরে আবার আসব।'

ভূষণ গুরুদেবের কথা শোনে। গোরুটিকেও ঠাঁই দেয় ঘরে। ফলে তার কষ্ট বেড়ে যায়। তিন মাস পরে গুরু এলেন। ভূষণ শুধায়, 'আমার ঘর?'

—'হবে। বলেছিলাম না একটি বছর তোকে সাধনা করতে হবে।'

—'তা তো বলিছিলে। কিন্তু জপতপের মন্তর তো কিছু বল নাই?'

—'বলব। এখন নয়। তবে ছাগল দুটোকে তুই বাইরে রাখিস না ভূষণ। অবোলা জীব। ও দুটোকে তোর ঘরের একটেরে থাকতে দিস। আমি মাস তিনেক পরে আবার আসব।'

ঘরে এমনিতে ঠেলাঠেলি। তবু ছাগল দুটোকে ঘরেই ঠাঁই দেয় ভূষণ। কেষ্ট পেতে হলে কষ্ট করতে হবে বইকি! এক বছরের ভিতর পাঁচ ছয় মাস তো কেটেই গেছে। মাস তিনেক পরে গুরুদেব আবার এলেন। ভূষণ হুমড়ি খেয়ে পড়ে : 'ঠাউর.....'

'ঘর তো? এই হয়ে এল বলে! কিন্তু হ্যাঁ রে! হাঁসগুলোকে তুই কোন্-আক্কেলে বাইরে রেখেছিস? কেষ্টর জীব! কোন্‌দিন শেয়ালের পেটে যাবে! ওগুলোকেও তোর ঘরের একটেরে থাকতে দিস।'

এবার ভূষণের প্রাণ ওষ্ঠাগত। ছেলে-মেয়ে-বোন-বউ, তার উপর গোরু-ছাগল-হাঁস!

এবার গুরু এলে ভূষণ তাঁর ঠ্যাঙ জোড়া জড়িয়ে ধরে : 'ঠাউর! তুমি না দেখ্‌লি অ্যাক্কেরে মইরে যাব। আমার আর একখান্....'

—'হচ্ছে হচ্ছে। ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? আচ্ছা, তুই এক কাজ কর, এবার তোর ঘর থেকে গোরু-ছাগল-হাঁসদের বার করে দে দেখি।'

ভূষণ তাই দিলে। ফাঁকা ঘরখানা ফিরে পেয়ে ভূষণ হাত-পা ছড়িয়ে সটান শুয়ে পড়ে। অনেক-অনেকদিন পর।

গুরু বললেন, 'এবার বল, কোন্‌বাগে তোর নতুন ঘরটা তুলতে চাস্?'

ভূষণ একগাল হেসে বলে, 'ঘর? ঘর নে কি ধুয়ি খাব ঠাউর! আর আমার ঘরের প্রেয়জন নাই!'

ভূষণ মোড়লের দু-নম্বর ঘরের প্রয়োজনই হয়নি আর।

ঠাম্মার গল্পটা এইপারের, টলস্টয়ের মতো হেইপারের নয়।

কংসারির পদপ্রান্তে প্রণত মানুষটার চার-বাই-দুই হাত জমিই যথেষ্ট—ওই চিতাটা সাজাতে যতটা জমি লাগে আর কী! সংসারী মানুষের তা নয়। তার বেলা সেটা তার অভাববোধের অনুভবের অনুপাতে।

এককালে আমরা সবাই একসঙ্গে ছিলাম—বিশ্বাস করুন! বড়দা-মেজদা-সেজদা-ন'দা-ফুলদা-ছোড়দা। জাঠতুতো-খুড়তুতো মিলেমিশে। জেঠা-বাবা-বড়কাকা-সেজকাকা-ছোটকাকা তাঁদের উপার্জনের একটা বৃকোদরভাগ মাসের প্রথম সপ্তাহেই জমা দিতেন 'দাদুর দস্তানায়।' কে যে কতটা দিচ্ছেন তা জানতেন শুধু তিনি আর দাদু। মায় জেঠিমা-মা-খুড়িমার হিম্মত ছিল না সে বিষয়ে প্রশ্ন করার। যাবতীয় ব্যবস্থাপনা দাদুর। তাঁর বউমাদের শাড়ি, নাতি-নাতনিদের ইজের-জামা, সব একজাতির, এক দামের। থান কেটে বাড়িতে দর্জি ডেকে বানানো। তবে হ্যাঁ, মুখে-মাখার ওইসব হাবিজাবি বউমায়েরাই কিনতেন, নিজ নিজ কর্তার মাধ্যমে। মাসকাবারি বাজার আসত দাদু-দিদার ব্যবস্থাপনায়। দৈনিক বাজার করতাম আমরা—বড়দা থেকে ছোড়দা ইস্তক। আম্মো। বাবা-কাকারা নন। হিসেব বুঝিয়ে দিতে হত দাদুকে। রান্নাঘরের যাবতীয় দায়িত্ব পালা করে সারতেন মা-জেঠিমা-খুড়িমা। তরকারি কোটা, রান্না করা, পরিবেশন করা। কিন্তু বাসন মাজা, ঘর মোছা, কাপড়কাচার দায়িত্ব ছিল মাসিদের—না, রক্তের সম্পর্ক ছিল না তাঁদের সঙ্গে। তাঁরা কাজের

লোক। তবু বয়স অনুপাতে আমাদের দিদা, মাসি বা দিদি। যৌথ সংসারে তাঁদের যে কী মর্যাদা ছিল তাও দেখতে পাবেন শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে—ধরুন 'বিপ্রদাস'-এ। মাসিরা তো স্কুলে যেত না, তাদের কাজ ছিল কুচো-কাচাগুলোর দেখভাল করা—তাদের নাওয়ানো, খাওয়ানো, চুল আঁচড়ানো, পাঠশালায় পাঠানো। মায় সাতসকালে তাদের চিরতার রস খাওয়ানো। চিরকালের এই যৌথ পরিবারে ফাটল ধরল নানান হেতুতে। প্রাকস্বাধীনতা যুগেই। দু-ভাইয়ের উপার্জনের বৈষম্যটা গোপন রাখা গেল না। অনেক ক্ষেত্রে দাদু দিদারা দায়মুক্ত হবার আগেই। এ ছবিও শরৎচন্দ্র এঁকেছেন বারে বারে—*নিষ্কৃতি, মামলার ফল, রামের সুমতি, বৈকুণ্ঠের উইলে।*

যৌথ সংসার ভেঙে যাওয়ার আরও একটি কারণ ঘটল। গ্রামবাংলার মানুষকে নানান কারণে ক্রমশ শহরমুখী হতে হল। শহুরে চাকরির ধান্দায়। অফিস-আদালত, ইস্কুল মাস্টারি, সরকারি চাকরি, নানান ফৈজতে। আশ্রয় নিতে হল মেসবাড়িতে। সপ্তাহের পাঁচটা রাত কাটে মেসের তক্তাপোশে সতরঞ্জি পেতে, বাকি দু রাত গৃহিণীর গভীর আলিঙ্গনপাশে। ওই 'গৃহমুচ্যতে'ই গৃহের স্বপ্নটা প্রথম জাগরিত করল। বাঙালি নিজস্ব একখানি বাড়ির স্বপ্ন দেখতে শুরু করল। একা নয়, দুজনে মিলে। একই বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে কষ্টে-সৃষ্টে পয়সা জমিয়ে, তিন-সাড়ে তিন কাঠা জমি, একটা ছোট্ট বাড়ি। না হয় টালির শেডই হল, তাও যদি না হয় তবে খাপ্‌রা টালির—ওই যাকে বলে নুড়িয়া টালি। তবে হ্যাঁ, সেপ্‌টিক ট্যাঙ্ক একটা বানাতেই হবে। গাঁ-ঘর তো নয় যে, বাঁশঝাড়ের পিছন বাগে যাওয়া যাবে রাত বিরেতে। বাড়ির সামনে একটা ছোট্ট-বাগান চাই। গোলাপ বা চন্দ্রমল্লিকা নয়, বেল, জুঁই, মালতী, মাধবী। গাঁ-ঘরে যাদের সঙ্গে মিতালি ছিল। ভিতরের উঠোনে চাই একটা ছোট্ট তুলসীমঞ্চ। কিন্তু বল্‌-বল্‌তেই কি নিজের জমি, নিজের বাড়ি হয়? সপ্তাহান্তের বিড়ম্বনা এড়াতে খুঁজে-পেতে ভাড়া নিতে হল শহরতলিতেই একটা ছোট্ট আস্তানা : একটুকু বাসা।

এখন আর সপ্তাহান্ত নয়, দিনান্তের ডেলিপাষণ্ডগিরি। দু-দশ বছরে তাও অসহ্য হয়ে ওঠে। দিনের মধ্যে তিন-তিন ছয় ঘণ্টা কেটে যায়

বাসে-ট্রেনে—জায়গা-দখলের ঠেলাঠেলিতে। দৈনিক ছয় ঘণ্টা মানে দিনের এক-চতুর্থাংশ। কোনও মানে হয়! চল্লিশটা বছর চাকরি করলে না হোক দশটা বছর বেহুদ্দো খরচা হবে ডেলিপাষণ্ডগিরিতে। শহরতলির ছোট্ট বাগান-ওয়ালা ভাড়া বাড়িটার মায়া ত্যাগ করে চলে আসতে হল শহরে। সব খুইয়ে এসে আশ্রয় নিতে হল শহরের এক-কামরা পায়রাখোপে। হয়তো জল নিয়ে আসতে হয় রাস্তার কল থেকে, হয়তো বাথরুমটা ভাগের-মা! এ কি মানুষে সহ্য করতে পারে? শহরতলির একচিলতে বাগানওয়ালা বাড়িটার জন্য মাঝে-মাঝে মন কেমন করে!

বছর-কয়েক ওই ইঁদুরের গর্তে কাটিয়ে হাঁপিয়ে উঠল প্রাণ।

ভূষণ মোড়লের মতো বুকের মাঝখানে হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন জালে আটকানো মাছের মতো ঘাই দিয়ে দিয়ে উঠতে থাকে।

এতদিনে চাকরিটা পাকা হয়েছে। অফিস থেকে কিছুটা ঋণ নিয়ে আবার শহরতলির দিকে চলে আসা গেল। এবার জমি কিনে ছোট্ট নিজের বাড়ি : 'একটুকু বাসা'। আবার ডেলি-প্যাসেঞ্জারি। তা হোক, অবসর নেবার দিনও তো ঘনিয়ে আসছে। শহরের খুপরি ঘর ছেড়ে এখন শহরতলিতে দু-কামরা ঘরও তো হয়েছে। এ-ঘরে ওঁরা কর্তাগিন্নি, ও-ঘরে খোকাখুকু আর তাদের মা—থুড়ি, আবার একই ভুল, মা নয়। পিসি।

এই ছবিটা পালটাতে শুরু করল ষাটের দশক থেকে। শহরে এবং শহরতলিতে গজিয়ে উঠতে থাকে নানান হাউসিং এস্টেট। কোনওটা দু-কামরা, কোনওটা তিন কামরা। বাঙালির জীবনযাত্রায় শুরু হল নতুন পর্যায় : ফ্ল্যাট-কালচার।

তিন-চারতলা তোড়াবাঁধা একগুচ্ছ পাশাপাশি বাড়ি। মাঝখানে এক চিলতে একটা পার্ক। এককালে তা ছিল সবুজ। এখন ধূসর। একটেরে মার্কেটিং কমপ্লেক্স। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার সময় দেখতে পাবেন প্রতিটি ল্যান্ডিং-এ একটা করে সদর দরজা। কখনও বা এক জোড়া। গায়ে মালিকের নাম লেখা। 'মালিক' মানে সাময়িক বাসিন্দা। ফ্ল্যাট-চৌহদ্দির মধ্যেই তার ঘেরাটোপ কেরামতি। এমনকী এজমালি ছাদে যেতে হলে ম্যানেজারের কাছে চাবি চাইতে হয়।

হারিয়ে গেল মফস্বলের সেই একচিলতে ছোট্ট বাগানটা—পূজার ঘর, তুলসীমঞ্চ, মাধবীবেড়া, আকাশে-দৃষ্টিমেলা আঙিনা। তবে সবটাই লোকসান নয়। বিদায় হল উনুনের ধোঁয়া, পোর্টেবল গ্যাসের আগমনে। রাতবিরেতে টর্চ হাতে গা-ছমছম উঠোন ডিঙিয়ে যেতে হয় না প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে। এল আরও কত নতুন মজা। কর্তারা অফিস-কাছারিতে বেরিয়ে গেলেই বসে মহিলামহলের মজাদার মজলিশ। আলোচনার বিষয়বস্তু অবশ্য সীমিত : শ্বাশুড়ি-ননদ-জা, উত্তম-সুচিত্রা, শাড়ি-ব্লাউজ, আর 'আমার ছেলেটা যে কী বাঁদরই হয়েছে।'

মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনে সর্বগ্রাসী 'টিভি কালচার' তখনও অনাগত। গড়ে উঠল ক্লাব, লাইব্রেরি, মহিলা-সংগঠন। পাঁচ বাড়ির যৌথ উদ্যোগে নানান জাতির 'ফাংশন'। এলাকার উদীয়মান কবি, আবৃত্তিকার, গায়িকার দল স্টেজে ওঠার সুযোগ পেল। শুরু হল চাঁদা তুলে সর্বজনীন পুজো। সরস্বতী, কালীমাঈ, শেষমেশ দশভুজা। কলকাতার আর্থসামাজিক জীবন তখনও বিকিয়ে যায়নি। ফলে ষাটের দশকে কোনও হাউসিং এস্টেটে

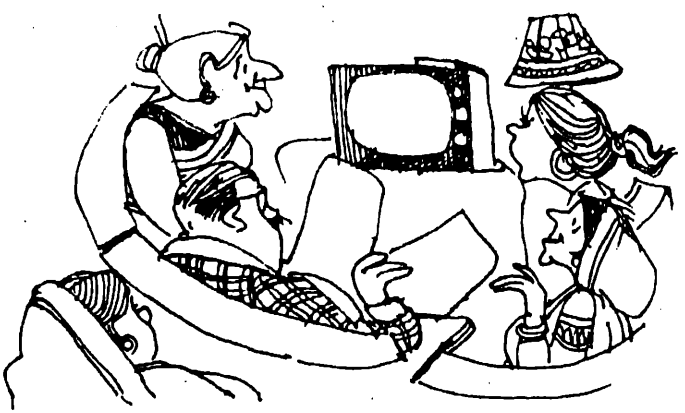

গণেশ পূজা হতে দেখিনি। ফ্ল্যাট-কালচারের মাধ্যমে বাঙালি যৌথ জীবনযাত্রার একটার নতুন স্বাদ পেল। গাঁ-ঘরে সবকিছু ছিল কেমন যেন ছাড়া-ছাড়া, এখানে পাড়া-ভিত্তিক নৈকট্যটা নিবিড়।

সত্তরের দশকে ফ্ল্যাট-কালচার থেকে বাঙালির উত্তরণ ঘটল

অ্যাপার্টমেন্ট-কালচারে। একই সময়ে দূরাগত সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের মতো শোনা গেল এক বিদেশি দৈত্যের হুঙ্কার : টি. ভি.। বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবন তার ক্রীতদাসত্ব স্বীকার করে নিল। ঘরে-ঘরে টিভির দখলদারি ঘোষিত হল গৃহশীর্ষের অ্যান্টেনায়-অ্যান্টেনায়—সেই যেখানে এককালে আকাশপিদিম জ্বলত!

ফ্ল্যাট আর অ্যাপার্টমেন্টের মধ্যে ফারাকটা কোথায়? 'বাসা' আর 'বাড়ি'র মধ্যে যে তফাত সেইটুকুই। আভিধানিক নির্দেশে হয়তো এরা সমার্থক। কিন্তু ব্যবহারিক প্রয়োগে 'বাসা'র সঙ্গে 'মালিকানা' আবশ্যিকভাবে সংশ্লিষ্ট নয়। 'বাড়ি' বলতে বুঝি সেটা ভাড়া নেওয়া নয়। বাড়ির বাসিন্দা তার মালিক। 'ফ্ল্যাট' বললে মনের চোখে ভেসে ওঠে চুনকাম করা দেওয়াল, আই. পি. এস. মেঝে, টয়লেটে জমি-সই সই ইন্ডিয়ান প্যান। আর অ্যাপার্টমেন্ট শুনলেই ধরে নিই : ডিস্‌টেম্পার করা দেওয়াল, মেঝেতে মোজেইক, টয়লেটে কমোড তথা গিজার। এটা প্রচলিত ধারণা। অফিসে যেমন বড়বাবুর পরিধানে ধুতি, ছোটসাহেবের পরিধানে প্যান্ট-শার্ট প্রত্যাশিত। এ কোনও অলঙ্ঘ্য আইন নয় তা বলে। বড়বাবুও প্যান্ট-শার্ট পরে অফিসে আসতে পারেন, যেমন ছোটসাহেবও— না, তা বোধহয় স্যার পরেন না, মানে পারেন না। দুশ' বছর গোলামির অভ্যাসে ওটায় আজও প্রেস্টিজ ঢিলে হয়ে যায়।

তেমনই ফ্ল্যাট বাড়িতেও থাকতে পারে ডিস্‌টেম্পার করা দেওয়াল। টয়লেটে কমোড! কিন্তু অ্যাপার্টমেন্টে ইন্ডিয়ান-টাইপ জমি-সই-সই প্যান? দ্যাট্‌স্ অ্যাবসার্ড! হয় না। গুডফ্রাইডের ছুটিটা রোববারে পড়ে নষ্ট হওয়ার মতো।

পার্থক্যটা কিন্তু সেখানে নয়। পার্থক্যটা স্পেসিফিকেশন নির্ভর নয়, প্রোপাইটারশিপে। প্রভেদটা মালিকানাভিত্তিক। ফ্ল্যাটের বাসিন্দা হতে পারেন মালিক অথবা ভাড়াটিয়া। কিন্তু অ্যাপার্টমেন্ট আবশ্যিকভাবে মালিকানাভিত্তিক। অর্থমূল্যে ক্রয়ের পরেও তাঁকে একটা মাসিক পেমেন্ট করতে হয়, যৌথ ব্যবস্থাপনার জন্য : পাম্প, লিফ্‌ট্, দারোয়ান, জমাদার, মেরামতি।

অ্যাপার্টমেন্টের পেমেন্ট সচরাচর ইন্সটলমেন্টে।

ক্ষেত্রবিশেষে অ্যাপার্টমেন্টের হবু মালিক স্পেসিফিকেশন নিজ অর্থ বিনিয়োগ করে কিছুটা বদলও করতে পারেন। মোজেইক টালির বদলে মার্বেল, অথবা এ. সি. প্ল্যান্ট ইত্যাদি।

বাঙালির জীবন থেকে যৌথ পরিবার তো কবেই ফৌত হয়েছে। গড়ে উঠেছে ছোট-ছোট নিউক্লিয়ার পরিবার। দুটি ইলেকট্রন, একটি প্রোটন। ড্যাড-মম আর বেবি। বেবি ইউজুয়ালি একটি—ছোট পরিবার ইজ সুখী পরিবার, য়ু নো!

সুখী? কী জানি! 'সুখ' কাকে বলে গো? সেটা 'আনন্দ'র সমার্থক নয় নিশ্চয়!

সাবেকি যৌথ পরিবার ছিল কেন্দ্রমুখী। বহির্মুখী যাবতীয় দায়িত্ব ছিল কর্তামশায়ের বৃষস্কন্ধে। আদিযুগে দাদুর, মধ্যযুগে বড় জেঠার, শেষমেশ বড়দার। অন্তর্মুখী কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে ছিলেন : গিন্নিমা। হয়তো বলবেন—তখন মেয়েদের জীবনে স্বাধীনতা ছিল না। হয়তো ছিল না। জানি না। তখন বয়স ছিল কম—দিদি বা বউঠানদের সব কথার অর্থ বুঝতে পারতাম না। বর্তমান যুগের অ্যাপার্টমেন্টে মা লক্ষ্মীরা আশা করি তাঁদের 'উইমেন্স লিব্'-এর অধিকারটা ফিরে পেয়েছেন। কিন্তু বিনিময়ে অনেক কিছু কি তাঁদের হারিয়েও যায়নি?

ওই অণু-পরিবারের একমাত্র ভবিষ্যৎ কি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে না? বড়দা-মেজদা-সেজদা-ছোড়দির সঙ্গে খামচাখামচি, ভাগাভাগি, গালাগালি আর গলাগলি করে শৈশব যাপন করতে সে শেখেনি। দাদু-দিদার কোলে বসে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী সে শোনেনি। মাসি-পিসির আদর কুড়িয়ে রাজকন্যা-রাজপুত্রের গল্প শোনেনি। একলব্য-ধ্রুব-প্রহ্লাদ-সত্যকামের নামই শোনেনি বেচারিরা।

ওরা রামধনুর মতো সাতরঙা হয়ে আকাশে ফুটে উঠতে চায়! কিন্তু অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের নিউক্লিয়ার পরিবারে সেটা অসম্ভব। টি.ভি.-তে কার্টুন দেখেই ওরা সন্তুষ্ট হতে শেখে। ওরা কোথায় পাবে অপু-দুগ্গার

মতো দিগন্ত-অনুসারী শালবনের দিক-হারানো দিগন্ত? টেলিগ্রাফ পোস্টে কান পেতে গা-সিরসির স্বর্গীয় বার্তা ওরা শুনবে কেমন করে? ড্যাড-মম্ দুজনেই অফিসের চাকায় ইঁদুর-দৌড়ে ব্যস্ত। বেবি 'মানুষ' হয় ক্রেশে অথবা বেবি-সিটারের ডে-কেয়ারে। মানুষই হয় তো!

এটাকেই কি বলছেন : সুখী জীবন? তাই যদি মনে করেন, তবে এ বুড়োটাকে মাপ করবেন, আমি বরং প্রসঙ্গান্তরে যাই—

গৃহসজ্জার ক্ষেত্রেও বাঙালির দৃষ্টি বদল হয়ে গেছে। দেওয়াল, ঘরের কোণ, ফার্নিচার—সর্বত্রই পালাবদলের ছাপ। তবে মুশকিল এই যে, আমাদের সাবেকি আমলে মা লক্ষ্মীদের সুরুচির স্পর্শ পেতাম এখানে ওখানে—বেড-কভারের নকশায়, টেবিল ঢাকার কিনারে, বালিশঢাকার ফ্রিলে। তখন আমরা বিশ্বাস করতাম 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে'। লেখার টেবিলের একটেরে মাটির ঘটে সাজানো স্থলপদ্মে, অথবা মামুলি মোরাদাবাদি ফুলদানিতে রাখা রজনীগন্ধায়।

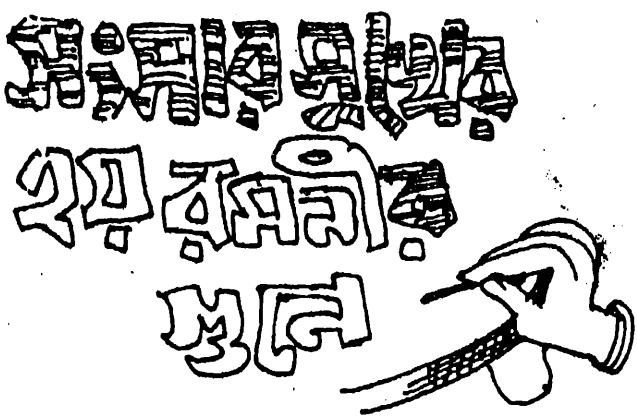

ইদানীং বেটার-হাফের রুচিবোধকে পাত্তা দিতে চান না ওয়ার্স-হাফের দল। অর্থমূল্যে ইন্টিরিয়র ডেকরেটর সাজিয়ে দিয়ে যান লিভিং-কাম-ডাইনিং অথবা ড্রইংরুম। প্রকাণ্ড পিতলের হাণ্ডায় অ্যারিকা-পাম, অথবা গৃহস্বামীর নিঃশেষিত শ্যিভাস রিগ্যালের বোতলে সঞ্চারিণী পল্লবিনী

মানি-প্ল্যান্ট। কখনও বা কৃত্রিম গাছ, কৃত্রিম ফুল—দেখলে বোঝা যায় না যে আদ্যোপান্ত সবটাই কৃত্রিমতায় ঠাসা!

নাঃ! আপনি চটে যাচ্ছেন রম্যরচনা-লেখকের প্রাচীনপন্থী দৃষ্টি-ভঙ্গিতে। ঠিক আছে, এবার মর্বিড সাহিত্যিক থামছে, বাস্তুকারের বক্তব্যটা শুনুন : একথা সর্বজনবিদিত যে বাঙালির জীবনে আজ প্রতিটি দ্রব্যের মূল্য ক্রমবর্ধমান— দুটি ব্যতিক্রম বাদ। ব্যতিক্রম দুটি : টাকার ক্রয়ক্ষমতা আর মানুষের জীবনের দাম। কিন্তু নিত্যব্যবহার্য প্রতিটি জিনিসের মূল্য একই হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে না। দুর্ভাগ্যক্রমে গৃহনির্মাণশিল্পের অনুপানগুলির ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধির আনুপাতিক হার অনেক বেশি। ভারতবর্ষে— এবং পশ্চিমবঙ্গেও প্রায় ৭৩% মানুষ বাস করে গ্রামে, বাকি ২৩% শহরে। কিন্তু কাকে বলি শহর? কাকে শহরতলি, কাকেই বা গণ্ডগ্রাম? ভারতে তেইশটি 'মেগাসিটি' আছে যার লোকসংখ্যা দশ লক্ষের বেশি। লক্ষাধিক মানুষ বাস করে প্রায় তিনশো শহরে। আদমসুমারিতে দেখা গেছে শহরাঞ্চলের প্রায় ৪২% লোক বাস করে এক-কামরা ঘরে, প্রতিটি ঘরের বাসিন্দা গড়ে ৪.৬ জন। এই জনসংখ্যার মধ্যে—অর্থাৎ বিভিন্ন মাপের শহরের জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ বাস করে বস্তিতে বা জবরদখল ঝুপড়িতে। বিগত শতাব্দীর শেষাশেষি দেখা গেছে শহরের তিন-চতুর্থাংশ মানুষ কৃষিজাত উৎপাদনের সঙ্গে কোনওভাবেই যুক্ত নয়। তারা খায়, কিন্তু খাদ্য-উৎপাদনের ধারেকাছে নেই। হিসাবে দেখা যাচ্ছে প্রতি বৎসর প্রায় ষাট লক্ষ মানুষ নতুন করে মজদুর হয়ে যাচ্ছে। এই যে শহরবাসীর বিপুল জনসংখ্যা এদের ৬৪% কোনও সিউয়ারেজ সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত নয়।

আমি বাইশ বছর আগে যে প্রতিষ্ঠান থেকে অবসর নিই, তাদের মতে সারা ভারতে গৃহহীনদের জন্য বাড়ি নির্মাণ করার লক্ষ্যটা এই রকম (১৯৯১-এর জরিপ) : ৩.১০ কোটি শহরের বাড়ি এবং ১.০৪ কোটি গ্রামের বাড়ি। জাতীয় নবম প্ল্যান অনুযায়ী শহর ও গ্রামের মিলিতভাবে গৃহনির্মাণের জন্য অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন প্রায় ১.৫৫

হাজার কোটি। তার ১,২৬,০০০ কোটি প্রয়োজন শহরের জন্য আর ৩০,০০০ কোটি গ্রামের জন্য। তার মধ্যে মাত্র ৫২,০০০ কোটি টাকার ব্যয়বরাদ্দ হিসাবে ধরা হয়েছে। বাকিটা—সরকার সেই ভূষণের গুরুদেবের মতো বলছেন, "হবে! এক বছর ধৈর্য ধরে থাকো। অন্তত নেক্সট ইলেকশন পর্যন্ত।" কে জানে, হয়তো ততদিনে অভাবটা অভ্যাস হয়ে যাবে।

এই সব সংখ্যা থেকে আমাদের ধারণা করা শক্ত হয়ে পড়ে। অঙ্কশাস্ত্রমতে নক্ষত্রগুলির দূরত্ব 'লাইট-ইয়ারের' মাপে ধারণা করার মতো। তা ছাড়া আমরা যে হিসাব দিচ্ছি তা গোটা ভারতের। তা থেকে গোটা পশ্চিম বাংলার নতুন সহস্রাব্দে বাঙালির সমস্যার পরিমাণটা লোকসংখ্যার অনুপাতে ত্রৈরাশিক অঙ্ক কষে আপনাদের বুঝে নিতে হবে। গোটা ভারতে তো বটেই পশ্চিমবঙ্গেও গ্রামের মানুষ ক্রমাগত শহরে চলে আসতে চাইছে। সেই মানসিকতা কি ক্রমবর্ধমান? হ্যাঁ, তাই।

স্বাধীনতার পরে (১৯৫১) শহরের জনসংখ্যা ছিল গোটা ভারতের জনসংখ্যার ১৭% ; দুই দশক পরের আদমসুমারিতে তা বৃদ্ধি পেয়ে হল ২১% ; আরও বিশ বছর পরে ১৯৯১-এ দেখা গেল শহরবাসীর অনুপাত ২৬% ; শেষ আদমসুমারি মতে (১৯৯১) গোটা ভারতের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ শহুরে। শুনলে আশঙ্কা হয় বইকি। কিন্তু একটা কথা : সারা পৃথিবীতে যে হারে গ্রামের মানুষ শহরবাসী হয়ে উঠছে সেই হারে ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে আমরা শহরমুখী হচ্ছি না। পৃথিবীর অন্যান্য এলাকায় শহরাঞ্চলের মানুষের শতাংশ নিম্নোক্তরূপ। সেই হারে ভারতের স্থান অষ্টম :

জাপান—৭৭ ; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—৭৫ ; গোটা ইউরোপ—৭৩ ; গোটা ল্যাটিন আমেরিকা—৭২ ; ভূতপূর্ব রাশিয়া—৬৬ ; চিন—৩৯; সমগ্র আফ্রিকা—৩৪ ; ভারত (১৯৯১ আদমসুমারি মতে, যেহেতু সবগুলোই তাই)—২৬।

সারা পৃথিবীর বিভিন্ন অতিকায় মেগাসিটির তুলনায় আমাদের এই কল্লোলিনী কলকাতার লোকসংখ্যার কী অবস্থা? কলকাতা আছে দশম

স্থানে! ক্রমানুসারে মেগাসিটিগুলির নাম :

মেক্সিকো সিটি (২.০২), টোকিও (১.৮১), সাও পাওলো (১.৭৪), নিউইয়র্ক (১.৬২), সাঙহাই (১.৩৪), বৃহত্তর মুম্বই (১.২৬), লস অ্যাঞ্জেলস (১.১৮), বুইনস্ এয়ার্স (১.১৫), সিওল (১.১০), কলকাতা (১.০৯)। বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যাগুলি কোটিতে। অর্থাৎ কলকাতা ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর, কিন্তু মুম্বইয়ে গৃহসমস্যা বোধহয় কলকাতার চেয়ে বেশি। মুম্বইয়ে ট্রেনের থ্রি-টায়ার কামরার মতো সারি-সারি অ্যাপার্টমেন্ট-হাউস দেখেছি। কলকাতায় তার সন্ধান পাইনি।

বাঙালির বাস্তুসমস্যা— ওই 'একটুকু বাসা' নিয়ে এককালে আমাকে গভীরভাবে ভাবতে হয়েছে। সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেবার ঠিক আগে কয়েকবছর (১৯৭৯-৮২)। আমি তখন ছিলাম ভারতের পূর্বাঞ্চলে ব্যয়সঙ্কোচ প্রণালীর প্রয়োগকর্তা। ব্যাপারটা খুলেই বলি :

স্বাধীনতার পরে প্রথম পাঁচ দশকে গৃহনির্মাণ শিল্পে প্রতিটি উপাদানের মূল্য অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সমস্যা প্রচণ্ড সন্দেহ নেই— কিন্তু ওই সঙ্গে আর একটি কথা কিন্তু আমরা আদৌ আলোচনা করি না। কারণ জানিই না। আমাদের জানতে দেওয়া হয়নি। তথ্যটা এই যে, একই সময়ে প্রয়োগবিদ্যা কয়েকটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ করেছে। কেন্দ্রীয় গৃহ-নির্মাণ মন্ত্রকের অধীনে ন্যাশনাল বিল্ডিংস অর্গানিজেশন (N.B.O.), রুড়কি-স্থিত C.B.R.I., দিল্লীর C.R.I., দেরাদুনের F.R.I. প্রভৃতি বিজ্ঞানাগারে নানান ধরনের ব্যয়সঙ্কোচের সূত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। ল্যাবরেটরিতে ক্ষুদ্র পরিসরে পরীক্ষা সাফল্যমণ্ডিত হবার পর বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখা গেছে সেই প্রয়োগকৌশলগুলির সার্থক কার্যকারিতা। এই ধরনের কয়েক শত ছোট বড় আবিষ্কার বিজ্ঞানী-এঞ্জিনিয়ারা লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রচার-পুস্তিকা-বিলির ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা সেসব সাফল্যযুক্ত আবিষ্কার গবেষণাগারের ফাইল থেকে বাস্তব ক্ষেত্রে রূপায়িত হয়নি। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধা হবে।

চার-পাঁচতলা বাড়ির ক্ষেত্রে আবহমানকাল থেকে একতলায় গেঁথেছি

বিশ ইঞ্চি, দোতলায় পনের ইঞ্চি চওড়া গাঁথনি। N.B.O. হিসাব করে প্রমাণ করলেন, ইট একটা নির্দিষ্ট মানের হলে (কলকাতার ইট সর্বভারতের শ্রেষ্ঠ ইট ওজন নিতেও পারে, ওজনেও ভারী) বিশেষ পদ্ধতিতে ভারবাহী দেওয়ালগুলি সাজালে পাঁচতলা বাড়িতে আগা-

পাছতলা দশ ইঞ্চির গাঁথনি করা চলে। কেউ সে কথায় কর্ণপাত করল না। শেষে মানিকতলা হাউসিং স্কিমে তদানীন্তন কোন আধুনিকমনা বড়কর্তা বললেন, অল রাইট! একটা বাড়িতে বানিয়ে দেখাও।

একটা নয়, N.B.O. সব কয়টা বাড়িই সেভাবে বানালো। তারা বলেছিল ভেঙে পড়লে, অথবা দেওয়ালে কোথাও ফাটল ধরলে কেন্দ্রীয় সরকার দায়ী থাকবেন। তৈরি হল পাশাপাশি অনেকগুলি পাঁচতলা বাড়ি, যার একতলা থেকে পাঁচতলা সর্বত্র দশ ইঞ্চি চওড়া ভারবাহী দেওয়াল। আর. সি. পিলার বা বীম নেই। বাড়ি শেষ হল। ভেঙে পড়ল না। তবু তাতে মানুষজন বাস করতে সাহসী হল না। বললে, হুঁ হুঁ বাবা! যদি ভূমিকম্প হয়? কর্তৃপক্ষ তখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে দিয়ে হিসেবটা আবার পরীক্ষা করলেন। তাঁরা বিস্তর

আঁকজোক করে বললেন, কলকাতায় গত একশ বছরে সবচেয়ে বড় যে ভূমিকম্প হয়েছে তা হলেও বাড়িগুলি ভেঙে পড়বে না। শুনে কেউ কেউ উস্‌খুস্‌ করতে থাকেন। 'গন্ধবিচার' কবিতার সেই দুঃসাহসী বৃদ্ধ নাজিরের মতো দু-একজন গিন্নিকে বললেন, 'দুত্তোর নিকুচি করেছে! একদিন তো মরবই! চলো ওখানেই গিয়ে উঠি!' এতদিনে 'একটুকু বাসা'র একটা হিল্লে হবে তাহলে।'

এলেন তাঁরা। গুটি গুটি। অচিরেই নো-ভেকেন্সি! তারপর তাঁরা সেখানে ত্রিশ বছর বাস করছেন। কোন দেওয়ালে ফাটলের দাগ দেখতে পাননি! বলতে পারেন এখানে গল্পের শেষ and they happily lived there ever afterwards!

গল্পের নটেগাছটি কিন্তু মুড়োয়নি। এরপর থেকে পশ্চিমবঙ্গের হাউসিং বোর্ড ওইভাবে অসংখ্য পাঁচতলা বাড়ি বানিয়েছে। কিন্তু পি. ডবিলু.ডি. ও পথ মাড়ায়নি! তাঁরা এখনো একতলায় মোটা দেওয়াল বানিয়ে চলেছেন। যদিও কলকাতা শহরেই গত শতাব্দিতেই হাজারের উপর ওই নয়া-পদ্ধতির পাঁচতলা মকান বানানো হয়েছে। তারা বহাল তবিয়তে টিকে আছে।

কেন এমনটা হল? সাধারণ মানুষ জানে না। সাধারণ এঞ্জিনিয়ারেরাও জানেন না। আমি জেনেছি নিতান্ত ঘটনাচক্রে। বলি শুনুন :

সত্তরের দশকে কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহনির্মাণ মন্ত্রকের অধীনস্থ N.B.O. ভারতের চারপ্রান্তে চারজন সুপারিন্টেন্ডেন্ট এঞ্জিনিয়ার পদমর্যাদার বাস্তুকার চাইলেন বিভিন্ন রাজ্যসরকারের কাছে। অনেকটা সেই আদি শঙ্করাচার্যের মতো চার 'মঠ' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। যাতে নানান নয়া প্রযুক্তি কৌশলগুলি বাস্তবায়িত হয়। সে-আমলে পূর্বাঞ্চলের তিন-তিনটি সরকার তাদের রাজধানীতে পূর্বাঞ্চলের 'মঠ'টি স্থাপন করতে চাইলেন— পাটনা, কলকাতা ও গুয়াহাটি। পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন গৃহনির্মাণ মন্ত্রী ব্যারিস্টার ভোলানাথ সেনের লা-জবাব সওয়ালের জন্যই হবে হয়তো, শেষমেশ ফাইনাল-খেলায় কল্লোলিনী কলকাতার জয় হল।

অধম লেখক দায়িত্বটা পেলেন।

আমি কলকাতায় এন.বি.ও.-র লিয়াঁজ-অফিসার হিসাবে পূর্বাঞ্চলের 'মঠাধীশ' হয়ে বসলাম। সেই অফিসে তিন বছর চাকরি করে ১৯৮২ সালে অবসর নিই। প্রথম প্রথম ভেবেছিলাম চাকরিটা বড় আরামের। ঠিকাদারের ঝামেলা নেই। টেন্ডার ডাকাডাকি নেই। বাজেট এক্সপেন্ডিচার ঠিকমতো না হলে কৈফিয়ত দেবার দায় নেই। ইচ্ছেমতো গোটা পূর্বাঞ্চল প্লেনে করে উড়ে বেড়াও। আসাম, উড়িষ্যা, মিজোরাম, বিহার। সেইসব রাজ্যের চীফ এঞ্জিনিয়ারদের ব্যয়নির্মাণ পদ্ধতিগুলোর প্রচার আর ব্যাখ্যা করা শক্ত কি? অচিরেই মালুম হল কাজ শক্ত! অত্যন্ত কঠিন! সবারই এসবে ঘোরতর অ্যালার্জি! তাঁরা ব্যয়সঙ্কোচে গররাজি! কেন গো?

শুনুন বলি : সরকারি উদ্যোগে, ট্যাক্সপেয়ারের টাকায় যত বাড়ি তৈরি হয়, যাকে বলে 'পাব্‌লিক সেক্টর', তার চেয়ে অনেক বেশি হয় 'প্রাইভেট-সেক্টরে।' কিন্তু সাধারণ বাড়ির মালিক, ঠিকাদার, মিস্ত্রিরা পাব্‌লিক-সেক্টরের হোমড়া-চোমড়া এঞ্জিনিয়ারদের পথ ধরে চলেন। 'মহাজনস্য গতঃ যেন' পন্থায়। মোটা মাইনের সরকারি এঞ্জিনিয়ারের ফাইলে যদি একটি মৃত-মক্ষিকা দেখা যায় তাহলে এঁরা ছোটেন মাছি মারতে। তার মানে সারা দেশকে ওই ব্যয়সঙ্কোচ প্রণালী অবলম্বন করাতে হলে প্রথমে কব্জা করতে হবে পাবলিক-সেক্টরের মহারথীদের। সে প্রচেষ্টায় কেন ব্যর্থ হলাম এবার সেই প্রসঙ্গে আসি :

পাবলিক-সেক্টরে বাড়ির ডিজাইন করা হয় দু'-রকম পদ্ধতিতে। প্রথমত, সরকারি এঞ্জিনিয়াররা নিজেরাই প্ল্যান, ডিজাইন, এস্টিমেট বানান। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে—বিশেষত খুব বড় বড় প্রজেক্টে নির্বাচিত মন্ত্রিমশাই তাঁর ইচ্ছামতো কোন নামীদামী আর্কিটেক্ট-ফার্মকে ডেকে কাজটা করতে বলেন। একে একে বলি :

প্রথম ক্ষেত্রে নয়া-পদ্ধতির প্রচারে পাঁচ-জাতের বাধা। বড়-সাহেবের পাঁচজাতের মানসিকতার জন্য।

এক : গোঁড়ামি ঃ চীফ এঞ্জিনিয়ার-সাহেব আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন যে, বিশ-ত্রিশ বছর আগে তিনি কলেজে যা শিখেছিলেন সেটাই বাস্তুবিদ্যার শেষ কথা। তাঁদের ধুয়ো—'যেপথে চলেছি চিরকাল সে-

পথেই চলব—'টিল্ রিটায়ারমেন্ট!'

দুই : রক্ষণশীলতা ঃ নতুন কিছু শেখার অনাগ্রহ। কী দরকার ওসব ঝামেলায় যাবার?

তিন : আতঙ্ক ঃ কে জানে বাবা! কোথা থেকে কী হয়ে যায়! হয়তো সার্ভিসবুকে দাগ পড়ে যাবে। কাজটা হয়তো ভাল, কিন্তু সুখের চেয়ে স্বস্তি আরও ভাল।

চার : স্বার্থপরতা ঃ গৌরী সেনের টাকা বাঁচলে কি আমার মাইনে বাড়বে?

পাঁচ : নীচতা ঃ ঠিকেদারের কাছে আমরা একটা পার্সেন্টেজ 'ইয়ে' হিসেবে পেয়ে থাকি। সেটা কমে যাবে না কি?

এবার 'আর্কিটেক্ট-ফার্মে'র প্রসঙ্গে আসা যাক। সচরাচর যেসব প্রকল্প পঞ্চাশ লক্ষ অথবা তার চেয়ে বেশি টাকার হয় সেক্ষেত্রে মন্ত্রিমশাই তাঁর মনোমত 'আর্কিটেক্ট ফার্ম'কে ডেকে এনে কাজটা করতে দেন। ক্বচিৎ কখনো তাঁদের মধ্যে টেন্ডার হয়। সচরাচর কর্তার ইচ্ছাতেই কর্ম। স্থপতি-সংস্থা মোট-ব্যয়ের শতাংশ হিসাবে তাঁর ফী পান। ধরা যাক সেটা ছয় শতাংশ এবং প্রকল্পটা এক কোটি টাকার। এক্ষেত্রে আর্কিটেক্ট পাবেন ছয় লক্ষ টাকা। আমরা যে ব্যয় সঙ্কোচ পদ্ধতির প্রস্তাব করছি তাতে যদি ২০% খরচ কমে যায় তাহলে আর্কিটেক্টের লোকসান হবে প্রায় সওয়া লক্ষ টাকা। তিনি কি সহজে তাতে রাজি হবেন? বড়কর্তাদের যথাসাধ্য প্রণামী দিয়ে, পার্টি ফান্ডে চাঁদা দিয়ে, ওই লোকসানটা সইতে কি তিনি রাজি হবেন? তিন বছর ধরে লিয়াজঁ অফিসার হিসাবে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে মনে হয়েছে কোন কোন সরকারি-অফিসার, বা নির্বাচিত শাসক-প্রতিনিধি এ বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে পারেন না উপরে বর্ণিত বিষচক্রের নানান প্রতিক্রিয়ায়। কিছু কিছু নবীন এঞ্জিনিয়ারকে দেখেছি, আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হতে কিন্তু উপর মহলের প্রতিবন্ধকতায়—তাদের সঙ্কীর্ণতায়, স্বার্থপরতায়, ভীরুতায় অথবা নীচতায় অধীনস্থ উৎসাহী এঞ্জিনিয়ারদের দল ব্যর্থ হয়েছেন!

আমি যখন ১৯৮২ সালে—আজ থেকে ঠিক বাইশ বছর আগে

অবসর গ্রহণ করি, তখন বামফ্রন্ট সরকার এসেছেন পশ্চিমবঙ্গের কর্ণধার হয়ে। ভোলানাথ সেনের পরিবর্তে তখন গৃহনির্মাণমন্ত্রী হয়েছেন যতীন চক্রবর্তীমশাই। এই সব ব্যয়-সঙ্কোচের ব্যাপারে—কী জানি কেন—তাঁর বিশেষ উৎসাহ দেখিনি। আমার শূন্য চেয়ারে অন্য কোনও সুপারিন্টেন্ডিং এঞ্জিনিয়ারকে বসানোর কোন উদ্যোগ তিনি গ্রহণ করেননি। ভারতের অন্যান্যপ্রান্তে আর যে তিনজন 'মঠাধ্যক্ষ' ছিলেন—শুনেছি তাঁদেরও একই হাল হয়েছিল। তারপর ক্রমে ক্রমে সব প্রাদেশিক সরকার তথা কেন্দ্রীয় শাসকবৃন্দ যখন 'রাজনীতি ব্যবসায়' পূর্ণোদ্যমে যোগদান করলেন তখন N.B.O.-র সেই প্রকল্পটাই উঠে গেল। সারা ভারতের গৃহনির্মাণ মন্ত্রিদের মন্ত্র হয়ে গেল : মন্ত্রিত্ব করব, খাব ভাত! ব্যয় সঙ্কোচ কী উৎপাত!

প্রকল্পটির শিশুমৃত্যু ঘটল!

আমি গপ্পুড়ে মানুষ। প্রবন্ধ-টবন্ধ লেখা আমার ধাতে নেই। তাই শেষ পাতে আপনাদের একটা কিস্‌সাই শোনাই। না, মনগড়া কাহিনী নয়, আদ্যন্ত সত্য ঘটনা। শুধু নামগুলি বদলে দিয়েছি। এ ঘটনারও সূত্রপাত সাত দশক আগে, প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে। প্রায় আমার জন্মসময়ের।

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে বৈকুণ্ঠবাবু কর্নফিল্ড রোডে একটা ছোট্ট জমি কিনে ফেললেন। আন্দাজ সওয়া তিন কাঠা। তিনিও ছিলেন এক সওদাগরি অফিসের কনিষ্ঠ কেরানি। কিন্তু কর্নেট বাজানোর সখ তাঁর আদৌ ছিল না। সওদাগরি অফিসটি স্টিভাডোরের ব্যবসা করে, জাহাজে মাল আমদানি-রপ্তানি করে। কাঁচা পয়সার লেনদেন। বৈকুণ্ঠবাবু ছিলেন অতি সৎ মানুষ এবং স্বভাবে ব্যয়কুণ্ঠ। ফলে বছর কয়েকের মধ্যেই একটি দু-কামরার বাড়ি বানিয়ে ফেলেন। যেহেতু কর্নেট বাজানোর বদ-অভ্যাস নেই, তাই অচিরেই তাঁর ঘরে এসে হাজিরা দিলেন এক ভদ্রমহিলা। তাঁর 'পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদূর'।

বলতে ভুলেছি, জমিটির মাপ তিন কাঠা, ছয় ছটাক, ছয় বর্গফুট। কিছুই বুঝলেন না তো? কী করব? আমার কী দোষ? যে আমলের

গল্প সেকালে আমরা পাঠশালায় 'কাঠাকিয়া' মুখস্থ করতাম। ফুট-ইঞ্চি বোঝেন? না বুঝলে আমি আবার নাচার। মিটার-সেন্টিমিটারে আবার আমার অ্যালার্জি। শুনুন, জমির ফ্রন্টেজ ছিল ২৮´-০´´, গভীরতা ৮৭´-০´´, ফলে আয়তন = ৮৭´-০´´ × ২৮´-০´´ = ২৪৩৬ বর্গফুট = ৩.৩৮ কাঠা।

চাকরি করা বৈকুণ্ঠবাবুর পোষালো না। কাঁচা-পয়সা ধরে রাখতে হলে বাঁ-হাতটাকে গুগলি-বোলারের মতো খেলাতে হবে। বৈকুণ্ঠের তা ধাতে নেই— নিতান্ত সিধেসাধা মানুষ। তাই মোটা রকম রিটায়ারিং গ্র্যাচুইটি নিয়ে তিনি অবসর গ্রহণ করলেন। সে টাকায় নিজের জমির পিছন দিকে একটা টালির শেড তুলে খুলে বসলেন এক মুদিখানা। দু-চার বছরেই সৎ ব্যবসায়ীর দোকানটি ফুলেফেঁপে উঠল। ইতিমধ্যে বৈকুণ্ঠের দুটি পুত্র সন্তান হয়েছে। বড়টি গোকুল। তার লেখাপড়া হল না। হেডমাস্টারমশাই বলতেন, 'গোকুলের মাথায় স্রেফ গোবর। আর ওর ছোট ভাইটিকে দেখ— ম্যাট্রিকে জলপানি বাঁধা।'

ছোট ছেলেটির নাম—হ্যাঁ, প্রত্যাশিতভাবেই বিনোদ।

দোতলা বাড়ি, পেছনদিকে দোকান, কপালে সিঁদুরহীন গৃহিণী আর দুই পুত্রকে শোকসাগরে ভাসিয়ে বৈকুণ্ঠ একদিন সাধনোচিত 'স্বনামধন্য ধামে' চলে গেলেন। তার আগেই তিনি দুই পুত্রের বিবাহ দিয়েছেন। গোকুল দোকান দেখে, ছোট ছেলে বিনোদ বাপের সুপারিশে ওই সওদাগরী অফিসে ঢুকেছিল। দক্ষ কীপারের মতো কাঁচা-পয়সা ক্যাচ করার বিদ্যায় পারদর্শী।

প্রথম প্রথম দু'ভাই এক হেঁশেলেই আহারাদি করত। পরে অর্থনৈতিক বৈষম্যের হেতুতে বিনোদ উঠে গেল দোতলায়। ভাগের মা রয়ে গেলেন একতলায়, গোকুলের সংসারে। অবশ্য গোকুল তাঁর সতীনপুত্র ছিল কি না এ তথ্যটা সংগ্রহ করতে পারিনি। ক্রমে গোকুলজননীও একদিন স্বর্গে গেলেন। দু-পুত্রের সংসারেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটল। অথচ মেরামতির অভাবে দ্বিতল বাড়িটি ক্রমেই জীর্ণতর হয়ে পড়ে।

যৌথ সম্পত্তির মেরামত হওয়া মুশকিল। নিজের অংশ মেরামত করানোর মতো আর্থিক সঙ্গতি বিনোদের আছে। কিন্তু গোকুলের তা

নেই। তারপর সত্তরের দশকে একতলার দেওয়ালে দেখা দিল এক মারাত্মক ফাটল। বিনোদ ফ্ল্যাটবাড়ি ভাড়া নিতে পারে, কিনতেও পারে কিন্তু দ্বিতল পৈত্রিক সম্পত্তির আধখানা তো সে ছেড়ে যেতে পারে না। শেষমেশ বিনোদ দাদাকে বুঝিয়ে বললে, আলিপুর আদালতের মাধ্যমে সম্পত্তি বাঁটোয়ারা করতে। গোকুলকে রাজি হতে হল।

গোকুল চাইছিল তাদের স্কুলের হেডমাস্টারমশইকে মধ্যস্থ (আর্বিট্রেটার) মেনে নিয়ে সম্পত্তির বাঁটোয়ারা করতে। বিনোদের তাতে ঘোর আপত্তি। বলে, 'ইস্কুলমাস্টার দিয়ে এসব কাজ হয় না দাদা। আমার মামাশ্বশুর উকিল মানুষ। তিনিই মধ্যস্থতা করুন বরং।'

গোকুল রাজি হল। উকিলবাবু বুঝলেন, বড় ভাইয়ের কোনও আর্থিক সঙ্গতি নেই। তাই তাকে দিলেন পিছনের আধখানা জমি আর দোকানটা। বিনোদ পেল সামনের দিকের দোতলা বাড়ি। 'ভ্যালুয়েশান মোতাবেক' আর্বিট্রেটার চুলচেরা বিচার করে জানালেন, বিনোদ তার দাদাকে নগদে দেবে সাঁইত্রিশ হাজার সাতশো টাকা। সে টাকায় গোকুল পিছনের অংশে তার মাথা গোঁজার ঠাঁই বানিয়ে নেবে। গোকুল রাজি হল। সেই মোতাবেক দলিল তৈরি হল। দু-ভাই আদালত আর কর্পোরেশনে ছোটাছুটি শুরু করল। কয় জোড়া জুতোর 'সুখতলা' কতবার পাল্টাতে হল জানি না, তবে বিনোদ যথাযথ প্রণামীর ব্যবস্থা করায় কর্পোরেশনের খাতায় মিউটেশন মঞ্জুর হল। সেপারেশন বৈধ হল। বিনোদ দাদাকে ব্যাঙ্ক-ড্রাফ্‌ট ধরিয়ে দিয়ে নিজের দোতলা অংশ মেরামত করতে বসল। এতদিনে সে পারচেজ অফিসার হয়েছে। অর্থের কোনও অসুবিধা ছিল না। তখনই ধরা পড়ল গলদটা। দলিলে। বিনোদের মামাশ্বশুর ফৌজদারি আদালতের নামকরা উকিল। কিন্তু কলকাতা কর্পোরেশনের আইন-কানুন ভাল জানেন না। গোকুল এতদিনে জানতে পারল যে, কর্পোরেশন আইন মোতাবেক সে ওই পিছনের প্লটে কোনওদিনই বাড়ি বানাতে পারবে না। গোকুল-গিন্নি সবিস্ময়ে জানতে চায়, ওমা এ আবার কী অলুক্ষুণে কথা গো! কেন? কী অপরাধে?

গোকুল-নিয়োজিত এঞ্জিনিয়ার বললে, কর্পোরেশন-আইন বলছে, যে-প্লটের অ্যাক্সেস (পৌঁছানোর রাস্তা) মাত্র চার ফুট চওড়া সেখানে

নতুন বাড়ির প্ল্যান স্যাংশন করা হবে না।

শুধু গোকুল নয়, শ্রীমান বিনোদও পড়ে গেল গভীর গাড্ডায়। এঞ্জিনিয়ার বললেন, ফাটলটা মারাত্মক হয়ে গেছে। চুন-সুড়কির এক ইটের দোতলা বাড়িটি বড়ই জীর্ণ, বোধকরি জীবদ্দশার শেষ পর্যায়ে। বিনোদ স্থির করল সম্পত্তি বেচে দিয়ে অন্যত্র চলে যাবে। আর তখনই বুঝতে পারল বখেড়াটা দু-মুখো! দ্বিতল বাড়ি আর জমি কেউ কিনবে না। খদ্দেররা আশঙ্কা করছে যে, সামনের দিকে নতুন বাড়ি বানাতে চাইলেই পিছনের প্লট-হোল্ডার অবজেকশন দেবে। সে তার জমিতে যাবার ন্যায্য অ্যাকসেস দাবি করবে অর্থাৎ প্যাসেজটা ৪′-০″-এর বদলে ৮′-০″ ছাড়তে হবে। তাহলে তো সামনের জমির বাড়ি চওড়ায় মাত্র ১৬′-০″ হয়ে যায়।

বৈকুণ্ঠবাবু স্বর্গে বসে বুঝতে পারলেন দ্বিতল বাড়ি বানানোতেই তাঁর কর্তব্য শেষ হয়নি—তাঁর উচিত ছিল বাড়ি মেরামতির জন্য একটা সিঙ্কিং ফান্ডের ব্যবস্থা করে যাওয়া। তাহলে আজ তাঁর আদরের গোকুল-বিনোদ এভাবে রোড-এ সিট-ডাউন হয়ে যেত না।

এইরকম যখন পরিস্থিতি তখন কিছু তালেবর প্রোমোটার নিক্তি হাতে

দু' ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। প্রমোটার দায়িত্ব নিল ন্যায্য-ভাগাভাগির। তার বক্তব্য : যদি দু'ভাই নিজ-নিজ সম্পত্তি বেচে দিতে রাজি থাকে তাহলে প্রোমোটার তা নগদমূল্যে কিনে নিতে প্রস্তুত। বিনোদ বাধ্য হয়ে দাদার দ্বারস্থ হল, দাদা! এছাড়া যখন আর কোনও পথ নেই তখন এস দু'জনেই প্রমোটারকে জমি বেচে অন্য কোথাও চলে যাই।

গোকুল বলে, দ্যাখ বিনু, আমি চিরকাল মুখ্যুসুখ্যু মানুষ। সম্পত্তির ব্যাপার-স্যাপার আমার মাথায় ঢোকে না। আমি আবারও বলছি চল দু'জনে হেডমাস্টারমশাইয়ের কাছে যাই। উনি আঁকে দড়, একটা সমাধান নিশ্চয় বাতলাতে পারবেন। বিনোদ জানে, আঁকে দড় হলেই এসব সমস্যার সমাধান করা যায় না। কিন্তু তার বউ বলে রেখেছে, কোনওক্রমেই দাদাকে চটিয়ে দিও না। তোমরা দু ভাই একসঙ্গে, একযোগে সম্পত্তি বিক্রি না করলে চলবে না কিন্তু।

অগত্যা দু ভাই একদিন গিয়ে হাজির হল হেডমাস্টারমশায়ের ডেরায়। এতদিনে তিনি অতিবৃদ্ধ। তবু তাঁর ধীর-স্থির বুদ্ধিতে পাক ধরেনি। বললেন, দ্যাখো বাবাসকল, আমি ইস্কুলমাস্টার। এসব বুঝি না। তবে যে বোঝে তার পাত্তা তোদের জানাতে পারি। একবার গাধা বনেছিস, দ্বিতীয়বার এসব প্রোমোটারের খপ্পরে পড়িস না। অপরের ইন্দ্রলুপ্তে পণস বিদারণই ওদের বৃত্তি!

গোকুল বলে, তাহলে আমরা কার কাছে যাব স্যার?

—নাম-ধাম টেলিফোন নম্বর সব লিখে দিচ্ছি। আমার স্কুলেরই ছাত্তর। জলপানি পেয়েছিল। এখন আর্কিটেক্ট। সল্টলেকে থাকে। সে বুদ্ধিমান, তঞ্চকতা করবে না— বিশেষ, আমার হাত চিঠি নিয়ে গেলে।

পারচেস অফিসারের গাড়িতে দু ভাই একদিন তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করল। আর্কিটেক্ট বললেন, মাস্টারমশাই আপনাদের পাঠিয়েছেন, আমি পরামর্শ নিশ্চয় দেব, তবে ফিজ নিতে পারব না।

গোকুল বলে, তা কেন? এটাই যখন আপনার পেশা।

—ঠিক আছে, সেসব কথা পরে। প্রথমে আপনারা কাগজপত্র দেখান। সমস্যাটা কী?

দু' ভাই তাদের দলিল-দস্তাবেজ বার করে দেখাল। আর্কিটেক্ট

বললেন, দেখুন মশাই, আপনারা কোনও বাস্তুবিদের সঙ্গে পরামর্শ না করে এই যে 'মিউটেশনটা' করেছেন এখানেই চরম ভুল হয়েছে। বিনোদ বলে, সে তো এখন বুঝছি। উদ্ধারের কোনও পথ কি বাতলাতে পারেন?

—তা কেন পারব না? তবে আপনাদের একযোগে কাজ করতে হবে। দু' ভাই দুমুখো সড়কে হাঁটা ধরলে চলবে না। সমাধানের অনেকগুলি বিকল্প পথ আছে।

বিনোদ বলে, একটা শোনান?

—ধরুন, আপনারা দু'জনে যদি গোটা সম্পত্তিটা আমাকে বেচে দেন। আমি তাহলে ওখানে একটা পাঁচতলা ফ্ল্যাটবাড়ি বানাতে পারি। আপনাদের দু'ভাইকে দুটি ফ্ল্যাট তো দেবই, নগদে মাথাপিছু সওয়া লাখ টাকা দেব। তিনটি ফ্ল্যাট বেচে আমি খরচ তুলে নেব, লাভ ওঠাব।

দু' ভাই তো তাজ্জব। গোকুল বলে, বলেন কি মশাই! কর্পোরেশন আমাকে একতলা বাড়ি বানাতে দিচ্ছে না।, অথচ আপনাকে পাঁচতলা বাড়ি বানাতে দেবে?

—হ্যাঁ দেবে। কারণ আমি তো গোটা প্লটের মালিক।

বিনোদ বলে, হিসেবটা আপনি আমাদের একটু বুঝিয়ে বলবেন?

—বলব। শুনুন : গোটা জমির মাপ ২৪৩৬ বর্গফুট। আপনাদের ওই কর্নফিল্ড রোডটা স্বাধীনতার পর হয়ে গেছে ডঃ, রাধাকুমুদ মুখার্জি সরণি। কিন্তু সেটা ৪০´-০´´ চওড়াই আছে। না, ভুল হল— ওটা এখন ১২.১৯৫ মিটার চওড়া। বর্তমানে, এই ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে, কর্পোরেশন আইন মোতাবেক (বিল্ডিং অ্যাক্ট ১৯৯০, রুল ৬১) দশ থেকে পনেরো মিটার চওড়া রাস্তার ক্ষেত্রে এফ. এ. আর. (ফ্লোর-এরিয়া-রেশিও) হচ্ছে ২.২৫ ; ১২.১৯৫ মিটার চওড়া রাস্তার ক্ষেত্রে ত্রৈরাশিক-অঙ্কের হিসাবে এফ. এ. আর. তাহলে হবে ২.৬০৯৭৫।

গোকুল বলে এফ. এ. আর.টা কী?

—সব কয়টি তলার মিলিত ফ্লোর এরিয়া ÷ জমির ক্ষেত্রফল।

বিনোদ তার দাদাকে বলে, তুমি বাধা দিও না দাদা, আমি তোমাকে পরে বুঝিয়ে দেব।

আর্কিটেক্ট বলেন :

$$\text{এফ. এ. আর.} = \frac{\text{(সব-কয়টি তলার মিলিত ফ্লোর এরিয়া)}}{\text{জমির ক্ষেত্রফল}}$$

তাহলে, (সব-কয়টি তলার ফ্লোর এরিয়া) = (এফ. এ. আর.) × (জমির ক্ষেত্রফল)

= ২.৬০৯৭৫ × ২৪৩০ বর্গফুট

= ৬৩৫৭ বর্গফুট

কর্পোরেশনের আরও একটি আইন আছে (বর্তমানে নেই। কাহিনীর কালে ছিল) যে বহুতল-বিশিষ্ট সৌধের ক্ষেত্রে সব কয়টি তলার মিলিত ফ্লোর এরিয়াকে ১০% বৃদ্ধি করতে দেওয়া হবে যদি গৃহস্বামী গোটা একতলাটা গ্যারেজ করেন। ফলে, আমরা একতলায় গ্যারেজ বানালে এফ. এ. আর. বৃদ্ধি পেয়ে হবে ১.১ × ৬৩৭৫ = ৬৯৯২ বর্গফুট। ধরুন যদি সিঁড়ি ঘরের জন্য ১১৭ বর্গফুট বাদ দিই, তাহলে প্রতিটি তলায় আমাদের টেনামেন্টগুলি হবে (৬৯৯২ − ১১৭) ÷ ৫ = ১৩৭৫ বর্গফুট। বিনোদ বলে, তার মানে নিচের তলায় চার-পাঁচটা গ্যারেজ স্পেস ছেড়ে আমরা চারতলা বাড়ি বানাতে পারি যার প্রতিটির ফ্লোর-এরিয়া ১৩৭৫ বর্গফুট। কেমন তো?

গোকুল আকুলভাবে বলে, ১৩৭৫ বর্গফুট মানে কতটা? ক' কামরার ফ্ল্যাট?

—ধরুন তিন কামরার ফ্ল্যাট। এছাড়া বড় ড্রইং-ডাইনিং-লিভিং রুম। আমি একটা স্কেচ এঁকে দিচ্ছি, দেখুন। পছন্দ হয়?

বিনোদ জানতে চায়, আচ্ছা প্রমোটারকে জমি বেচে না দিয়ে আমরা যদি নিজেরাই বাড়িটা দু' ভাই মিলে বানাই? আই মিন ওই পাঁচতলা বাড়িটা?

গোকুল বলে, কী বক্‌ছিস পাগলের মতো? কত টাকা খরচ করতে হবে জানিস? অত টাকা পাব কোথায়?

আর্কিটেক্ট বললেন, না গোকুলবাবু, টাকায় আটকাবে না। জমিটা

বন্ধক রেখে আপনারা ইনস্টলমেন্টে বাড়ি তৈরি করার জন্য লোন পেতে পারেন। বিনোদ জানতে চায়, দু-একটি ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশনের হদিশ দিতে পারেন?

—সিওর! ধরুন, হাউসিং প্রমোশন অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন (H.P.F.C.)। নাগাল্যান্ড হাউস, শেক্সপিয়ার সরণি। অথবা হাউসিং ডেভালপমেন্ট ফাইনান্স কর্পোরেশন (HDFC)। ২০ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটে।

বিনোদ আবার বলে, ওইরকম কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে যদি আমরা নিজেরাই বাড়ি বানাই—বিক্রি করি, তাহলে আমাদের কতটা লাভ থাকতে পারে?

আর্কিটেক্ট বলেন, তা কি আগেভাগে বলা যায়! তার অনেকটাই নির্ভর করবে আপনাদের এলেমের উপর। আপনারা দুজনেই গৃহনির্মাণ ব্যাপারে অনভিজ্ঞ। ফলে কতটা লাভ আপনাদের দু-ভায়ের পকেটে আসবে, আর কতটা লাভের গুড় পিঁপড়েয় খাবে তা কেমন করে বলব?

—লাভ কী হবে সে কথা থাক। গোটা পাঁচতলা বাড়ির বিক্রয়লব্ধ অর্থটা কত হতে পারে?

—সে হিসাবটা অবশ্য করা যায়। জমির দামসমেত ভাঙা বাড়ির স্যালভেজ ভ্যালু আর গ্যারেজের দামটা না ধরলে ৬৯৯২ বর্গফুট তৈরি বাড়ির দাম আপনারা পাবেন। ধরুন ৭০০০ বর্গফুট। এখনকার বাজারদরে যদি ৪০০ টাকা প্রতি বর্গফুট ধরেন তাহলে আঠাশ লক্ষ টাকা!

বিনোদের মাথার ভিতর ঢলে ওঠে। গোকুল যেন এতক্ষণ পিংপং খেলা দেখছিল। একবার এর মুখে একবার ওর মুখে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করছিল হিসেবটা। কিন্তু এই শেষ অঙ্কটা তো ঠিকই বুঝতে পেরেছে। বললে না বিনোদ, বাবা বলতেন : 'অতি লোভে তাঁতি নষ্ট!' আর্কিটেক্টকে বলে, বিনোদের চাকরি আছে, আমার দোকান আছে তার চেয়ে আপনি নিজেই দায়িত্বটা নিন বরং। আমাদের দু-ভাইকে এক-একটা ফ্ল্যাট আর সওয়া লাখ দিলেই আমরা খুশি!

আর্কিটেক্ট জানতে চান, আপনি কী বলেন বিনোদবাবু?

বিনোদ নিজেকে এতক্ষণে সামলে নিয়েছে। বলে, একটু ভেবে দেখি। কাল ফোন করে জানাব। গোকুল বলে, সে কথাও ঠিক। বাবা আরও বলতেন, না ভেবেচিন্তে কোনও কাজ করা ঠিক নয়।

আর্কিটেক্ট হাসতে হাসতে বলেন, তাছাড়া আপনার পূজ্যপাদ শ্বশুরমশাইও তো বলতেন, 'হাতের ঢিল আর মুখের কথা একবার ছাড়লে আর ফিরে পাওয়া যায় না।' তাই না, গোকুলবাবু?

গোকুল অবাক হয়ে বলে, কী আশ্চর্য! আপনি কেমন করে জানলেন?

—বাঃ! তাঁর কথা কে না জানে? উনি তো আজও বদ্যিপাড়ায় কিং মেকার!

ভারি আপসোসের কথা! কাহিনীর উপসংহারটা আমার অজানা। ওরা দু' ভাই শেষ পর্যন্ত কী করেছিল জানি না। তবে দু-চারটে উড়ো খবর কানে এসেছে। সেগুলোকেই আপনাদের খেদমতে দাখিল করি :

দু' ভাই বাড়ি ফিরে এল সন্ধ্যা নাগাদ। গাড়িতে বিশেষ কথাবার্তা হয়নি। গোকুল তার একতলার পলেস্তারা-খসা ভিটেয় এসে দেখল—বাইরের ঘরে তক্তাপোশের উপর জাঁকিয়ে বসে আছেন তার পূজ্যপাদ শ্বশুরমশাই। বদ্যিপাড়ার ডাকসাইটে নিমাই রায়। প্রাক্ স্বাধীনতাযুগে, মানে শরৎবাবুর আমলে, তাঁর দাপটে নাকি বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খেত। ইদানীং 'বাঘ' বলে এ রাজ্যে কিছু নেই। তাঁরা আছেন দেওয়ালে ফোটোর মধ্যে, কাচের ঘেরাটোপ খাঁচায়। গোরুরাও আজকাল দুধ দেয় না, ভোট দেয়। ফলে বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খাওয়ার প্রশ্নটাই ওঠে না। তবে হ্যাঁ, নিমাই রায় আজও স্বরাজ্যের সম্রাট : বদ্যিপাড়ার কিং মেকার। নিজে কখনও নির্বাচনে দাঁড়াননি, তবে কোথায় কে দাঁড়াবে তা নির্ধারণ করে দেন। বাঘ-গোরু না থাক, তাঁর দাপটে দু'পক্ষের পার্টিমস্তানই এক ঠেক-এ কালী-মার্কা সেবন করে, কী সরকারপক্ষের কী বিরোধী! নমস্য রাজনীতিবিদ!

গোকুল তাঁর চরণধূলি নেবার পর তিনি বললেন, বড়খুকির কাছে

সব কথা শুনলাম। ওটা খুব বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছ বাবাজি। সেবারের মতো ফস করে মুখের কথা খসাওনি!

গোকুল স্বীকার করল না যে, কৃতিত্বটা ওর জলপানি পাওয়া ছোটভাই বিনোদের।

নিমাই বললেন গন্ডেরিরাম এসেছিল আমার সঙ্গে। এতক্ষণ বসে বসে এইমাত্র চলে গেল। কাল সকালে আবার আসবে।

গোকুল বিহ্বল হয়ে বলে, গন্ডেরিরাম? তিনি কে?

—নামটাও জান না? কাগজ-টাগজ পড় না, না কি? গন্ডেরিরাম কেউটিয়া কলকাতা শহরের সবচেয়ে নামকরা প্রোমোটার। কলকাতা শহরে বে-আইনি বাড়ি বানানোর রেকর্ড করেছে। গিনেস বুক অব রেকর্ডসের নেক্সট এডিশনে ওর নাম ছাপা হবে। ও বলেছে, এই জমিতে সে কর্পোরেশনকে ম্যানেজ করে একটা এগারোতলা হাই-রাইজ বাড়ি বানাবে। তোমরা এক-এক ভাই পাবে এক-একটা ফ্ল্যাট, আর নগদ আড়াই লাখ টাকা!

গোকুল কী যেন আমতা-আমতা করে। নিমাই রায় বলেন, ভিতরে যাও, বাবাজীবন। বড়খুকি তোমাকে ডাকছে। যাও।

গোকুল অন্দরমহলের দিকে এগিয়ে যায়। বিনোদও বাড়ি-ফেরা মাত্র পড়ে গেল গভীর গাড্ডায়। বেচারি তখনও জুতোর ফিতে অথবা গলার কণ্ঠলেঙ্গটি খোলেনি। ওর ধর্মপত্নী এসে মহড়া নিল—

—শোনো বিনোদ!

সরি শরৎদা, আপনি কানে আঙুল দেবেন না। আধুনিক সিন্দুরহীনা সীমন্তিনীরা তাঁদের ওয়ার্স হাফকে নাম ধরেই ডেকে থাকেন।

—আমি রাজি নই। আমি সব শুনেছি। না, আমরা এ পাড়ায় থাকবোই না। সল্টলেকে চলে যাব।

—সল্টলেক! কে ব্যবস্থা করবে?

—আমি। সে তোমাকে ভাবতে হবে না, বিনোদ। তোমার দাদা বউদির সঙ্গে এক বাড়িতে থাকা আর পোষাবে না আমার। দিদি যখন-তখন এসে জানতে চাইবে, নীলের উপোসটা কবে রে ছুটকি? আজ না কাল? ও আমার আর সহ্য হবে না। আর তোমার দাদাও হুট-হাট

যখন-তখন লুঙ্গি পরে, ফতুয়া গায়ে ..... হয়তো আমাদের পার্টি চলছে—

বিনোদ বাধা দিয়ে বলে, বুঝলাম। কিন্তু দু' ভাই একই প্রোমোটারকে সম্পত্তি না বেচলে তো চলবে না!

—আই নো। বেশ, তাই বেচবে। তোমার দাদার শ্বশুর—ওই যে তুমি কী একটা কথা বল 'তালুইমশাই' না 'তাওইমশাই'—আই মিন, বদ্যিপাড়ার সেই ক্যাডাভ্যারাস বুড়োটা—নিমাই রায় .....

—বুঝেছি। বুড়োটা কি আজ এসেছে?

—হ্যাঁ। একজন প্রোমোটারকে সঙ্গে নিয়ে—গন্ডেরিরাম কেউটিয়া.....

—কেউটিয়া!

—হ্যাঁ। নাম শোননি? গিনেস বুকের নেক্সট এডিশনে ওর নাম ছাপা হবে। সে তোমার দাদাকে দেবে ১৩৭৫ এস এফ টি-র একটা ফ্ল্যাট আর নগদে আড়াই লাখ। আর তোমাকে দেবেন সল্টলেক সেক্টার থ্রি-তে একটা ২৭৫০ এস এফ টি-র এ সি অ্যাপার্টমেন্ট। বাট নো ক্যাশ!

—নো ক্যাশ?

—ইয়েস! নো ক্যাশ! ক্যাশ আর কোথায় রাখবে বিনোদ? তবে ভদ্রলোক আমাকে ব্রোকারেজটা নগদ মিটিয়ে দিয়ে গেছেন।—এই দেখ!

ড্রয়ার খুলে ভেলভেট কেসটা দেখায়। আমেরিকান ডায়মন্ডে গাঁথা জড়োয়া একটা সেট : নেকলেস, ম্যাচিং কানবালা, আংটি আর ব্রেসলেট!

বিনোদ অবাক হয়ে বলে, আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে এটা তুমি নিলে, রুমি?

—কেন নেব না, মিস্টার পারচেজ-অফিসার? আপনাকে যখন মক্কেলরা শ্যিভাস রিগেলের বোতল দিয়ে যায়, তখন আপনি কি আপনার ধর্মপত্নীর পারমিশন নিয়ে তা অ্যাকসেপ্ট করেন, স্যার?

গল্পের শেষটা কেমন যেন বেজুতের হয়ে গেল, তাই না? বৈকুণ্ঠের উইল-এর মতো বৈকুণ্ঠের বাস্তুভিটার উপাখ্যানটাও মিলনান্তকভাবে শেষ হলে হয়তো খুশি হতেন আপনারা। জানি। স্বর্গে বসে শরৎদাও আমাকে

আশীর্বাদ করতেন হয়তো। আরে বাপু আমি নিজেই কি কম খুশি হতাম? কিন্তু কী করব বলুন! আমার যে হাত-পা বাঁধা! এইভাবেই যে আজ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়েছে বাঙালির সেই 'একটুকু বাসা'র স্বপ্নটা। নতুন সহস্রাব্দের নতুন যুগের এই কলকাতায় গোকুল-বিনোদেরা একে একে তাদের সাতপুরুষের একটুকু বাসাখানি বেচে নতুন যুগের উদ্বাস্তু হচ্ছে। কল্লোলিনী কলকাতার বুকের উপর হাইরাইজ বিল্ডিং বানিয়ে জাঁকিয়ে বসলেন কেউটিয়া, নাগিনীয়া আর গোক্ষুরিয়ার দল। বাস্তুনাগ হাইবারনেশনে! 'বাস্তুপুরুষায় নমঃ' বলে কেউ আর অঞ্জলি দেয় না। কার্তিক মাসে আকাশপিদিম জ্বালাবার কুসংস্কার বন্ধ হয়েছে। লাঠি ঠুকঠুক সেই পিতৃপুরুষেরা স্বর্গ থেকে নেমে আসার পথ খুঁজে পান না ব্ল্যাক-আউটের কলকাতায়। আকাশপ্রদীপ জ্বলে না, তুলসীমঞ্চের পিদিমটা দপ্‌দপ্‌ করতে করতে নিবে গেল। হবু কল্লোলিনী কলকাতায় আবার নতুন করে উদ্বাস্তু হয়ে গেল গোকুল-বিনোদের দল।

যা বাস্তব, সে কথাই তো বলতে হল আমাকে? না কি!

বাঙালির আত্মকেন্দ্রিকতা

"অধিকাংশ বাঙালি কি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে?"

টেলিফোনে এই প্রশ্নটা শুনে দারুণ খুশিয়াল হয়ে উঠি। কিছুটা লজ্জিতও। প্রশ্নটা যখন *'সুখী গৃহকোণ'* সম্পাদকের মনে জেগেছে তখন নিশ্চয়ই একটা আশার আলো দেখা যাচ্ছে। হয়তো এতদিনে আমরা সত্যিই সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে পড়েছি। না হলে সুখী গৃহকোণ সম্পাদক জনে-জনে এ প্রশ্নটা করবেন কেন?

ব্যাপারটা কী জানেন? আমি লোকটা না—ভীষণ আত্মকেন্দ্রিক। কিন্তু সেকথা প্রকাশ্যে স্বীকার করতে লজ্জা পেতাম। কিছুটা ভয়ও। ঘরকুনো মানুষটার প্রকৃত স্বরূপ জানাজানি হয়ে গেলে গণধোলাইয়ের আশঙ্কা। আর কিছু না হোক আমার বইয়ের বিক্রি যাবে কমে। সবাই বয়কট করতে শুরু করবে আমাকে। আত্মকেন্দ্রিকতা তো একটা অপবাদ। এতদিন বোঝা যায়নি লোকটা কেন অমন একবগ্গা— একবাণ্ডিল কাগজ আর কালিকলম হাতে পেলে সে ঘরের বারই হতে চায় না। ক্লাবে যায় না, বিভিন্ন সাহিত্যিক আড্ডায় আসে না, সভাসমিতি এড়িয়ে চলে, বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে দহরম-মহরম করে না। আপন মনে পাতার পর পাতা হাবিজাবি লিখে চলে। পাঁচজনের সঙ্গে দুটো সুখ-দুঃখের গল্প কর, পাঁচজনের আনন্দ-বেদনা ভাগ করে নাও। পদযাত্রায় সামিল হও। মিটিং-মিছিলে উপস্থিত হও! তা নয়, শুধু আপন মনে ছাইভস্ম লিখে যাওয়া! কী? না আমার এই পড়ার টেবিলটাই আমার স্বর্গ, আমার 'সুখী গৃহকোণ'! কোনো মানে হয়?

কিন্তু এটাই যে আমার বিশ্বাস, আমার ধর্ম! ঈশ্বর কি পান্নাকে সবুজ

রঙে রাঙিয়েছেন? প্রকৃতি কি চুনীকে করেছে লাল? আমি জানি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস : ওদের বর্ণাভা শুধুমাত্র আমার চেতনার রঙে। আমি যে আত্মকেন্দ্রিক।

গোটা বাঙালি জাতিটা তা নয়। আমি ছিলাম সংখ্যালঘিষ্ঠ দলে। এখন শুনছি জ্ঞানীগুণীরা সন্দেহ করছেন যে, অধিকাংশ বাঙালি ও দল ছেড়ে আমার দলে আসতে চাইছে! খুশিয়াল হব না?

আমি মূলত কথাসাহিত্যিক। গপ্পুড়ে মানুষ। তার মানে অবশ্য কথক নই। কথাকোবিদও নই। মনের মতো মানুষ পেলে দু-কথা কইতে পারি। না পেলে কলমের মাধ্যমে কাগজকে গল্প শোনাই। কিন্তু সুখী গৃহকোণের ওঁরা গল্প-টল্প শুনতে রাজি নন। সেখান থেকে টেলিফোনে আমাকে ফরমায়েশ করা হয়েছে ওই পত্রিকার জন্য মিষ্টি একটা প্রবন্ধ লিখতে হবে। মিষ্টি? না, টক-ঝাল-মিষ্টি-মিষ্টি? না হলে পাঠক খাবে কেন?

তা মিছরির স্ফটিকখণ্ড বানাতে গেলে কিছু জল চাই, কিছু শর্করাজাতীয় উপাদান চাই, আর চাই কিছুটা উত্তাপ, কারিগরী নৈপুণ্য। এ ছাড়া মিছরির স্ফটিক বানাতে আবশ্যিকভাবে প্রয়োজন হয় একটা সুতোর। সেই সূত্রের চারিধারেই রচনার স্ফটিকখণ্ড দানা বেঁধে উঠবে। এ-ক্ষেত্রে সুখী গৃহকোণের ওঁরা বেমক্কা নিদান হেঁকেছেন : সূত্রটা লেখকের মন্‌পসন্দ হবে না, সেটা ওঁরাই সরবরাহ করবেন। করলেনও : 'অধিকাংশ বাঙালি কি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে?'

মুশকিল এই যে, প্রবন্ধকারের মতে সূত্রটা যথেষ্ট পোক্ত নয়— ছিঁড়ে যেতে পারে। ওতে একটা কালবাচক শব্দ থাকলে ভাল হত : 'আজকাল', 'ইদানীং', 'ক্রমশ' জাতির। আপনারা বলবেন : সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে বাপু— ক্রিয়াপদটা থেকে। 'হয়ে পড়ছে' মানেই 'ইদানীং, অধুনা, একালে।' বেশ, মেনে নিলাম। কালবাচক অনুপস্থিত শব্দটা উহ্য আছে, কিন্তু সেটা প্রচণ্ডভাবে প্রশ্নে মিশে আছে। অর্থাৎ বাঙালিদের মধ্যে কেউ কেউ আত্মকেন্দ্রিক আগের যুগেও ছিল, কিন্তু তারা ছিল সংখ্যায় কম।

এখন জাতিগতভাবে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে পড়ছে কি না এটাই বিবেচ্য।

তা বেশ। তবু বলি : 'সূত্রটা' শুধু শক্তপোক্ত হলেই চলবে না, দেখতে হবে সেটা যেন মিছরির জলে গলে না যায়। প্রশ্নের প্রতিটি বাক্যের সংজ্ঞার্থ সুনির্দিষ্ট না হলে কী করে মীমাংসায় আসব?

প্রথম কথা : 'বাঙালি' কাকে বলছেন? আপনি হয় তো উল্টে ধমক দেবেন, এ আবার কি বেয়াড়া প্রতিপ্রশ্ন? 'বাঙালি' কে তা কি বুঝিয়ে বলতে হবে? যে এ দেশে বাস করে, এই বাংলা ভাষায় কথা কয়, এ দেশের জলহাওয়ায় মানুষ হয়েছে। স্নানঘরে যে আপন মনে ভাটিয়ালি বা রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়, আহার-বিহারে, পোশাক-আশাকে, জাগরণে-স্বপ্নে যে বাঙালিয়ানায় জারিত, সেই তো বাঙালি!

আমি জানতে চাইব : তাহলে আমার নাতনি অন্তরা? যার জন্ম-বাল্য-কৈশোরে কেটেছে ক্যালিফোর্নিয়ায়, যে আমাকে চিঠি দেয় ইংরেজিতে, যে 'ব্যাথরুমে' শাওয়ার খুলে দিয়ে 'বেলা ফন্টে' বা 'মেলিন ডিয়ন' গায়— সে কি বাঙালি নয়? আপনি বলবেন, সে তো একটা ব্যতিক্রম। আমরা এখানে 'অধিকাংশ' বাঙালির কথা আলোচনা করছি।

আমি আবার বলব : অধিকাংশ মানুষ? 'গাঙের হেইপারে'র বাসিন্দা ধৈরা? তাদের হিসেবে ধরলে এই আমরা—পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী বাঙালিরা, তো সংখ্যালঘিষ্ঠ। তা এইপারে বইয়া, না খাইয়া, ক্যাম্‌নে কইবাম সন্দেশখালির সন্দেশ মিষ্ট না তিতা? ন্যাহ্য কথা। এতদূর থেকে বোঝার উপায় নেই ও-পার গাঙের অধিকাংশ বাঙালি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে কি না। কয়েক শতাব্দী ধরে তাঁরা নিঃসন্দেহে বাঙালি ছিলেন। এমন কি মুক্তিযুদ্ধের পরেও বেশ কিছুকাল। তখন তাঁদের অধিকাংশ আত্মকেন্দ্রিক ছিলেন না। রাম ও রহিম, কলিমুদ্দিন ও কানাইলাল, সীতা আর সাবিনা কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সামিল হয়েছে। নিজ নিজ পরিবারের, নিজ নিজ গোষ্ঠীর, নিজ-নিজ ধর্মের কথা তারা ভাবেনি। দেশের জন্য, দশের জন্য খুন দিয়েছে। তারপর জনাব এরসাদের জমানায় দেশটা যখন শরিয়তি কানুনে মুসলিম রাষ্ট্র হয়ে গেল—যখন মনে প্রশ্ন জাগল ওঁরা মূলত কী? বাঙালি, না মুসলমান? তখন থেকে ওঁদের খবর

আর জানি না।

অবশ্য বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় যাঁরা ঘর-বাড়ি ছেড়ে পরবাসী হয়েছেন, তাঁরা বাঙালিই রয়ে গেছেন। কী জানেন? কোন বাঙালিকে বাঙলা থেকে তাড়ানো যায়। কিন্তু সেই বিতাড়িতের অন্তর থেকে 'বাঙালিয়ানা'কে তাড়ানো যায় না।

দ্বিতীয়ত, 'আত্মকেন্দ্রিক' শব্দের সংজ্ঞার্থ কী? পরিবারের মধ্যে একা নিজে? নাকি পাড়ার মধ্যে নিজের 'সুখী গৃহকোণটুকু'? অথবা প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মধ্যে জাতিগতভাবে আত্মকেন্দ্রিক?

এক হিসাবে মানুষমাত্রেই—শুধু মানুষ কেন, জীবমাত্রেই? স্বভাবগত-ভাবে আত্মকেন্দ্রিক। চাঁদ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে, পৃথিবী করছে সূর্যকে, সূর্য এই ছায়াপথ-ঘেরা নক্ষত্র-জগতে ঘুরে মরছে—কিন্তু এদের সবার ঘূর্ণনছন্দ তো আমার চেতনাকে কেন্দ্র করে। বামির হাতের দীপশিখার মতো যেদিন হঠাৎ নিভে যাব সেদিন ওদের কাছে আমি যেমন মৃত, তেমনি আমার কাছেও তাদের ঘূর্ণনছন্দ স্তব্ধ। ফলে আত্মকেন্দ্রিকতা জীবজগতের মূলকথা, শেষ কথা!

না! ভুল হল। বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম তা মানে না। বিজ্ঞান বলে— চার্লস ডারউইনের নির্দেশে—জীব ব্যক্তিগতভাবে আত্মকেন্দ্রিক নয়, প্রজাতিগত-ভাবে আত্মকেন্দ্রিক। মা-হরিণকে শিঙ বাঁকিয়ে বাঘের মহড়া নিতে দেখছেন শিকারীরা—মৃত্যুভয় জয় করে, মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও— তার শাবকদের পালিয়ে যাবার সুযোগ দিতে। আর দর্শন? আধ্যাত্মিকতার মূল্যায়ন?

> *"মানুষের প্রধান বল আধ্যাত্মিকবল। মানুষের প্রধান মনুষ্যত্ব আধ্যাত্মিকতা। শারীরিকতা বা মানসিকতা দেশ কাল পাত্র আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা অনন্তকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অনন্ত দেশ ও অনন্ত কালের সহিত আমাদের যে যোগ আছে, আমরা যে বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র নহি, ইহাই অনুভব করা আধ্যাত্মিকতার একটি লক্ষণ। যে মহাপুরুষ এইরূপ অনুভব করেন, তিনি সংসারের কাছে গোঁজামিলন দিতে*

*পারেন না। তিনি সামান্য সুবিধা-অসুবিধাকে তুচ্ছ-জ্ঞান করেন। তিনি আপনার জীবনের আদর্শকে লইয়া ছেলেখেলা করিতে পারেন না—কর্তব্যের সহস্র জায়গায় ফুটা করিয়া পালাইবার পথ নির্মাণ করেন না। তিনি জানেন, অনন্তকে ফাঁকি দেওয়া চলে না। সত্যই আছে, অনন্তকাল আছে, অনন্তকাল থাকিবে—মিথ্যা আমার সৃষ্টি—আমি চোখ বুজিয়া সত্যের আলোক আমার নিকটে রুদ্ধ করিতে পারি, কিন্তু সত্যকে মিথ্যা করিতে পারি না। অর্থাৎ ফাঁকি আমাকে দিতে পারি, কিন্তু সত্যকে দিতে পারি না।**

প্রকাশ্যভাবে না থাকলেও প্রশ্নটার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে একটা ধিক্কারের ইঙ্গিত আছে : "ছিঃ ছিঃ, বাঙালির যে সুনাম এতদিন ছিল, তা বুঝি হারিয়ে যেতে বসেছে। সে স্বার্থপর হয়ে পড়ছে, আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে ক্রমশ। জাস্টিস পাঠক এবং জাস্টিস পাঠিকার ডিভিশন-বেঞ্চে বিভিন্ন লেখক-জুরিরা তাঁদের মতামত প্রকাশের আগেই সম্পাদকীয় দপ্তর যেন 'হেডম্যান অফ দ্য জুরি'-র ভূমিকায় বলতে চেয়েছেন :

"আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো ওই 'অধিকাংশ বাঙালি' : গিল্টি!"

মি লর্ড! এটা ঠিক হচ্ছে না। এটা ন্যায়শাস্ত্র মতো বিচার নয়। সম্পাদকমণ্ডলীর ওই প্রশ্নটা 'হেডম্যান-অব দ্যা-জুরি'-র নয়, ওটা স্রেফ : চার্জশিট! আমরা—লেখকেরাও 'জুরি' নই, কাউন্সেলার। কেউ আসামীর বিপক্ষে বাদীপক্ষে, কেউ বা প্রতিবাদীর। আমি একজন প্রতিবাদী। আমার সওয়ালটাও শুনুন হুজুর অ্যান্ড হুজুরাইন!

আসামীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে তার স্পষ্টত দুটি ধারা। প্রথম ধারায় প্রশ্নটা গোটা জাতির : অধিকাংশ বাঙালি কি ভারতের অন্যান্য রাজ্যের অধিবাসীদের পরিপ্রেক্ষিতে আত্মকেন্দ্রিক হ'য়ে যাচ্ছে? দ্বিতীয় ধারায় : বাঙালি কি নিজ-নিজ পরিবারের অতি আপনজনদের সুখদুঃখে উদাসীন থেকে স্বার্থপরের মতো নিজের আখেরটুকুই গুছিয়ে নিতে চাইছে?

---

* রবীন্দ্র রচনাবলী / জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ / পৃ: ৬৫৮

একে একে আলোচনা করা যাক :

জাতিগতভাবে আত্মকেন্দ্রিকতা : পাশের রাজ্য একদিন জাতিগতভাবে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছিল : 'বংগাল-খেদা' মন্ত্রে। হাজার-হাজার মানুষ আসামের কাছাড়, সুরমা উপত্যকা অথবা সংলগ্ন অঞ্চল থেকে ভিটে-মাটি ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এসেছিল। একইভাবে ধর্মভিত্তিক আত্মকেন্দ্রিকতায় পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র থেকে লক্ষ লক্ষ বাঙালিকে চলে আসতে হয়েছে, সব কিছু বিসর্জন দিয়ে। উড়িষ্যায়— বিশেষ করে পুরী শহরে— একবার স্থানীয় মানুষ আত্মকেন্দ্রিকতার মন্ত্রে উন্মাদ হয়ে বাঙালি টুরিস্টদের বলেছিল 'সে পাকে যিব তো ডণ্ডা খিব।' তখন সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বিজু পট্টনায়ক। তিনি অতি দ্রুত এবং অতি দৃঢ় হাতে ওড়িয়াদের এই আত্মকেন্দ্রিকতাকে নির্মূল করে ফেলেন। বুঝিয়ে দেন, পুরীর বাজারে বাঙালি টুরিস্ট, বাঙালি জগন্নাথভক্ত বাস্তবে মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদ! তাই উড়িষ্যার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক তিক্ত হতে পারেনি। সেটা হল বিহারে। মছলিখোর 'বংগালি'দের নানাভাবে নির্যাতন শুরু করল লালুবাবুর সাঙ্গপাঙ্গরা।

কিন্তু চর্যাপদের আমল থেকে এই নতুন সহস্রাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়কালে ইতিহাস খুলে কি দেখাতে পারেন 'অধিকাংশ বাঙালি' কোন যুগে

শ্লোগান দিচ্ছে 'মেড়ো হঠাও?' (হাওড়া স্টেশনে শতকরা পঁচানব্বই জন মালবাহী পোর্টার অবাঙালি, রিক্‌শাওয়ালারাও তাই, বড়বাজার-ক্যানিং স্ট্রিট বাগরি মার্কেটের দোকানি ও ব্যবসায়ীরা একচেটিয়াভাবে অবাঙালি) অথবা কর্পোরেশনের সংখ্যালঘু প্লাম্বার পুকার দিচ্ছে : 'উড়ে' হঠাও, কিংবা ট্যাক্সি-ওনার্স অথবা ট্যাক্সি ড্রাইভার্স-অ্যাসোসিয়েশনের মিটিং-এ কোন বাঙালি সদস্তে প্রস্তাব আনছে : 'সর্দারজি হঠাও'! নেভার!

সারা ভারতে যেখানে যান, আপনাকে স্থানীয় লোকের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে হবে তাদের স্থানীয় ভাষায়। উত্তর ভারতে বা পশ্চিমে—মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থানে স্থানীয় ভাষার পরিবর্তে হিন্দিতে, দাক্ষিণাত্যে ইংরেজিতে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে? যারা প্রতিবেশী রাজ্য থেকে রুজি-রোজগারের ধান্দায় এসেছে—ব্যবসায়ীর ভূমিকায় অথবা রিকশা-ওয়ালা, ট্যাক্সিওয়ালা, রেলওয়ে পোর্টারদের মতো মেহনতি মানুষের ভূমিকায়, তাদের সঙ্গে কখনো বাঙলা ভাষায় আমরা কথা বলি না। জটায়ুর ভাষায় বলি : 'কাফি দে চুকা, তাং মৎ করো' অথবা হিন্দিটা রপ্ত না থাকলে রিক্‌শাওয়ালাকে বলি : 'ইস্টিশান যেতে চিরটাকাল তো পাঁচটাকাই দেতা থা বাপু, আজ তোম্ সাত টাকা মাংতা কিঁউ? এটা কি মগের মুল্লুক পায়া হ্যয়?'

আরও বিবেচনা করে দেখুন : অন্যান্য রাজ্যে যদি স্থানীয় সজ্জন আপনাকে নিমন্ত্রণ করেন— তাদের বিয়ে-সাদি-শ্রাদ্ধের সামাজিক আমন্ত্রণে, তাহলে তারা খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করেন দেশীয় সংস্কৃতি মোতাবেক। বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণাঞ্চলে সর্বত্র : ইডলি-ডোসা-দহিবড়া-সম্বর-উপ্‌মা-বড়াই-মাইসোর পাক। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে : পুরী-দাইল-ভাজি-চানাচুর-সবজি-লাড্ডু। আমিষভোজী হলে, বিশেষত পাঞ্জাব অঞ্চলে : গোস-রোটি, পুলাও, সালাড, সবজি, পাপ্পড় ঔর মিঠাই! আর আমরা? বিগত পাঁচ-দশটা নিমন্ত্রণ বাড়ির অভিজ্ঞতা স্মরণ করুন। একবারও কি সেই সাবেক ঢঙে— যে কায়দায় আপনার-আমার বাপ-ঠাকুর্দা কুশাসনে আসন-পিঁড়ি হয়ে কলাপাতায় ভোজন করেছেন, বাঙালির সাবেকি নিমন্ত্রণ-বাড়ির বাঁধা ফর্মুলা—তা খেয়েছেন? সেই বেগুন ভাজা—

পটলভাজা—শুক্তুনি—গহনা বড়ি—লুচি—মাছের মুড়ো দেওয়া মুগ ডাল—পোলাও—রুইমাছের কালিয়া—কচি পাঁঠার মাংস—পরমান্ন—পিঠেপুলি?

কেন এমনটা হয়েছে? বাঙালি আত্মকেন্দ্রিক নয় বলেই না?

হাওড়া স্টেশন থেকে বড়বাজার বা ক্যানিং স্ট্রিট হয়ে জবাহরলাল নেহরু রোড, এলগিন রোড ধরে এই ভবানীপুর আসতে দেখেছি পথের দু'পাশের ফুটপাথে বে-আইনি দোকান। তার শতকরা নিরানব্বইটির—

যদি না পুরো একশ হয়—মালিক অবাঙালি। তারা ভিন রাজ্য থেকে এসেছে, রোজগারের ধান্দায়। দেশে থাকতেই তারা শুনেছিল কলকাত্তার আকাশে 'শও-শও রোপেয়াকা নোট ভেসে-ভেসে বেড়ায়। সিরেফ পাকড়না হ্যয়। এরা রাজ্য সরকারকে একটা পয়সা দেয় না। ইনকাম-ট্যাক্স, সেল্‌স-ট্যাক্সের ঝঞ্ঝাট নেই—মায় ফুটপাথ জবরদখল করে কর্পোরেশনকেও কোন ট্যাক্স দেয় না। অথচ যাবতীয় পরিষেবার তারা ভাগিদার। খরচের মধ্যে কিছু দিতে হয় পুলিশকে, কিছু পার্টি-ক্যাডারদের। কী উদার ব্যবস্থাপনা!

মুম্বাই, চেন্নাই, দিল্লীর কর্পোরেশন সে হিসাবে আত্মকেন্দ্রিক। তারা বিদেশী কেন, স্বদেশের হকারদের কাছ থেকে প্রাপ্য আদায় করে নেয়। তাদের সরকারও সেদিক থেকে সচেতন—ট্যাক্স আদায় করতে ভোলে না।

আরও একটি দিক বিবেচনা করুন—গোটা পশ্চিমবঙ্গে না হলেও কলকাতা শহরে। আমরা যেহেতু আত্মকেন্দ্রিক নই তাই দু' হাত বাড়িয়ে প্রতিবেশী রাজ্যের ধনকুবেরদের আদর করে ডেকে আনছি। গুরুদেব বলেছিলেন—গোটা ভারততীর্থের প্রসঙ্গে :

পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার
সেথা হতে সবে আনে উপহার
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে।
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে॥

চেলা আজ লিখতে বাধ্য হচ্ছেন— গোটা বাঙলার না হলেও বৃহত্তর কলকাতার প্রসঙ্গে :

পশ্চিম আজি খুলিয়া খিড়কি খানি
আসে গুটি গুটি বাম হাতে ব্ল্যাক মানি
ভিটে-মাটি নিতে, গর্দানা দিতে
ডিস্কো-ডান্সে মেতে,
এই বাঙালির মৃত কাঙালির
হায়! মহাশ্মশানেতে॥

চুন-সুরকির দশ ইঞ্চি গাঁথনির দেড়-দু'তলা বাড়িগুলি তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে। মহানগরীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে সাত-দশতলা আকাশচুম্বী প্রাসাদ! মার্বেল-ফিনিশ স্নোসেমিত সে-সব অ্যাপার্টমেন্টে একটা বাঙলা শব্দ শুনতে পাবেন না। গোকুল, বিনোদ, যদুগোপাল আর বেনীমাধবেরা কলকাতা ছেড়ে নগদবিদায় হাতে চলে যাচ্ছে শহরতলীতে, গ্রামে। তাই বলে, আমরা তো গোষ্ঠিবদ্ধ বা সাম্প্রদায়িক হতে পারি না! আত্মকেন্দ্রিক হতে পারি না।

আসুন এবার ক্ষুদ্রতর গণ্ডিতে : পারিবারিক আত্মকেন্দ্রিকতার প্রসঙ্গে। এমন একটা সময় ছিল যখন আমরা সবাই—এই আমাদের জমানাতেই—এক ছাদের তলায় বাস করতুম। একান্নবর্তী পরিবারে। গৃহকর্তা ছিলেন দাদু, মেজদাদু, ছোড়দাদু। জেঠু-বাবা-কাকা নিজ-নিজ উপার্জন অনুপাতে পে-প্যাকেটটা ধরে দিতেন কর্তামশায়ের হাতে। যাবতীয় খরচ করতেন কর্তামশাই। শুধু বধূমাতাদের আন্ডার-গার্মেন্টস্ আর মুখে মাখার হাবিজাবি কিনে আনার দায় ছিল বাবা-কাকার। অন্দরমহলে কর্তা-মা হচ্ছেন 'বেগম-সারাহ্'। তাঁর নির্দেশে বড়বৌমা-মেজ-ছুটকি পালা করে তরকারি কুটতেন, রান্না ও পরিবেশন করতেন। নাতি-নতিনিদের জামা-ইজেরের জন্য আসত গোটা থান-কাপড়। দর্জিকাকু আমাদের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের মাপ নিয়ে বানাতেন পুজোর পোশাক। বোঝা যেত না কার বাবা অফিসার, কার বাবা ইস্কুল-মাস্টার। নিত্যি বাজারে যেত: বড়দা-মেজদা-ছোড়দা-আম্মো। পালা করে।

জমানা বদলালো। দাদুরা স্বর্গে গেলেন। জেঠু, পরে বাবা, শেষে কাকা এসে হাল ধরলেন। একান্নবর্তী যৌথ সংসার তখনো অটুট।

মহাকালের রথচক্র আবার পাক খেল। বৈকুণ্ঠের উইল নিয়ে বিব্রত হল গোকুল আর বিনোদ। বদ্যিপাড়ার নিমাই রায়ের প্ররোচনায়। শরৎচন্দ্রের কলম ঠেকাতে পারল না পোড়াকপালে বাঙালির সর্বনাশ! ভেঙে গেল একান্নবর্তী পরিবার। বাবা-কাকারা যা পেরেছিলেন আমরা ক-ভাই তা পারলাম না। আদালত বা আর্বিট্রেটারের নির্দেশে ভাগাভাগি হয়ে গেল বসতবাড়ি। একেক জনের ভাগে দেড়-দু-কামরা। একেক ভাগে স্বামী-স্ত্রী দু-তিনটি বাচ্চা-কাচ্চা। মা-কাকিমারা যা বলেননি তাই বললেন আমাদের বেটার হাফ : বাব্বা! সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল! বাঁচলাম!

মহাকালের রথচক্র কিন্তু থামতে জানে না। দু-তিনটি শিশু বড় হল। প্রেম করল। বিয়ে করল। একে-একে নিজের-নিজের পায়রা-খোপে চলে গেল। উপায় কী? আপনি বুঝিয়া দেখ কার ঘর কর। প্রত্যেকের উপার্জন তো সমান নয়। আমরা বুড়ো-বুড়ি পড়ে রইলাম সাবেক ভিটের পায়রা-খোপ আঁকড়ে। ওরা সাধ্যমতো সপ্তাহান্তে আসে। সাধ্যমতো মায়ের হাতে কিছু হাত-খরচাও গুঁজে দিয়ে যায়। আমরা চাইনি—বিশ্বাস করুন, মনেপ্রাণে চাইনি—কিন্তু আমরা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেলাম। হতে বাধ্য হলাম।

এখনকার রেওয়াজ 'নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি'। ড্যাড-মম আর বেবি।

যে-যার ছোট ছোট সুখী গৃহকোণে!

আমাদের জমানাতেই দেখেছি, অনেকে পেনশন কম্যুট করে, রিটায়ারিং গ্র্যাচুইটি নিঃশেষ করে, সর্বস্ব খুইয়ে ছেলে-মেয়েদের মানুষ করেছে। ছেলেমেয়েরা বিয়ে করেছে, সংসার করেছে, ছড়িয়ে পড়েছে সারা ভারতে, সারা বিশ্বে। যে যার সুখী গৃহকোণে 'নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি'তে

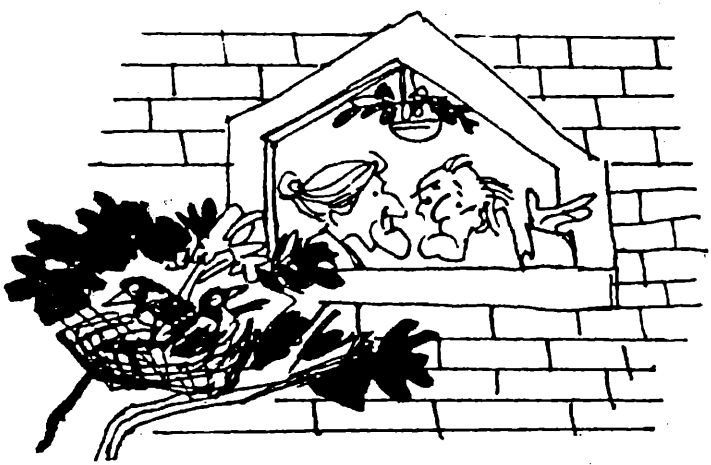

মসগুল। অন্যায় কথা বলব না, তারা অধিকাংশই ডলার-পাউন্ড-ডয়েশমার্ক পাঠিয়ে বুড়ো বাবা-মাকে আপ্রাণ সাহায্য করে। বুড়োবুড়ির মধ্যে কিছু যখন বিধবা বা বিপত্নিক হয়ে বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় নেয়, তখনও তারা খরচ পাঠায়। তারা আত্মকেন্দ্রিক নয়, তাদের বিবেচনা আছে।

যারা আমাদের অনুজ—অবসর নেবার পথে গুটি গুটি এগিয়ে আসছে, তারা আর সর্বস্ব খুইয়ে ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে অনিচ্ছুক। শেষের সেদিন ভয়ঙ্করের চিন্তায় তারা নিজ-নিজ ব্যবস্থা করার দিকে ঝুঁকছে। তারা কি আত্মকেন্দ্রিক? যদি হয়ই, তবু সেটা কি তাদের অপরাধ?

আত্মকেন্দ্রিকতার ধারণাটা আধুনিককালের এটা মনে করা ভুল। উদ্ভটসাগর যখন আত্মকেন্দ্রিকতার বীজমন্ত্রটি বপন করেছিলেন তখনো ইংরেজ-জমানা শুরু হয়নি। তখনি তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন—

আপদর্থে ধনং রক্ষেৎ দারাং রক্ষেৎ ধনৈরপি।
আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি॥

সাদা বাঙলায় এর 'শাঙ্করভাষ্য'টা হচ্ছে :

আপদ-বিপদ আশঙ্কাতেই সিন্দুকেতে টাকা রাখা,
গিন্নি যদি উল্টে পড়েন, বাঁচাও তাঁহার সিঁদুর-শাঁখা,
নিজেই যখন শিরপা হবে : যাক্ না গিন্নি, যাক টাকা॥

আত্মকেন্দ্রিকতার এই ঋষিবাক্য উপেক্ষা করে আমরা চোখকান বুজে জপ করে এসেছি : 'বসুধৈব কুটুম্বকম্।' বাঙলার পল্লীসমাজের শিরোমণিমশাই আর বেণীমাধবদের ছাপিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে রমা, রমেশ, জ্যাঠাইমা। শচীশের নিরীশ্বরবাদী জেঠামশাই, যাঁর জীবনমন্ত্র ছিল—'প্রচুরতর লোকের প্রভূততর উন্নতিবিধান'—তাঁরা সমাজকে ধরে রেখেছিলেন। দুর্ভাগ্য বাঙালির, তাঁরা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছেন। শাসকের বিরুদ্ধে, শোষকের বিরুদ্ধে, আত্মকেন্দ্রিকতার বিষ যারা ছড়াচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মতো জননেতা এই স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গদেশে ইদানীং আর জন্ম নিচ্ছেন না। সকলেই আখের গোছাতে ব্যস্ত, গদিতে উঠে বসাই তাদের একমাত্র পরমার্থ। বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্ররা নতুন করে 'সম্ভবামি' হচ্ছেন না।

আত্মকেন্দ্রিকতার দুটি ধারার আলোচনা করেছি। কিন্তু আরও একটি পর্যায় আলোচনা করা বাকি আছে। এটি একটি প্রয়োজনীয় গোষ্ঠিভিত্তিক আত্মকেন্দ্রিকতা। জুৎসই ভদ্র বাঙলা প্রতিশব্দ মনে পড়ছে না, তাই খিচুড়িভাষায় একে বলব : 'জেন্ডারভিত্তিক আত্মকেন্দ্রিকতা'।

'উইমেন্সলিব্' নয়, 'স্ত্রী-স্বাধীনতা' নয়—স্বাধীনতালাভের প্রাগ্‌বর্তীকালে আত্মরক্ষায় সক্ষম হওয়া। কথাটা আগেও বলেছি, বারে বারে বলেছি, তবু আবারও বলতে চাই। যৌবনে বলেছি—মা-মাসি-বোনেদের, প্রৌঢ়ত্বে কন্যাস্থানীয় এবং বধূমাতাদের, এখন 'পারের-কড়ি গুনে দেবার' প্রাক্কালে বলব দিদিভাইদের, নাতবৌদের! কি জান দিদিভাই—কোন কোন কথা বারে বারে বলতে হয়। জ্যোহা-সাম মিনারচূড়া থেকে কি একই আজানধ্বনি দেওয়া হয় না? গান্ধিজী কি তাঁর শেষ জীবনের সান্ধ্যপ্রার্থনা-

সভায় একই কথা বারে-বারে বলে যাননি : 'ঈশ্বর-আল্লা তেরে নাম .....'? সুচিত্রা মিত্রের ক্যাসেটটা যখনই চাপাই সে একই গান শুনিয়ে চলে—'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আ-সে!'

দিদিভাইদের স্বার্থে এই যে 'জেন্ডারভিত্তিক আত্মকেন্দ্রিকতার' পৃষ্ঠপোষকতা করছি এজন্য চারানা দায়ী এক-চোখো ভগবান, বাকি বারো-আনা পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বেলেল্লাপনা। প্রজাতিগত প্রবহমানতার স্বার্থে পুরুষ-স্ত্রী দুজনকেই হাত মেলাতে হয়। কিন্তু ভগবানের বিচারে—না হয় দোষটা প্রকৃতির ঘাড়েই চাপাও—ধরা পড়ে স্ত্রীলোক, পুরুষ নয়। নারী নয় মাস দশ দিন যখন প্রজাতির মুখ চেয়ে তার আসন্ন মাতৃত্বের প্রকাশ্য স্বীকৃতি দেয়, সযত্নে গর্ভরক্ষা করে, তখন ভ্রূণের পিতা হয়তো ভ্রমরের মতো ফুলে ফুলে মধুপানরত।

কখনো শুনেছেন কলেজ-ফের্তা কোনও তরুণ ছাত্রকে বেপাড়ার মেয়েরা ঘিরে ধরে 'ঈভটিজিং' করছে? অথবা বিপরীত-বলাৎকার

করছে? অথবা নার্সিংহোমের একান্ত কেবিনে শয্যাশায়ী কোন যুবককে একা পেয়ে কোন নার্স জোর করে ধরে চুমু খেয়েছে? কিংবা তার পায়জামার দড়ি ধরে টানাটানি করেছে? নেভার!

কিন্তু এর কনভার্স থিওরেমটা? দৈনিক সংবাদপত্রের দৈনিক পরিবর্ধনে তা ক্লান্তিকর। ক্রমাগত 'ঈভটিজিং', ক্রমাগত হাত ধরে টানা, ব্লাউজ ছিঁড়ে দেবার চেষ্টা! আমি সাংবাদিক নই, আমার কাছে সংখ্যাতত্ত্ব নেই—তবু খবরের কাগজে নামগুলো দেখে দেখে আমি একটা ধারণার বশবর্তী হয়েছি। গোকুল-বিনোদ-বেনীমাধব-অমল-কমল এবং ইন্দ্রজিৎদের নাম খুবই কম। সংখ্যাগরিষ্ঠ নামের তালিকায় আছে : রাকেশ, ব্রিজলাল, সাক্সেনা, মেহ্‌তা, লছমনপ্রসাদ এবং করিম, ফকরুদ্দিন, খালেদ, আলি প্রভৃতি। এ কি আমার দৃষ্টিবিভ্রম? স্বভাবজাত আত্মকেন্দ্রিকতাজনিত ভ্রান্ত ধারণা? জানি না।

বিশেষ-বয়েসের বঙ্গবাসিনী মেয়েদের—আমার দিদিভাই আর নাতবৌদের বলব : তোমরা 'জেন্ডারভিত্তিক একান্তচারী' হয়ে ওঠো। শুধু বাঙালি মেয়েকে এ কথা বলছি না— বাংলায় বসবাসকারী সব্বাইকেই— গুজরাতি, মদ্রদেশীয়, রাজস্থানীয়া, ওড়িয়া সব—সব মেয়েকেই বলছি।

বছর-চারেক আগে আনন্দবাজার সম্পাদকীয়তে (১২.০১.৯৯) সম্পাদক লিখেছিলেন :

"নারীনিগ্রহের ঘটনা ক্রমেই বাড়িতেছে। ওড়িশার অঞ্জনা মিত্রের উপর যে পাশবিক অত্যাচার হইয়াছে তাহা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে। মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে অনুরূপ ঘটনা নিয়তই ঘটিয়া চলিয়াছে। এমনকি যে পশ্চিমবঙ্গকে রাজ্যের প্রভাবশালী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সারা ভারতের মধ্যে এ রাজ্যকে আইনশৃঙ্খলার মরূদ্যান বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন, সেখানেও মহিলাদের লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ বাড়িয়াই চলিয়াছে। নিগ্রহকারী দুষ্কৃতিকারীদের শাস্তি না পাওয়া, উপরন্তু তাহাদের পুরস্কৃত হওয়া ..... নারীনিগ্রহের ঘটনাবৃদ্ধিকে সাহায্য করে। অধিকাংশ দুষ্কৃতিকারী কোনও-না-কোনও রাজনৈতিক দলের আশ্রিত হওয়ায় মহিলাদিগের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধী সচরাচর ধরা পড়ে না। ..... শেষ পর্যন্ত সব কিছু ধামাচাপা পড়িয়া যায়।"

গোটা ভারতবর্ষেই শুধু নয় এই পশ্চিমবঙ্গেও সেই ট্র্যাডিশন সমানে

চলেছে! তার প্রমাণ এ মাসের সংবাদপত্রেই একের পর এক প্রকাশিত। সেই বানতলার ঐতিহ্য মেনেই গতমাসে নদিয়ার ধানতলায় ঘটে গেল এক নৃশংস গণবলাৎকারের ঘটনা। তার জের মিটতে-না-মিটতেই কোচবিহারের ঘোড়সাডাঙায় আবার ঘটল আর একটা গণবলাৎকারের ঘটনা। এবার হতভাগিনী ক্ষমতাশালী দলেরই সদস্যা—স্থানীয় মস্তানদের বিরুদ্ধে সে মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছিল। ফলে নিজ পার্টির স্থানীয় মস্তানদের দ্বারা গণধর্ষিতা। মহিলাটি থানায় গিয়ে এজাহার দিলেন। থানায় অফিসার ভাল পরামর্শ দিয়েছিল মেয়েটিকে। পরদিনের সংবাদপত্রে

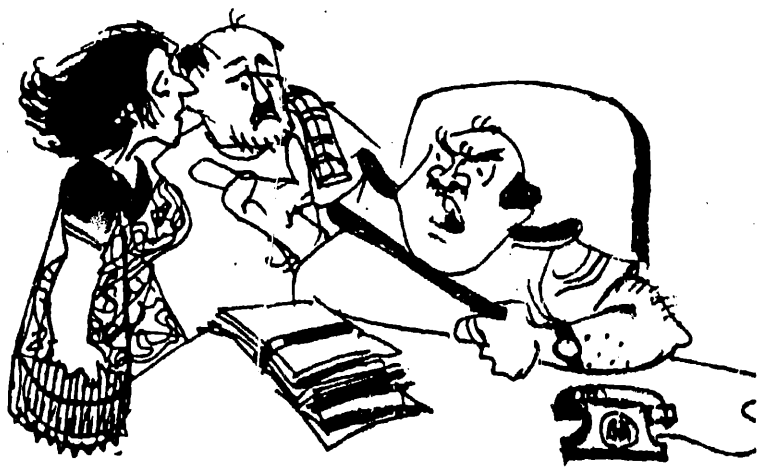

দেখলাম। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই এই গোটা মরূদ্যানের পার্টি সেক্রেটারি আলিমুদ্দিন স্ট্রিট থেকে ফতোয়া জারী করলেন : এ ঘটনা সর্বৈব মিথ্যা! আবেদনকারিণীর চরিত্রদোষ ছিল। এসব ঘটনা ঘটেনি—এসব বামফ্রন্ট বিরোধীদের মিথ্যা প্রচার।

কিমাশ্চর্যমিদংপরম্—সি.পি.এম.-এর মহিলা সংগঠন গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতিও সে কথায় সায় দিলেন। তবে ভরাডুবি বোধহয় এখনো হয়নি। আজকের আনন্দবাজারে (২৫.০৩.০৩ পৃষ্ঠা ৫) দেখছি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী—এখন আর তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নন, গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সভায় বলেছেন :

"কোনও মহিলার উপর অপরাধ হচ্ছে দেখলে রাস্তায় নামুন। বামফ্রন্টের গায়ে আঁচড় লাগবে, এমন ভাবার কারণ নেই। বরং সেই সরকারকেই জিজ্ঞাসা করতে হবে, অপরাধ যে হয়েছে, তার বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?"

পার্টি-সেক্রেটারির বক্তব্যের বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এ জাতীয় সত্যভাষণে আমরা আশ্বস্ত হচ্ছি। তিনি তাঁর পূর্বসূরীর মতো বলেননি : এস্তাই তো হোন্দাই রহ্‌তা—এমনটা তো হয়েই থাকে! মামলা চলছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে অপরাধীরা থানায় আত্মসমর্পণ করেছে। ধামাচাপা-দেবার দড়ি টানাটানিও এখনো চলেছে।

শেষ মন্তব্যের সময় আসেনি।

আজ থেকে দীর্ঘ সাত-দশক আগেকার একটি তথ্য তোমাদের সামনে মেলে ধরছি। আত্মরক্ষার জন্য আত্মকেন্দ্রিক হবার পরামর্শ দিয়েছিলেন আজ থেকে চুয়াত্তর বছর আগে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের রবীন্দ্র স্মারক সংখ্যায় অমল হোম লিখেছিলেন (P. 94) :

Prof. Takagaki, a famous exponent of the art of Jujitsu, comes to Shantiniketan at Tagore's invitation, the poet having felt that Bengali boys and **GIRLS** stood in great need of training in this art of self-defence. [কবির আমন্ত্রণে জাপান থেকে অধ্যাপক তাকাগাকি শান্তিনিকেতনে এলেন ছেলেমেয়েদের জিজুৎসু শেখাতে। প্রফেসর তাকাগাকি ছিলেন জিজুৎসু-বিদ্যায় মহাপারদর্শী। কবি বুঝতে পেরেছিলেন যে, বাঙালি ছেলে এবং **মেয়েদের** পক্ষে এই আত্মরক্ষামূলক সামরিক বিদ্যাটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।]

তাকাগাকি বছর-তিনেক শান্তিনিকেতনে ছিলেন। ছাত্র ও ছাত্রীদের পৃথকভাবে ওই সামরিক বিদ্যায় শিক্ষিত করে তোলেন। তারপর নিতান্ত অর্থাভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বিদায় দিতে বাধ্য হন। এই সময়ে কবি দুটি প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদন করেছিলেন—প্রথমটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয়টি ক্যালকাটা কর্পোরেশন। কবির প্রস্তাব ছিল যে, ওই দুটি

প্রতিষ্ঠান যদি অধ্যাপক তাকাগাকিকে চার-চার মাস করে নিযুক্ত করেন, তাহলে তাঁকে জাপানে ফিরে যেতে হয় না। কেউ কর্ণপাত করেনি। তাকাগাকি ফিরে যান। প্রসঙ্গত—স্যার আশুতোষ তার পূর্বেই প্রয়াত।

রবীন্দ্রনাথের ওই প্রচেষ্টার তিন দশক আগে একই সমস্যার একজাতের সমাধানে উদ্যোগী হয়েছিলেন তদানীন্তন বাঙালি 'আত্মকেন্দ্রিক' নেতার দল! তাঁরা ছোট ছোট দল গড়লেন। গড়ে উঠেছিল মানিকতলায় ব্যারিস্টার প্রমথ মিত্রের আখড়া, চন্দননগরে চারু রায় বা ঢাকায় অনুশীলন দলের পুলিন দাশের আখড়া। এসব স্থলে মূলত আত্মরক্ষার শিক্ষা দেওয়া হত শুধু ছেলেদের। মেয়েদের নিয়ে এমন আখড়া গড়ে তোলা তখন হয়তো ছিল অবাস্তব প্রস্তাব।

কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করার মতো অগ্নিকন্যাকে সেকালে জন্ম দিলেন বঙ্গজননী। মেয়েদের পৃথকভাবে আত্মরক্ষামূলক শিক্ষায় শিক্ষিত করেছিলেন এক মহীয়সী মহিলা : সরলা দেবী চৌধুরানী (1872–1945)। ইংরেজি অনার্সে মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়ে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লাভ করেছিলেন 'পদ্মাবতী স্বর্ণপদক'। সুদূর মহীশূরে গিয়ে 'মহারানী বিদ্যালয়ে' শুরু করলেন শিক্ষকতার জীবন। কিন্তু শুধু বাণীবন্দনায় তৃপ্ত থাকতে পারলেন না। ফিরে এলেন এই বাংলায়—খর্পরধারিণীকে বুক চিরে রক্ত দান করতে। প্রচলন করলেন 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' 'বীরাষ্টমী ব্রত'। রাজনৈতিক জীবনে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এলেন পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপৎ আর তিলক মহারাজের। মহাত্মাজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে তৃপ্ত থাকতে পারলেন না তিনি। যোগ দিলেন বিপ্লবী দলে। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত প্রথম পাঁচজন আদিসূরীর নাম করতে হলে যে তোমাদের উচ্চারণ করতে হবে একটি মহিলার নাম। তিনি ওই অগ্নিকন্যা 'সরলাবালা দেবী চৌধুরানী'। অপর চারজন : প্রমথনাথ মল্লিক, শ্রীঅরবিন্দ, সুরেন ঠাকুর আর সুবোধ মল্লিক। নেপথ্য থেকে এঁদের অর্থসাহায্য করতেন একাধিক দানবীর : রাজা সুবোধ মল্লিক, স্যার তারকনাথ এবং তাঁর পুত্র লোকেন্দ্রনাথ পালিত। সরলাদেবীর নির্বন্ধাতিশয্যে আখড়ায় মেয়েদের পৃথকভাবে শুধু লাঠিখেলা নয়,

ছোরাখেলা, এমন কি তলোয়ার চালনায় শিক্ষা দেওয়া শুরু হল। সরলা স্বয়ং তলোয়ার চালনায় দক্ষ ছিলেন— মেয়েদের তা শেখাতেন। চারুচন্দ্র দত্ত আই. সি. এস. তাঁর 'পুরানো কথা—উপসংহার' গ্রন্থে জানিয়েছেন এইসব আখড়ায় শুধু ছেলেদের নয় মেয়েদেরও লাঠি ও ছোরা খেলা শেখানো হত। এছাড়াও ছিল আত্মরক্ষামূলক জিজুৎসু শিক্ষা। চারুচন্দ্র আরও লিখেছেন—এ সব কাজে গোপন সমর্থন ও সাহায্য করতেন একজন বিশ্ববিশ্রুত বাঙালি কবি। তাঁর নামটা আই. সি. এস.-লেখক সে আমলে অনুল্লেখিত রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেছিলেন।

কী দুঃখের কথা—কী অপরিসীম দুঃখের কথা : আজকের কোন জননেতা বা নেত্রী এমন 'আত্মকেন্দ্রিক' আত্মরক্ষার দল গঠনে উৎসাহিত নন! তাঁদের কর্তব্যবোধের শেষ দিগন্ত 'বাঙলান্‌ধ্‌' আর 'রেল রোখো'!

বেডেন পাওয়েলের ভগিনী অ্যাগ্‌নেস্‌ পাওয়েলের গার্লস-গাইড এখন নিশ্চিহ্ন ; গুরুসদয়ের 'ব্রতচারিণীর' দলও তথৈবচ। মেয়েদের নিয়ে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে কোনো আত্মকেন্দ্রিক-সংগঠন তারপর আর গড়ে ওঠেনি। কিন্তু মাঝে মাঝে সেই সরলা দেবী বা রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ এখনো বিদ্যুৎচমকে ঝল্‌সে ওঠে। একটা উদাহরণ শোনাই—বছর সাতেক আগেকার কথা। প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রেই খবরটা প্রকাশিত হয়েছিল :

হিন্দ অথবা ম্যাজেস্টিক সিনেমায় 'নুন-শো'-তে দেখানো হচ্ছে 'এন্টার দ্য ড্রাগন' ছবিখানা। ক্যারাটে বিষয়ে একটা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছায়াছবি। কয়েকটি কলেজ পালানো মেয়ে এসে লাইনে দাঁড়িয়েছে। টিকেট-কাউন্টারের সামনে লম্বা কিউ-সরীসৃপের লেজে জনা পঞ্চাশ বেকার পুরুষ। তারা মারপিটের ছবি দেখতে ভালবাসে। তাদের দৃষ্টির সামনেই কয়েকটি চোঙাপ্যান্ট পার্টি-মস্তান ওই তিন-চারটি মেয়েকে নিয়ে ক্রমাগত রসিকতা মশকরা শুরু করল। যাকে বলে 'দুপুরে-মাতন ঈভটিজিং'। মেয়েরা সংখ্যায় জনা তিনেক। ছেলেরা সাত আটজন। প্রথমপক্ষ নিশ্চুপ। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ হজম করে যাচ্ছে। রঙ্গ-রসিকতা ক্রমে শ্লীলতার মাত্রা ছাড়াতে শুরু করল। কিউ-সরীসৃপ বিনা প্রতিবাদে বিনা-

পয়সায় তামাসা দেখছে। অবস্থা তাদের অনুকূল সমঝে নিয়ে একটি দুঃসাহসী ছোকরা 'এন্টার দ্য ড্র্যাগন' করে বসল, ড্র্যাগনের ল্যাজে পা দিয়ে। অর্থাৎ ফস্ করে জনৈকার কোমলাঙ্গে হাত দিয়ে বসল।

দুর্ভাগ্য ছেলেটির। তার জানা ছিল না, ওই মেয়েটির দিদিমার শাশুড়ি অথবা মায়ের দিদি-শাশুড়ি এককালে শান্তিনিকেতনে প্রফেসর তাকাগাকির কাছে জিজুৎসু-বিদ্যা শিখেছিলেন এবং ওদের পরিবারে সেই গুর্বীমুখীবিদ্যাটা বংশপরম্পরায় সুরক্ষিত। এ তথ্যটা জানা না থাকায় সেই ঈভটিজার ছোকরাটি দেখতে পেল যোজনবিস্তৃত সরষেফুলের ক্ষেত। মেয়েটি বিদ্যুদ্‌গতিতে লাইন ছেড়ে বেরিয়ে এসে হিল-তোলা জুতোয় মোক্ষম একটা লাথি কষিয়ে দিল ছোকরার তলপেটে—'ক্যাঁৎ' করে। ছেলেটির কণ্ঠনালী দিয়ে এক সিলেব্লের একটা শব্দ বার হল—'অঁক'। কাটা কলাগাছের মতো লুটিয়ে পড়ল ফুটপাতে। আর উঠল না। মুহূর্তের মধ্যে এগিয়ে এল তার দোস্তের দল। সকলেরই চোঙাপ্যান্ট, হাতে 'ইস্টিলের বালা', রঙিন গেঞ্জি, গলায় তক্তি, মাথায় পাখির বাসার চূড়ো—'টিসম্-টিসম্' সিকোয়েন্সের প্রচলিত কস্টিয়ুম। তাদের দু-একজনের হাতে খাপখোলা ঝকঝকে ছোরা।

স্বচক্ষে দেখিনি। সাংবাদিক যা কাগজে ছাপিয়েছিলেন তাই লিখে যাচ্ছি—মেয়েদের দলে দু-জন ছিল ক্যারাটে-বিদ্যায় পারদর্শী। তাদের হাতঘড়িতে সেকেন্ডের কাঁটাটা পুরো এক পাক মারার আগেই তিনটি মস্তান ফুটপাতে শয্যা পেতেছে। বাকি তিনজন জান বাঁচাতে রুদ্ধশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে।

কথাশিল্পীর কল্পনা নয়। বাস্তব তথ্য।

মেয়েটির মায়ের দিদি-শাশুড়ির 'আত্মকেন্দ্রিকতা'র সুফল ফলেছে পাঁচ ছয়-দশক পার হয়ে এসে—একালের কলকাতায়।

ক্ষেত্র কিন্তু প্রস্তুত। এবার আর শোনা কথা নয়। প্রত্যক্ষ দেখে এলাম তারকেশ্বরে। এই তো সেদিন—আটানব্বই সালের জানুয়ারিতে। ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের তারকেশ্বর শাখার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব। আমন্ত্রিত হয়ে যোগ দিতে গেছি সস্ত্রীক। গেস্ট-হাউসে আমাদের দেখভাল

করছিল বন্দনা। বন্দনা সান্যাল। আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপচারিতে জানালো তার দুটি সন্তান। দুটিই পুত্র। বড়টি তখন সবে হায়ার-সেকেন্ডারি পাস করে বেকার। পাস করেছিল ভাল ভাবেই। কিন্তু তারপর আর সে পড়তে চাইল না।

বাপ্ বললে, বি.এ., বি.এস্‌সি না পড়িস্ জয়েন্ট-এন্ট্রান্সটা তো দিবি? ছেলে ঘট্-ঘট্ করে মাথা নাড়ে।

—তাহলে কী করবি? চাকরি? না ব্যবসা?

আবার নেতিবাচক গ্রীবাভঙ্গি।

বাপ রেগে-মেগে বলে, তাহলে একঝুড়ি ভ্যারেন্ডা নিয়ে আসি? বাড়িতে বসে বসে তাই ভাজ! কী রে?

বন্দনা ধমক দেয়, আগে থেকেই বকাবকি করছ কেন? শোন না, ও কী করতে চায়।

কৌশিক এতক্ষণে কথা বলে : আমি ক্যারাটে শেখাব!

ক্যারাটে! তার মানে? কে শিখবে? কেন শিখবে?

কৌশিক ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে। স্কুলের উঁচুক্লাসে উঠেই সে নিরলস নিষ্ঠায় ক্যারাটে শিখতে শুরু করে একজন ক্যারাটে গুরুর কাছে। ওই আত্মরক্ষামূলক সামরিক বিদ্যাটা সে যত্ন নিয়ে শিখেছে। বাড়ির কেউ জানে না। সে এখন 'ব্ল্যাক-বেল্ট'।

অর্থাৎ ক্যারাটে-বিদ্যায় পোস্ট-গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে ডক্টরেট!

কৌশিক ধীরে-ধীরে তারকেশ্বর-হরিপাল লাইনে বিভিন্ন ক্লাবের সঙ্গে যোগাযোগ করল। তারা আইডিয়াটা লুফে নিল। সন্ধ্যার পর সে পর্যায়ক্রমে এক এক ক্লাবে গিয়ে ক্যারাটে শেখায়। ছেলে আর মেয়েদের ভিন্ন ভিন্ন ক্লাসে। হ্যাঁ, মেয়েরাও। তের-চৌদ্দ থেকে বিশ-বাইশ! মেয়েদের অভিভাবকেরা আপত্তির কোন কারণ খুঁজে পাননি—ওই তরুণ বয়স্ক শিক্ষকটির হাতে তাঁদের অনূঢ়া কন্যাসন্তানদের তুলে দিতে! সর্বসমক্ষেই সে শেখায়। মেয়েরা পুরো হাতা জামা ও পায়জামা পরে ক্যারাটে শেখে! কারও কোন অসুবিধা হয় না।

ক্রমে বর্ধমান-হাওড়া মেন-লাইনেও অনেক শহরে কৌশিক সান্যাল

ছেলে ও মেয়েদের পৃথক পৃথকভাবে ক্যারাটে শেখায়। শুনেছি তার উপার্জন ভালই। অন্তত জুনিয়ার-কেরানি হলে যা রোজগার করত তার চেয়ে বেশি।

এ থেকে কী প্রমাণ হয়? এটাই প্রতিষ্ঠিত হয় যে, ক্ষেত্র প্রস্তুত। শুধু সমাজ-সংগঠকেরা অ-প্রস্তুত। বীজক্ষেত তর্ হয়ে থাকলে কী হবে? বীজ-ধানের সরবরাহ নেই। পি. মিত্র, পুলিন দাশ, সরলাবালা, রবীন্দ্রনাথের মতো দেশনেতা ও সংগঠক—যাঁরা মেয়েদের আত্মরক্ষায় আত্মকেন্দ্রিক সাধনায় ব্রতী হতে বলেছেন—তাঁরা সরে গেছেন ইতিহাসের নেপথ্যে। আজ যাঁরা জননেতা তাঁদের একটিমাত্র দেশসেবার আয়োজন—প্রাপ্তবয়স্কদের উদ্বুদ্ধ করা, যেন তাঁরা আগামী নির্বাচনে তাঁকে ভোট দেয়! আত্মকেন্দ্রিকতা বর্জন করে সবাই যেন রাজনৈতিক পার্টিকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে।

স্বীকার করি : সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে-গঞ্জে ক্যারাটে বিদ্যার হাজার-হাজার আখড়া গড়ে তোলা বিরাট কর্মযজ্ঞ। কিন্তু এটাই যে একমাত্র পথ : মেয়েদের আত্মরক্ষার প্রয়োজনে। পুলিশ কিছু করবে না। থানা ডায়েরি লিখবে না, লিখলেও পার্টি-কর্তার নির্দেশ আসবে : ধামাচাপা দাও।

জেন্ডারভিত্তিক আত্মকেন্দ্রিকতা কিন্তু দু-জাতের হওয়া দরকার।

একটার কথা এই মাত্র বলেছি : শারীরিক ও মানসিক আত্মমর্যাদা রক্ষার্থে।

দ্বিতীয়টার কথা এবার বলব : আর্থিক ও পারিবারিক আত্মমর্যাদা রক্ষার্থে।

দুটোকেই এককথায় বলা যায় : ইজ্জৎ-কা-সওয়াল।

মেয়েদের অর্থনৈতিক মর্যাদাবৃদ্ধির জন্য আমরা পশ্চিমবঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ঘটিয়েছি। তারা কলেজ থেকে ডিগ্রি পেয়েছে, শিক্ষিত হয়েছে। তাদের একটা বৃহৎ অংশ চাকরি-বাকরি ধরেছে। অনেকে পুরুষদের কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে ডাক্তারি-এঞ্জিনিয়ারিং-আইন-কম্পুটার-সায়েন্স শিখে

উপার্জনক্ষম হয়েছে। কারও বা আর্থিক সুযোগ অথবা মেধা না থাকায় নার্সিংও শিখতে হয়েছে। তারাও উপার্জনক্ষম। সংসারে সাহায্য করতে পারবে। তাদের পারিবারিক মর্যাদা নিশ্চয় বেড়েছে। কিন্তু যারা পাস করেও কাজকর্ম পায়নি—তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ—তারা বেকার-সমস্যাকে আরও শোচনীয় করে তুলেছে মাত্র।

এই প্রেক্ষিতে এবার আপনাদের ওপার বাঙলার কিছু কথা শোনাই। তথ্যটা প্রথম জেনেছিলাম নেতাজি ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজ-এর ইতিহাস শিক্ষক বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধে। পরে বাঙলা দেশে সরেজমিন তদন্তে জেনেছি আরও ব্যাপকভাবে। কাহিনীর নায়ক : মুহম্মদ ইউনিস। মার্কিনমুলুক থেকে ডিগ্রিধারী এই অর্থনীতিবিদ ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির এক তরুণ শিক্ষক। গ্রামোন্নয়নের তত্ত্ব নিয়ে কী একটা সেমিনারের তথ্য সংগ্রহ করতে ইউনিস বেরিয়ে পড়েন বাংলাদেশের গ্রাম পরিক্রমায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়নবাতি উদ্ভাসিত স্টাডিরুমের বাইরে এসে দেখতে পেলেন—তত্ত্বে আর প্রয়োগে কী আসমান-জমিন ফারাক। গ্রামের ওইসব দরিদ্র হতভাগ্য মানুষেরাই ইউনুসকে কেতাবি অর্থনীতির নিরুপদ্রব পরিবেশের বাইরে টেনে আনল।

তাঁকে প্রথমে উদ্বুদ্ধ করেন প্রত্যন্ত গ্রামের এক মুসলমান মহিলা শিল্পী। তিনি মোড়া তৈরি করে দুনিয়াদারীর দুকুড়ি-সাতের খেলা খেলে চলেছেন। পরিচ্ছন্ন, দৃষ্টিনন্দন শিল্পকর্ম, কিন্তু উপার্জন সারাদিনের পরিশ্রমে গড়া মোড়াপিছু মাত্র দশ আনা! কেন? প্রথমত, যদিচ বাঁশ গ্রামেই পাওয়া যায়, কিন্তু ওই কাঁচামাল খরিদ করার সঙ্গতি তাঁর নেই; দ্বিতীয়ত, শহরগঞ্জে গিয়ে বিক্রি করার ক্ষমতাও নেই তাঁর। পাইকারকে বেচে দিতে হয় আধাদামে। তাই শহরগঞ্জে যে মোড়াটি বিক্রি করা হয় পাঁচ-সাত টাকায় তার জন্য সৃষ্টিকর্ত্রীর উপার্জন দশ আনা!

ইউনুস প্রথমে ভেবেছিলেন মূলধনের সামান্য ক'টা টাকা নিজেই দিয়ে দেবেন ; কিন্তু পরে ভেবে দেখলেন, সেটা উচিত হবে না। তিনি সারা গ্রাম পরিক্রমা করে ওই জাতীয় বেয়াল্লিশ জন মোড়াশিল্পীর নামধাম

সংগ্রহ করলেন। দেখা গেল, ওঁদের সর্বমোট মূলধনের প্রয়োজন আটশো ছাপ্পান্ন টাকা। এই মূলধনটুকুর অভাবে ওই বেয়াল্লিশজন মহিলা 'অস্তি-দল'-এর গোলামি করতে বাধ্য হচ্ছেন। অর্থনীতির ক্লাসে কম্প্যুটারে যিনি কোটি-কোটি টাকার আঁক কষেছেন তিনি বুঝতে পারলেন, বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে সেসব তাত্ত্বিক আলোচনা কী পরিমাণে অবান্তর, অর্থহীন!

ইউনুস নিজের জেব থেকে আটশো ছাপ্পান্ন টাকা ওঁদের যৌথভাবে কর্জ দিয়ে বললেন, সুবিধামতো শোধ করে দেবেন, আম্মাজানেরা।

এলেন শহরের ব্যাঙ্কে। ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে বিস্তর বোঝালেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ক্লাসের গবেটতম ছাত্রটাও বোধহয় এক্ষেত্রে বলতো, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, এবার বুঝেছি স্যার'; কিন্তু ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার বুঝলেন না। বললেন, 'আপনি বুঝতে পারছেন না স্যার, একটা গ্রামে দয়াপরবশ হয়ে আপনার সাড়ে আটশো টাকা গ্যাঁটগচ্চা দেওয়া এক জিনিস আর বিনা-জামানতে শত শত অজানা-অচেনা মহিলাকে হাজার-হাজার টাকা কর্জ দেওয়া সম্পূর্ণ অন্য জিনিস।'

ইউনুস প্রতিবাদ করেছিলেন, না, না। গ্যাঁটগচ্চা দেব কেন? আমি তো ধার দিয়েছি মাত্র।

ম্যানেজার হেসে বললেন স্থান-কাল-পাত্রের রিলেটিভিটি, স্যার! বছরখানেক পরে আপনি নিজেই বুঝবেন, শব্দ দুটি সমার্থক। ধার ইজুক্যালটু দান ইজুক্যালটু গ্যাঁটগচ্চা!

এ-ঘটনা সত্তরের দশকে। পাকিস্তানের কবলমুক্ত বাংলাদেশ তখন শিশুমাত্র। ইউনুস সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন, 'বাংলাদেশ প্যাকেজ'!

বৎসরান্তে আটশো ছাপান্ন টাকা ফেরত নিয়ে গিয়ে দেখালেন সেই ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে। বললেন, 'আপনার অঙ্কটা মেলেনি। বেয়াল্লিশজন মহিলা বেশ কিছু উপার্জন করে এই দেখুন আমার টাকাটা সম্পূর্ণ ফেরত দিয়েছেন!'

ম্যানেজার এবারও বামচক্ষুটি নিমীলিত করে বললেন, অঙ্কটা আমার ভুল হয়নি, স্যার! ওই আটশো ছাপ্পান্ন টাকা যদি পেতনীর বাপের শ্রাদ্ধে বিনিয়োগ না করে আমার ব্যাঙ্কে গতবছর ফিক্সড-ডিপোজিট করতেন

তাহলে সুদে-আসলে ওটা হয়ে যেত—

ইউনুস বাকিটা শোনেননি।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি নিয়ে ইউনুস টাঙ্গাইলে এলেন। নতুন জায়গা, বিশেষ জানাশোনাও নেই। বড় বড় ব্যাঙ্কারদের কাছে গিয়ে তাঁর প্রস্তাবটা দিলেন। সুবিধা হল না। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল, উনি পেট্রো-ডলার পাচ্ছেন! এই গ্রামীণ ঋণ প্রকল্প বাস্তবে একটা মার্কিন চক্রান্তমাত্র। টাকাটা বিলিয়ে ইউনুস গরিবগুর্বোদের বৈপ্লবিক চেতনায় ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেবার কাজে মার্কিন এজেন্ট।

ইউনুস হার মানেননি। তিনি গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করলেন।

নেতাজী ইন্সটিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজ-এর শিক্ষক জানাচ্ছেন (আনন্দবাজার, 7.1.99) 1998 পর্যন্ত ওই গ্রামীণ ব্যাঙ্ক প্রায় এগারো হাজার কোটি টাকার মতো ঋণ দিয়েছে। অক্টোবর 1998-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, পনেরোটি জেলায় 38,875টি গ্রাম এই গ্রামীণ ব্যাঙ্কের আওতায় এসেছে।

"ঋণগ্রহীতাদের অধিকাংশই হলেন দুঃস্থা মহিলা। বাইশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার নয়শো ছয়জন মহিলা গ্রহীতার তুলনায় পুরুষদের সংখ্যা 1,24,600 জন। অর্থাৎ ঋণগ্রহীতার 95% মহিলা। 1998-এর প্রতিবেদন বলছে, "একবছরের মেয়াদ অতিক্রান্ত হবার পরও শোধ দিতে পারেননি এমন ঋণগ্রহীতা মাত্র 7.8% অর্থাৎ ঋণ শোধের হার 92 শতাংশেরও বেশি।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের এই কর্মকাণ্ডে নারী-পুরুষ সম্পর্কেও নীরব কিন্তু সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা হল। যেসব স্বামী জরুকে জড়-মাংসপিণ্ড বই অন্যকিছু মনে করতেন না, তাঁরা দেখলেন তাঁদের অশিক্ষিত গ্রাম্য স্ত্রীরা রীতিমতো হিসেব রাখতে পারেন, ঋণ নিয়ে শোধ করতে পারেন, সর্বোপরি ঋণের টাকায় সংসারের হাল ফেরাতে পারেন। ফলে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছু পরিবর্তন আসতে বাধ্য। গ্রামীণ সমাজের অচলায়তনের প্রেক্ষিতে এই পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ।"

ইউনুস এই পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছেন বাংলাদেশের কোনও মন্ত্রিত্বপদ গ্রহণ করে নয় কিন্তু!

ভারতেও অবশ্য অর্থনীতিতে যুগান্তর এসেছে। অর্থনীতিতে অমর্ত্য সেন নোবেল লরিয়েট হবার ছয়মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন : অমর্ত্য সেনকে, জীবিতাবস্থায় 'ভারতরত্ন' উপাধি দেওয়া যায়। সুভাষচন্দ্র বা সর্দার প্যাটেলের মতো ত্রিশ-চল্লিশ বছর অপেক্ষা করার কোনও প্রয়োজন নেই। অমর্ত্য সেনের সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশ করার ব্যবস্থাও হয়েছে। ইংরেজিতে অবশ্য। বাংলাদেশের তুলনায় ভারত কিন্তু অর্থনীতিতে পিছিয়ে নেই, কী বলেন?

মহম্মদ ইউনুসের কাণ্ডকারখানা আমি স্বচক্ষে দেখিনি। নেতাজি ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজ-এর ইতিহাসের শিক্ষকের রচনায় তাঁর কর্মকাণ্ডের কথা জেনেছি মাত্র। বাংলাদেশের রেলমন্ত্রিত্ব দূর-অস্ত, তিনি কোনও গ্রাম-পঞ্চায়েতের সদস্য হবার জন্যও কোনওদিন ভোটপ্রার্থী হননি, অথচ বাংলাদেশের প্রায় চল্লিশ হাজার গ্রামে বাইশ লক্ষ মহিলা তাঁর গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সংসারের হাল ফিরিয়ে ফেলেছেন।

প্রফেসর ইউনুস প্রতিবেশী রাজ্যের মা-বোনদের পরামর্শ দিয়েছিলেন আত্মকেন্দ্রিক হতে। খসম আর আব্বাজানের প্রবল বিরোধিতা উপেক্ষা করে ঘরের বাইরে বার হয়ে আসতে—সমবায়-প্রতিষ্ঠানের ছামুতে। বোরখা খুলে ফেলার পরিবেশ, সংস্কার যদি বাধা হয়, অথবা হিম্মতে না কুলায়, তাহলে থাক না ওটা গায়ে। কিন্তু 'মহিলা-সমবায়ের' স্বার্থরক্ষায় তাঁদের আত্মকেন্দ্রিক হতেই হবে। তাই হয়েছিলেন আম্মা-জানেরা—হাসি ফুটিয়েছিলেন সংসারের মুখে।

এখানে—এই পশ্চিমবঙ্গে তা আমরা পারিনি।

আগেই বলেছি : প্রবন্ধ রচনা আমার ধাতে নেই! আসুন, শেষ পাতে আপনাদের একখানা গল্পই শোনাই। কিস্‌সাটা বাস্তব, শুধু নামধামগুলি

বদলে দিলাম :

আমার কাহিনীর নায়ক : আত্মারাম সর্বাধিকারী।

যৌবনকালে তিনি ছিলেন : শচীশের জ্যাঠামশায়ের মন্ত্রশিষ্য। পাড়ায় কারও বিপদ হলে হুমড়ি খেয়ে পড়তেন। কারও অসুখ-বিসুখ হলে তার শয্যাপার্শ্বে খাড়া থাকতেন। কেউ জীবনের মায়া কাটালে তিনি শ্মশানযাত্রী হিসাবে একপায়ে খাড়া। ক্রমে বিয়ে করলেন, ভাল চাকরি ধরলেন। একদিন অবসরও গ্রহণ করলেন। রিটায়ারিং গ্র্যাচুইটি দিয়ে সল্টলেকে একটি দ্বিতল বাড়িও বানিয়ে ফেললেন। একটিমাত্র সন্তান। কৃতি ছাত্র। স্কলারশিপ নিয়ে মার্কিন মুলুকে চলে গেল পি.এইচ.ডি. করতে। বুড়োবুড়ি থাকতেন দ্বিতলে। একতলাটা ভাড়া দেননি। পশ্চিমবঙ্গে ভাড়াটে আইন বড় এক-তরফা। ওঁদের মনোগত বাসনা খোকা ফিরে এলে একতলাটায় থাকবে। ওরা দ্বিতলে। গিন্নি বলতেন, না গো, ততদিনে হয়তো আমার বাতের ব্যথাটা চাগিয়ে উঠবে, সিঁড়ি-ভাঙা কষ্টকর হয়ে যাবে। আমরাই বরং থাকব একতলায়, খোকা আর বৌমা দোতলায়। বৃদ্ধ এককথায় রাজি।

পাড়ার ছেলেরা এসে দরবার করেছিল, দাদু, আপনার একতলার চারখানা ঘরই তো খালি পড়ে আছে, একটাতে আমাদের ক্লাব করতে দেবেন? আত্মারাম বলেছিলেন, না বাপু! ভাড়া-টাড়া আমি দেব না!

—না, না, ভাড়া কেন? এমনিতেই। আমরা সন্ধ্যাবেলা আসব। একটা পিংপং টেবিল পাতব, ক্যারম বোর্ড পাতব। খেলব। একটা ছোট মত লাইব্রেরিও করব। যেদিন বলবেন—মানে খোকাকাকু ফিরে এলেই আমরা ঘর ছেড়ে দেব।

—তোমাদের অত পুঁজি আছে? ওইসব কেনার? পিংপং টেবিল, বই, আলমারি?

—কী যে বলেন দাদুশ্রী! আমরা তো বেকার। খরচ দেবে পার্টি। মানে ইলেকশনের সময়ে আমরা যাদের হয়ে খাটি। 'মানব না মানছি না' হাঁকি।

—তা তো বুঝলাম। কিন্তু 'দাদুশ্রী' মানেটা কী হল?

ওর পাশ থেকে আর একটি তালঢ্যাঙা ছোকরা বলল, আপনি টি.ভি.-তে মহাভারত দেখেন না, দাদুশ্রী? গুরুজনদের সম্বোধন করতে হলে একটা করে 'শ্রী' যোগ করতে হয়। বাবাকে ডাকতে হয় 'পিতাশ্রী'! মাকে : মাতাশ্রী।

এ ঘটনা গত শতাব্দীর শেষাশেষি। টি.ভি.তে 'মহাভারতের' রেশ তখনো মেটেনি। আত্মারাম রাজি হননি।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। মাসছয়েক পরে প্রাতঃভ্রমণ সেরে ফিরে এসে হাত বাড়িয়ে ডোরবেলটাও বাজাতে পারলেন না। দোরগোড়ায় উল্টে পড়লেন। বুকে একটা পিন-ফোটানো ব্যথা। প্রীতিলতা—মানে গিন্নি তো অকূল পাথারে। পাড়ার ছেলেরাই ট্যাক্সি ডেকে বৃদ্ধকে নিয়ে গেল নার্সিং হোমে। দিন-তিনেক আই. সি. ইউ. এবং আরও দিন চারেক কেবিনে কাটিয়ে বৃদ্ধ অ্যাম্বুলেন্সে করে ফিরে এলেন বাড়িতে। থাকতে হল একতলায়। ফাঁড়াটা অল্পের উপর দিয়েই কেটেছে। মারাত্মক কিছু নয়। ইস্‌কিমিয়া। আরও ক'দিন শুয়ে থাকতে হল বিছানায়। ধূমপান বন্ধ হল। টোস্টে মাখন এবং পাঁঠার মাংসও। প্রীতিলতা কর্তার অমতেই একতলার একখানা ঘর খুলে দিলেন—করুক ওরা ক্লাব ঘরই করুক। নির্বান্ধব পুরীতে ওরাই তো সহায়। রাতবিরেতে ডাকলে ওরা সাড়া দেবে। সর্বাধিকারীমশাই ক্ষুব্ধ হলেন ; কিন্তু প্রীতিলতার ধমকে ব্যবস্থাটা মেনে নিতে হল। প্রীতিলতা বললেন, তুমি বড় আত্মকেন্দ্রিক : চার-চারখানা ঘর খালি পড়ে আছে, আর ওই বেকার ছেলেগুলো একটা ক্লাবঘর জোগাড় করতে পারছে না। থাকুক না ওরা। এতো স্বার্থপর হওয়াটা কি ভাল?

অগত্যা তাই। বৃদ্ধের দোতলায় ওঠা বারণ। গিন্নিই নেমে এলেন নিচে। সর্বাধিকারী মশাই শুয়ে শুয়ে শোনেন পাশের ঘরে দিবারাত্র চলছে পিংপং খেলা।

—'টেবিলকা উপর, বাত্তিকা নিচে, দে ফটাফট্ লে ফটাফট্!'

ছেলেরাই ফাইফরমাশ খাটে। প্রয়োজনে ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনে, ওষুধ কিনে এনে দেয়। দিদাশ্রীর বদান্যতায় তারা ধন্য।

আত্মারাম জনান্তিকে গিন্নিকে প্রশ্ন করেছিলেন, খোকাকে টেলিগ্রাম করেছিলে নাকি?

—টেলিগ্রাম নয়। ই-মেল। খোকা জানিয়েছিল, ইতিমধ্যে ও একটা ভাল চাকরি ধরেছে। ছুটি পাবে না। একটা কেশিয়ার্স-চেক পাঠিয়ে দিয়েছে। পাঁচশ ডলার! ক্লাবের ছেলেরাই তা আমাদের জয়েন্ট-অ্যাকাউন্টে জমা দিয়ে দিয়েছে।

আত্মারাম জানতে চান, ই-মেল? আমার তো কোনও ই-মেল অ্যাড্রেস্ নেই! কে ই-মেল করল?

—রুমা। ওই পাশের বাড়ির লাহিড়ীমশায়ের মেয়ে। চিনতে পারলে?

—কেন পারব না। ওকে তো ফ্রক পরা অবস্থা থেকেই চিনি। খোকার চেয়ে তিন ক্লাস নিচে পড়ত। একসঙ্গে দুর্গাপ্রতিমা দেখে বেড়াত সারা কলকাতায়। তা খোকার যে ই-মেল আছে, তা তুমি জানতে?

—আমি জানতাম না। রুমা জানত। ওরা বোধহয় ই-মেলে চিঠিপত্রর আদান-প্রদান করত এতদিন।

বৃদ্ধ চুপ করে গেলেন। প্রীতিলতা বলেন, কী ভাবছ বলত?

—না, ভাবতে যাব কেন? কিচ্ছু ভাবছি না।

—না, ভাবছ। আর কী ভাবছ তাও আমি জানি। আমারও সেইরকম একটা সন্দেহ হয়েছিল। রুমা সুন্দরী। এম. এ. পাশ করেছে। তবু বিয়ে করছে না কেন?

আত্মরাম বলেন, লাহিড়ীমশাই মনোমত পাত্র পাচ্ছেন না বলে—এতো সোজা কথা।

—মোটেই না। আজকাল বাপ-মায়ে ছেলেমেয়ের বিয়ে দেয় না। তারা নিজেরাই পছন্দমতো তা ঠিক করে নেয়। রুমা যখন হঠাৎ খোকাকে 'ই-মেল' করল তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল। ও কি খোকার পথ চেয়েই বসে আছে? খোকাকেও যখনই বিয়ের কথা চিঠিতে লিখি তখনই

সে লেখে এ নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না।

আত্মারাম বললেন, তা তুমি রুমাকে খোলাখুলি জিজ্ঞেস করলেই পার।

—তোমার যেমন বুদ্ধি! এ সব কথা কি জিজ্ঞেস করে জানতে হয়? বিয়ের ফুল যখন ফুটবার আপনিই ফুটবে।

আরও মাসছয়েক পরে। এখন আত্মারাম আবার প্রাতঃভ্রমণে যেতে শুরু করেছেন। তবে বাজারটা করে কাজের লোক। জীবনযাত্রা পুরানো ছকে ফিরে এসেছে। ওঁরা দ্বিতলে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তারপর প্রীতিলতা একদিন বললেন, শোন! একটা ব্যাপার হয়েছে। রুমা একটা 'স্পোকন্-ইংলিশের' ক্লাস খুলতে চায়। ও তো লোরেটো কলেজে পড়ত। ভালই ইংরেজিতে কথা কইতে পারে। কিন্তু ওদের বাড়িতে স্থানাভাব। আমাদের নিচেকার একখানা ঘরে—

বৃদ্ধ ধমকে ওঠেন, দেখ প্রীতি, এভাবে একখানা-একখানা করে ঘরের দখল ছেড়ে দিও না।

প্রীতিলতা আবার ধমক দেন, বড় আত্মকেন্দ্রিক তুমি। এ তো 'ডগ ইন দ্য ম্যাঞ্জার অ্যাটিচুড'। বিয়ের আগে ছোড়দা মাকে বলেছিল, 'সর্বাধিকারীর সঙ্গে খুকির বিয়ে দিচ্ছ। ভাল করছ না। ওরা সব কিছু অধিকার করে থাকে বলেই 'সর্বাধিকারী'। ঘরখানা তালাবন্ধ ফেলে রাখবে.....।'

বৃদ্ধ ব্যাজার হলেন।

গিন্নি সাহস পেয়ে আরও বলেন, একদিন তো খোকা আর রুমাই ভোগ করবে গোটা বাড়িটা।

—ওরে ব্বাস! তুমি দেখছি ধরেই নিয়েছ যে, লাহিড়ীমশাইয়ের ওই মেয়েটা তোমার বাকদত্তা বধূমাতা!

—হলে আমি কালীঘাটে পুজো দিয়ে আসব।

আরও ছয়মাস পরে। নিচতলার দু'খানি ঘরের দখল হারিয়েছেন। একটায় চোপরদিন 'দে ফটাফট্ লে ফটাফট্' চলছেই। আর একখানিতে রুমার কথ্য-ইংরেজির ক্লাস।

এমন সময় বজ্রপাত হল। রুমার সঙ্গে পরামর্শ না করেই আন্দাজে একটি ঢিল ছুঁড়েছিলেন। কর্তাকেও সে কথা আগে-ভাগে জানাননি। কি জানি আত্মারাম যদি বারণ করে বসেন। তাঁর খোকাকে একটা রামপট চিঠি পাঠিয়েছিলেন 'স্নেলমেল'-এ — জানিয়ে যে, তিনি এখানে খোকার জন্য একটি সুন্দরী শিক্ষিতা সুলক্ষণা পাত্রী দেখে রেখেছেন। খোকা তাকে চেনে। একই পাড়ায় বাড়ি। নামটা ইচ্ছে করেই লেখেননি—তবে আকারে ইঙ্গিতে মেয়েটির পরিচয় এমনভাবে দিয়েছিলেন যাতে খোকা চিনতে পারে। জিজ্ঞেস করেছিলেন, কবে সে বিয়ে করতে আসতে পারে জানালে অন্যান্য ব্যবস্থায় হাত দেবেন।

এবার খোকাবাবু জবাবে জননীকে জানালেন, তোমাদের ইতিপূর্বে জানানো হয়ে ওঠেনি, আমি মাসখানেক আগেই এখানে রেজিস্ট্রি মতে বিবাহ করেছি। মেয়েটি বিরাট ধনী ব্যবসায়ীর একমাত্র কন্যা। তার নিজের একটি ক্রাইসলার গাড়িও আছে। মাস-দুই তিনেকের মধ্যেই আমরা দুজনেই ছুটি নিয়ে তোমাদের দুজনকে প্রণাম করতে আসব।

কর্তাকে চিঠিখানা দেখাতে হল। তিনি কতটা আহত হয়েছেন বোঝা গেল না। মুখে বললেন, এ তো আনন্দের কথা! তোমার বউমা কি ভারতীয়া না মার্কিনী? সে-কথা কিছু লিখেছে?

প্রীতিলতা চোখে আঁচল দিলেন।

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা রুমা ক্লাস ছুটি হবার পর উপরে উঠে এল। প্রীতিলতাকে দেখে চমকে উঠে বলে, কী হয়েছে মাসিমা? আপনাকে এমন দেখাচ্ছে কেন? কোন খারাপ খবর পেয়েছেন নাকি?

প্রীতিলতা ধরা গলায় বললেন, আজ খোকার একখানা চিঠি এসেছে।

—ও পেয়েছেন? তাহলে তো জেনেই গেছেন। আমিও পেয়েছি। খোকাদা অ্যাদ্দিনে ক্যাথীকে বিয়ে করেছে।

—ক্যাথী? বৌমার নাম কি ক্যাথী? তুমি জানতে?

—হ্যাঁ, ক্যাথলিন। বিরাট বড়লোকের একমাত্র মেয়ে। সুন্দরীও। তবে খোকাদার চেয়ে বয়সে বছর-পাঁচেকের বড়। তাতে কী? ওরা যখন নিজেরাই নিজেদের পছন্দ করেছে! তাই না?

প্রীতিলতা কী বলবেন ভেবে পেলেন না।

মাস দুয়েক পরেই ঘটল সেই ঘটনাটা যাকে গল্পগুচ্ছের ভাষায় বলা যায় : 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'! কিন্তু ওরা এল দুজন নয়, চারজন। ক্যাথীর সঙ্গে তার দুই সন্তান—বড়টি অ্যানা, বছর ছয়েক, ছোটটি বব, সাড়ে-তিন! ক্যাথীর প্রথমপক্ষের দুটি সন্তান।

আত্মারাম অনেক কষ্টে আত্মসম্বরণ করে পুত্রবধূর করমর্দন করে বললেন : গ্ল্যাড্ টু মিট য়ু মিসেস সর্বাধিকারী!

খোকাবাবু সপরিবারে আশ্রয় নিলেন দ্বিতলে। বুড়ো-বুড়ি একতলায়। এমনটাই তো কথা ছিল। প্রীতিলতা রুমাকে বললেন, তুমি আমাকে তোমার ক্লাসে ভর্তি করে নেবে রুমা? বউমার কথা আমি একবর্ণও বুঝতে পারিনা।

রুমা হেসে বলে, কী দরকার মাসিমা? খোকাদারা তো তিন চার সপ্তাহ পরেই দেশে ফিরে যাবে।

—দেশে?

—বাঃ! জানেন না? খোকাদা তো ওদেশে সিটিজেনশিপ নিয়েছে!

খোকাবাবু সস্ত্রীক সারা কলকাতা চষে বেড়ায়। অ্যানা আর বব আঁকড়ে ধরল তাদের গ্র্যান্ড-মা আর গ্র্যান্ড-পাকে। অ্যানার সঙ্গে আত্মারামের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হল, ববের সঙ্গে তার দিদার। অ্যানার কথা দাদু বুঝতে পারেন, দিদা পারেন না। বব কথা কয় কম—সে আকারে-ইঙ্গিতেই বাত্ময়। তাই দিদার সঙ্গে তার নিবিড় বন্ধুত্ব হল। রুমার সঙ্গে অবশ্য সকলেরই পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হল।

একদিন প্রীতিলতা জনান্তিকে পাকড়াও করলেন রুমাকে। তার হাতদুটি ধরে বললেন, খোকার ব্যবহারে আমরা বুড়ো-বুড়ি যে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছি তা তোর মতো বুদ্ধিমতী মেয়েকে বুঝিয়ে বলা নিরর্থক। কিন্তু আমার কাছে একটা কথা খোলাখুলি বলতো রুমা। তুই কি এটা আশঙ্কা করেছিলি?

দাঁতে-দাঁত চেপে রুমা প্রতিধ্বনি করেছিল, মানে?

—তুই জানিস যে, তুই অত্যন্ত সুন্দরী! তোরা এক পাড়ায় একসঙ্গে মানুষ হয়েছিস। তুই তাহলে এতদিন বিয়ে করিসনি কেন? কার প্রতীক্ষায় ছিলি?

মুখটা নিচু করে রুমা জবাব দিয়েছিল, মাসিমা যেন কী! ওমা, তা কেন হবে? আমি তো জানতামই খোকাদা মেম বিয়ে করে ফিরে আসবে একদিন।

প্রীতিলতা ওর চিবুক ধরে মুখটা তুলতে চান। বলেন, জানতিস? আমার দিকে চোখে-চোখে তাকা দেখি, মুখপুড়ি—

রুমা ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল।

দিন-চারেক পরে ক্যাথী তার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে নিচে নেমে এল প্রাতরাশের টেবিলে। প্রীতিলতা প্লেটগুলো ঠেলে দিতে দিতে বললেন, খোকা নামছে না কেন?

ক্যাথী হাতবাড়িয়ে ইয়াঙ্কি উচ্চারণে এক-নাগাড়ে কী যেন বলে গেল। বিন্দু-বিসর্গ বুঝতে পারলেন না প্রীতিলতা। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন তাঁর কর্তার দিকে। অনেকক্ষণ দম ধরে কর্তা বললেন, হোয়েন?

ক্যাথী ইয়াঙ্কি 'উরুশ্চারণে' কী যেন বলে গেল তার জবাবে।

এবার প্রীতিলতা ব্যাকুলভাবে কর্তাকে জিজ্ঞেস করেন, কী হয়েছে গো? খোকা কোথায়? সে নেমে আসছে না কেন?

আত্মারাম এবার রহস্যটা ভেঙে দেন। কাল মাঝরাতে লং ডিস্টেন্সে

খোকার একটা ফোন এসেছিল। দোতলার টেলিফোনে। ওর অফিস থেকে। কী একটা জরুরী কাজে সে ভোররাত্রে তখনই ফিরে গেছে নিউ জার্সিতে। দমদম থেকে সে যখন ফোন করেনি তখন ধরে নিতে হবে যে, সে এতক্ষণে প্লেনে চেপে বসেছে!

প্রীতিলতা বজ্রাহতা হয়ে গেলেন। বলেন, সে কী? একবার বলেও গেল না?

ক্যাথীর জবাবটা এবার বুঝতে পারলেন, আমি বুঝতে পারিনি, সে আপনাদের খবরটা জানিয়ে যায়নি। আয়াম সো সরি!

বৃদ্ধ বললেন, তুমি তার হয়ে অহেতুক দুঃখিত হচ্ছ কেন, ক্যাথী? সে যা ভাল বুঝেছে, করেছে!

কেটে গেল আরও একটা সপ্তাহ। রেন্ট-আ-কার ভাড়া করে ক্যাথী তার ছানাপোনা নিয়ে কলকাতার দর্শনীয় সব কিছু দেখিয়ে আনে। প্রীতিলতাকেও সঙ্গে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু অসুস্থ বুড়ো মানুষটাকে একলা ফেলে তিনিই ওদের সঙ্গে বেড়াতে যেতে রাজি হলেন না। ক্যাথী দুপুরে লাঞ্চ সারে বাইরে। রাত্রে ফিরে আসে। একসঙ্গে ডিনার সারে। আত্মারাম জানতে চেয়েছিলেন, খোকা কি টেলিফোন করেছে ইতিমধ্যে? তার নিরাপদ পৌঁছানো সংবাদ দিয়ে? তার অফিসের কী যেন ঝামেলা—

বৃদ্ধকে মাঝপথে থামিয়ে তাঁর পুত্রবধূ বলেছিল, না। কোন ফোন তো করেনি।

—তাহলে তুমিই একটা ফোন করে দেখ না? ওর নম্বরটা নিশ্চয়ই জানো?

—কী দরকার? জানাবার হলে সেই জানাতো। তাছাড়া আঁৎমা যে ওই ঠিকানাতেই আছে তা তো জানি না।

—'আঁৎমা! আঁৎমা কে?

—বাঃ! আপনার ছেলের নাম 'আঁৎমা' নয়?

বৃদ্ধের মনে পড়ে গেল। নিজের নামের সঙ্গে মিল রেখে একমাত্র পুত্রের নাম দিয়েছিলেন 'আত্মদীপ'। বুদ্ধদেবের সেই অপূর্ব মন্ত্রটি স্মরণ করে : 'আত্মদীপো ভব'—নিজেকে প্রদীপ করে জ্বালো। তা খোকা তাই জ্বেলেছে। নিজের প্রদীপখানি। নিজেই সেই প্রদীপের আলোয় পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে : 'আত্মশরণো ভব'!

বৃদ্ধের মনে পড়ে গেল *বৈকুণ্ঠের খাতায়* বিপিনের সেই এক লাইনের অনবদ্য গানখানি : 'ভাবিতে পারি না পরেরই ভাবনা!'

তারও দিন-সাতেক পরে। প্রাতরাশ টেবিলে ওরা কেউই নেমে এল না। না ক্যাথী, না তার ছানাপোনা। বৃদ্ধ বললেন, উপরে গিয়ে দেখে আসব?

— না, তুমি সিঁড়ি ভেঙ না। আমিই যাচ্ছি।

বেতো ঠ্যাঙ ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে প্রীতিলতা দ্বিতলে উঠে গেলেন। ওদের শয়নকক্ষের দরজা খোলা। ক্যাথী নেই। অ্যানা খাটের উপর বসে তার ভাইকে সান্ত্বনা দিচ্ছে : ডোন্ট ক্রাই বব! সামথিং উড সার্টেনলি হ্যাপেন! হ্যাভ ফেইথ অন যীসাস্।

প্রীতি জানতে চাইলেন, হোয়ার্স য়োর মম?

অ্যানা হড়বড়িয়ে, এক-মিসিসিপি কী যে বলে গেল বিন্দু-বিসর্গও বুঝলেন না। সিঁড়ির মুখে এগিয়ে এসে নিচের দিকে মুখ করে বললেন, শুনছ? একবার উপরে উঠে এস তো!

এক এক ধাপে দুটি চরণপাত করে উঠে এলেন দ্বিতলে। অ্যানা ছুটে এসে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল তার দাদুকে। ভয়ে, নাকি উত্তেজনায় একফোঁটা মেয়েটা থর থর করে কাঁপছে। দাদু জানতে চান, কী হয়েছে রে দিদিভাই? এমন করছিস কেন?

বব দিদির অবস্থা দেখে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। প্রীতিলতা তাকে জাপটে ধরেন, কোলে তুলে নেন।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে অ্যানা তার নিদারুণ অসহায়ত্বের কথা জানালো দাদুকে। জানা গেল, ক্যাথী ভোর রাত্রে একটা ট্যাক্সি ধরে দমদমমুখো রওনা হয়ে গেছে। ওদের ভাইবোনের জন্য একটা ম্যাগনাম সাইজ ক্যান্ডি বক্স রেখে দিয়ে।

আত্মারাম বজ্রাহত হয়ে গেলেন। পরক্ষণেই তাঁর মনে পড়ে গেল তাঁর পুত্রও তো একই ভাবে বউ-বাচ্চাদের ফেলে আত্মদীপ-হাতে পালিয়েছিল। অ্যানার চিবুকটা তুলে ধরে প্রশ্ন করেন, হ্যাঁরে, তোর মম কোথায় গেল? নিউজার্সিতেই তো? ড্যাডির কাছে?

সাত বছরের বাচ্চা মেয়েটা চোখের জল মুছে তার দাদুর দিকে ডাগর চোখ মেলে তাকায়। জবাব দিতে তার পাতলা ঠোঁট দুটি প্রজাপতির পাখার মতো তিরতির করে কাঁপতে থাকে। বলে, ডোঞ্চু নো দাদু? ওরা দুজন তো কবেই ডিভোর্স পিটিশন ফাইল করেছে!

এতটুকু বাচ্চা একটা ফুটফুটে মেয়ের মুখে 'ডিভোর্স পিটিশন ফাইল'-করার কথা শুনে আত্মারামের আত্মারাম প্রায় খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম!

প্রীতিলতা জানতে চান, কী হয়েছে গো? আমাকে খুলে বল?

—'বল্‌ছি। বস'! এদের দুজনকে একটু সামলাও। আমাকে এখনি

একটা টেলিফোন করতে হবে!

টেলিফোন যন্ত্রটার পাশেই রাখা আছে একটা 'রেডি-রেকয়নার'। তার পাতা উল্টে একটা নম্বর খুঁজতে থাকেন। ঘড়িটার দিকে একবার চোখ তুলে দেখলেন : সকাল আটটা। এতক্ষণে ব্যারিস্টার-সাহেব তাঁর অভ্যস্ত প্রাতঃভ্রমণ সেরে নিশ্চয় বাড়িতে ফিরে এসেছেন। বার-দুয়েক রিঙিং টোনের পর ও-প্রান্ত থেকে ভেসে এল ভারি গলায় : পি. কে. বাসু স্পিকিং ..... বলুন?

—গুড মর্নিং স্যার। আমি আত্মারাম সর্বাধিকারী বলছি। সল্ট লেক থেকে। ক্যান য়ু প্লেস মি, স্যার?

—ও শ্যুয়োর। বছর দশেক আগে আপনার একটা লাস্ট টেস্টিমোনিয়াম বানিয়ে দিয়েছিলাম। আপনার সল্ট লেকের বাড়িটা জীবনসত্ত্বে ভোগ করবেন মিসেস্ সর্বাধিকারী। কিন্তু ওয়ারিশ হবেন আপনার একমাত্র সন্তান : 'আত্মদীপ'। অ্যাম আই কারেক্ট?

—হ্যান্ড্রেড পারসেন্ট, স্যার! অদ্ভুত আপনার মেমারি—

—তা তো হল। কিন্তু আপনি কি কোন কারণে অ্যান্টিসিপেটরি বেল চাইছেন?

—আজ্ঞে না! আমাকে বনের বাঘ তাড়া করেনি মোটেই। এ স্রেফ মনের বাঘ। আমি আমার উইলটা পাল্টাতে চাই। ইমিডেটলি। আপনি কি এখন ফ্রি আছেন? আমি এখনি একবার আপনার নিউ-আলিপুরের বাড়িতে আসতে পারি?

—তা আসুন, আমি ফ্রি আছি। কিন্তু উইলটা পালটাতে চাইছেন কেন?

—সেটা সাক্ষাতে গিয়ে বলব, স্যার।

—অল রাইট! তা আপনার ছেলেটি ভাল আছে তো?

—সেটাও সাক্ষাতে বলব, ব্যারিস্টার সাহেব। তাহলে এখনই আসছি আমি।

প্রীতিলতা আপত্তি তোলেন, এত তাড়াহুড়ো করছ কেন? তোমাকে

যেন .....

—হ্যাঁ বাঘেই তাড়া করেছে। বাসু-সাহেবকে বলিনি, তোমাকে বলছি—আমাকে বাঘ-বাঘিনী যুগলে তাড়া করেছে। নাউ অর নেভার!

—তাই বলে এমন বাসিমুখে .....?

—না, না, আমাকে খান দুই বিস্কুট আর মনোট্রেটটা এনে দাও। ওটা খেয়েই ট্যাক্সি নিয়ে রওনা হব আমি। আই কান্ট আফোর্ড টু ফেস আ সেকেন্ড হার্ট-অ্যাটাক! তার আগেই উইলটা পালটে ফেলতে হবে। তুমি ততক্ষণ এই চুন্নুমুন্নু দুটোকে কিছু খেতে দাও। ওদের মুখ শুকিয়ে গেছে—

—তোমার বুকে কি ব্যথা হচ্ছে এখন?

—আরে না, না, না।

—তাহলে এমন পাগলের মতো.....

—তুমি তো জানই পিউ! আমি লোকটা স্বর্থপর, একবগ্গা, পিগ্‌হেডেড! ফ্রম হেড-টু-ফুট : আত্মকেন্দ্রিক!

প্রীতিলতা একটু বিহ্বল হয়ে পড়েন। পুত্রবধূর মুখে 'অ্যাঁৎমা' শুনে আঁৎকে উঠেছিলেন, কিন্তু কর্তার মুখে সেই দীর্ঘ দীর্ঘদিন আগেকার দেওয়া নামটা ডাকতে শুনে বোঝেন—তাঁদের সুখী গৃহকোণটা ঠিকই আছে! ভয়ের কিছু নেই।

বাঙালির খাদ্য-বিহার

আলেকজান্ডার কত সালে সিন্ধুনদ অতিক্রম করেছিলেন তার হক-হদিস বাংলাতে ইতিহাস সক্ষম ; কিন্তু এই অতিভঙ্গ বঙ্গদেশে 'বাঙালি' নামে এক শ্রেণীর জীব কবে থেকে ডেরা-ডাণ্ডা পেড়েছে ইতিহাস তার খবর রাখে না। আন্দাজ করি, বিবর্তনের পূববর্তী ধাপটি ছিল গৌড়জনের। কিন্তু তাদের একটা বদনামও ছিল। তার বঙ্কিমী-নির্দেশ আছে কপালকুণ্ডলায়। শের আফকন যখন স-মেহেরুন্নিসা এরাজ্যে সুবেদারি করতে চলে আসেন—বাদশাজাদার লোভাতুর দৃষ্টি থেকে তাঁর বিবিজানকে বাঁচাতে,—তখন শের আফকনের বঙ্গাগমন প্রসঙ্গে বঙ্কিম দেশটিকে 'চুয়াড়ের' দেশ বলেছিলেন।

তো, দেশের নামকরণ নিয়ে আমরা কেন মাথা ঘামাচ্ছি? আমাদের আলোচ্য বিষয় সেই দেশবাসীর 'খাদ্যবিহার'। তারা কী খেত, কী খায়, কী খেতে চায় পায় না, আর কী-খেতে চায় না, তবু গলাধঃকরণে বাধ্য হয়। প্রাচীন সাহিত্যে আহারপর্বটা বড় বেশি আলোচিত হয়নি। তবু বাংলা-ভাষায় আদি পর্বেই বাঙালির রান্না ও ভোজনের একটি উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে চর্যাপদের প্রাকৃত-পৈঙ্গল ভাষাতে :

ওগ্গর ভত্তা রম্ভা পত্তা
গাইক ঘিত্তা দুগ্ধ সযুক্তা।
মোইলি মচ্ছা নালিত গচ্ছা
দিজ্জই কান্তা খাই পুনবন্তা॥

কিছু বুঝতে পারলেন? অথচ এই ভাষাতেই চর্যাপদের যুগে আপনার-আমার বুড়ো-ঠাকুর্দার এন্‌এথতমা বুড়োঠাম্মার দল বাৎচিৎ করতেন।

কবি বলতে চান :

কলাপাতায় গর্‌মাগরম ভাত,
গাওয়া ঘি, তার সঙ্গে দুধ
মৌরলা-মাছের ঝোল, আর নাল্‌তে-পাতার শাক
যে গৃহিণী নিত্য পরিবেশনে সমর্থা
তাঁর কর্তাই হচ্ছেন পুণ্যবান বাঙালি।

শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষামি'-কায়দায় প্রাকৃত-পৈঙ্গল কবি মাত্র চারটি পংক্তিতে বাঙালিয়ানার চার-চারটির মৌল বৈশিষ্ট্যের হকহদিস বাৎলে দিয়েছেন।

প্রথম কথা : 'দুধ ভাত'। স্মরণ করুন অষ্টাদশ শতাব্দির মহাকবি ভারতচন্দ্রের কথা : ঈশ্বর-পাটনী ঈশ্বরীর কাছে তার বংশধরদের জন্য

পোলাও-কালিয়া-রাজভোগের বায়না করেনি। বলেছিল :

'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে!'

দুনম্বর, গাওয়া ঘি। কী করে একবিংশ শতাব্দীর দাদাভাই-দিদিভাইদের সে ব্যাপারটা বোঝাই? সেটা তো তোমাদের কাছে 'রুট-ওভার-মাইনাস ওয়ান'! নামটাই শুধু শোনা আছে—দাদু-দিদার কাছে। স্বাদ দূর-অস্ত্,

গন্ধটাও তোমরা জান না। বাসমতী, কালো জিরা, অথবা গোবিন্দভোগ চালের গরমাগরম ভাতে খাঁটি গাওয়া ঘি—ওফ!

তিন-নম্বর, বাঙালি-খানায় মোদ্দা কথাটা : মাছ-ভাত। ইদানীং ডাক্তারবাবুরা বলছেন পাকা-মাছ নয়, ছোট জাতের মাছই ভক্ষ্য। এখানে দেখুন পদকর্তা অগাধ জলসঞ্চারী রোহিত মৎস্যের কথা বলেননি। বলেছেন, মৌরলা মাছের কথা। আর খাদ্যবিচারের শেষ সৌভাগ্য-প্রসঙ্গে কবি বলেছেন—উঁহু! হোটেল-মোটেল নয়, মায় ফাইভস্টার-শোভিত বাতানুকূলিত মেকি খানা-কামরা নয়। ভাগ্যবান হতে হলে শুধু অঋণী, অপ্রবাসী হলেই চলবে না—পিঁড়ির উপর সুখাসনে বসে কলাপাতায় খেতে হবে ভোজ—সে ভোজ্যদ্রব্য পরিবেশিত হওয়া চাই শাঁখাপরা জনৈকা ভাগ্যবতীর হাতে। নরম হাতে গরম ভাত। পরম সুখে খাবে।

বাঙালির খাদ্য-বিহারের নতুন কথা কী বলব বলুন? আদিমতম বাঙালি কবি তো বঙ্গসংস্কৃতির প্রাগূষাযুগেই পাঁচ-পয়েন্টের হাত নিয়ে খেলতে বসে রঙের টেক্কাটি পেড়ে লিড দিয়েছেন! এর পর কী খেলা দেখাব?

নীহাররঞ্জন রায় জানিয়েছেন যে, কবি শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত কাব্যে দময়ন্তীর বিবাহভোজের একটি বর্ণনা আছে। সেই রাজকীয় ভোজে হরিণ ও পক্ষি-মাংসের বিবিধ পদ, মৎস্য ও নানান নিরামিষ পদের উল্লেখ আছে। মিষ্টান্ন হিসাবে পিঠা। ভোজের পরে মিঠাখিলি পানের উল্লেখও আছে। তবে দ্বাদশ শতাব্দীর এই কবি যে বাঙালি ছিলেন, অথবা তাঁর সৃষ্ট চরিত্র নিমন্ত্রণকর্তা দময়ন্তীর পরমপূজ্য পিতৃদেব যে তাই ছিলেন, এমন কথা হলফ নিয়ে বলতে পারব না।

নৈষধচরিত রচয়িতা শ্রীহর্ষ বাঙালি ছিলেন কি না জানি না, কিন্তু ফুলিয়ার কবি কৃত্তিবাস ওঝা খাঁটি বাঙালি। সগর্বে বলব, আমার দেশের লোক। নদীয়ার। কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ডে দেখেছি, রাজা জনক তাঁর কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রিতদের জন্য যে আয়োজন করেছিলেন তা বস্তুত কাঁচা-ফলার।

ঘৃত দুগ্ধে জনক করিলা সরোবর।
স্থানে স্থানে ভাণ্ডার করিলা মনোহর॥
রাশি রাশি তণ্ডুল মিষ্টান্ন কাঁড়ি কাঁড়ি।
স্থানে স্থানে রাখে রাজা লক্ষ লক্ষ হাঁড়ি॥

এখানে রন্ধন প্রকরণে বৈচিত্র্যের অভাব, আদি কবি তার বিপুলতার দিকেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—'স্থানে-স্থানে, রাশি-রাশি, লক্ষ-লক্ষ হাঁড়িতে' প্রাচুর্যেরই প্রকাশ। দুগ্ধের পরিমাণ বোঝাতে 'সরোবর' শব্দ ব্যবহার করেছেন। তার একটু পরে :

ভারে-ভারে দধি দুগ্ধ ভারে-ভারে কলা।
ভারে ভারে ক্ষীর ঘৃত শর্করা উজলা॥
সন্দেশের ভার লয়ে গেল ভারিগণ।
অধিবাস করিবারে চলেন ব্রাহ্মণ॥

হেতুটা কি এই যে, ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয় গৃহে সেকালে কাঁচা-ফলার করতেন? ক্ষত্রিয়-নিয়োজিত পেশাদার বামুন-ঠাকুরের রান্নাও তাঁরা কি গ্রহণ করতেন না? কারণ একটু পরেই বর্ণনা পাচ্ছি— বিবাহান্তে বর-কনেকে রানীরা নানানপদ রান্না করে উপবাসভঙ্গ করাচ্ছেন :

রাজারাণী গিয়া পরে করিলা রন্ধন।
কন্যা-বর দুইজনে করিল ভোজন॥

শ্রীরামচন্দ্রের আহারান্তে সেই পাতে যে সীতাদেবী উপবাসভঙ্গ করেছিলেন এমন বর্ণনা কিন্তু নেই। দুইজনে একসঙ্গে অন্নগ্রহণ করছেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাশেষি **মনসামঙ্গল** কাব্যে কবি বিজয়গুপ্ত দেখেছি গুটি গুটি চাঁদ-সদাগরের পাকশালায় প্রবেশ করছেন :

স্নান করিল গিয়া বণিক্-সুন্দরী।
রন্ধন করিতে যায় অতি তাড়াতাড়ি॥
পাতাল সুন্দরের কাষ্ঠ শুক্না তেঁতুলী।
পিতলের হাঁড়ি দিয়া হেটে অগ্নি জ্বালি॥
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি মাগে বরদান।

মুঞি যেন রন্ধন করি অমৃত-সমান॥
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি চাপাইলা রন্ধন।
ডান দিকে ভাত চড়ায় বামেতে ব্যঞ্জন॥

সে যুগে সকল কাজের শুভারম্ভেই দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রথা ছিল। তন্তুবায় তাঁত চালাবার আগে যন্ত্রটাকে প্রণাম করত, সূত্রধর দিনের কাজ শুরু করার আগে তার ছেনি-হাতুড়ি-করাতকে পুষ্পার্ঘ্য দেয়। কর্মকার তার হাপরকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয়। ভারতবর্ষের সেই 'ট্রাডিশান' মেনেই বণিক সুন্দরী অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করে রান্নার কাজ শুরু করলেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি, প্রাক-ক্যাটারার যুগে বাড়িতে যখন ভিয়েন হত তখন বড়ঠাকুর কড়াই থেকে নামানো প্রথম-খোলার একটি লোচিকা অগ্নিদেবকে নিবেদন করতেন। কিন্তু কী রান্না করলেন বেনেবউ?

পাটায় ছেঁচিয়া লয় পোলতার পাতা।
বেগুন দিয়ে রান্ধে ধনিয়া পোলতা॥
জ্বর পিত্ত আদি নাশ করার কারণ।
কাঁচকলা দিয়া রান্ধে সুগন্ধ পাঁচন॥

বুঝুন। পাটায়-ছেঁচা পল্‌তা-পাতা, তাতে কাঁচকলা, বেগুন। ধনে-বাটা দিয়ে তা আবার সুগন্ধি করা হয়েছে। আপনার-আমার বাবা-বেবিরা নামশুনেই বলবে : ওয়াক থু! তারা যে জ্বর-পিত্ত নিবারণের জন্য অ্যান্টিবায়োটিকে অভ্যস্ত।

পলতা-পাতার পর দুটি শাকের পদ— 'গিমা-তিতা' শাক, আর আদা-বাটা দিয়ে 'বাথুয়া শাক'। তারপর ঝিঙে-পোস্ত, থোড়; মরিচার ঝাল দিয়ে বরবটি, বেগুন-পোড়া, মাস-কলায়ের বড়ি সহযোগে মুগের ডাল। তারপর রুইমাছের আমিষ পদ। তৎসহ মাগুর মাছের ঝোল এবং খরসুলা মাছ ভাজা। আর একটি অপ্রত্যাশিত পদ :

ভিতরে মরিচ গুঁড়া বাহিরে জড়ায় সুতা।
তৈলে পাক করি ভাজে চিংড়ির মাথা॥

চিংড়ির মাথা 'স্টাফড' করে, সুতো বেঁধে তার ভর্জিত পদটি যে

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বাঙালি রাধুনীর আয়ত্তে ছিল বিজয়গুপ্তের কল্যাণেই সেই চমকপ্রদ সংবাদটা পাওয়া গেল।

চাঁদ-সদাগর বৈষ্ণব ছিলেন না। তাই তাঁর পাকঘরে মাছ ও মাংসের অবাধ প্রবেশাধিকার।

বৃন্দাবন দাসের **চৈতন্য-ভাগবতে** দেখছি ক্রমাগত : 'ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, সর, নবনী পিষ্টক/নানাবিধ শর্করা সন্দেশ কদলক।' চৈতন্য-ভাগবতের একটি পংক্তি কিন্তু আমার কাছে বিস্ময়কর লেগেছে :

পটল বার্তাকু থোড় আলু শাকমান।
কত ঘর ভরিয়াছে নাহিক প্রমাণ॥

চৈতন্য ভাগবতের কালে 'আলু'র উল্লেখ একটু ধন্ধ ধরিয়ে দেয়। তখনো তো পোর্তুগীজ বোম্বেটেরা এসে পৌঁছায়নি। তাহলে 'আলু' এল কোন্ সুরঙ্গ পথে? নাকি এ পংক্তিটা পরবর্তী অনুকরকের প্রক্ষিপ্ত রচনা? অথবা সে-কালে কি রাঙা আলুকে সবক্ষেত্রে 'আলু' বলা হত? পণ্ডিতেরা এ নিয়ে বিচার করতে থাকুন। আমরা বরং পরম বৈষ্ণব বৃন্দাবন দাসের

কাছে বিদায় নিয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-মশায়ের কাছে উপস্থিত হই। ঘটনাচক্রে দুই তৃণাদপি সুনীচ কবি একই অঞ্চলের লোক। প্রভু বৃন্দাবন দাসের আদিভূমি দেনূড়। সেটা কাটোয়ার ছয় ক্রোশ দক্ষিণে। আর কৃষ্ণদাস বাবাজীর লীলাভূমি ঝামটপুরে—কাটোয়ার তিন ক্রোশ উত্তরে। দুজনের জন্মস্থানের মধ্যে ফারাক নয় ক্রোশ। কিন্তু রন্ধনের বর্ণনায় দু'জনে যেন পাশাপাশি কলম চালাচ্ছেন।

মুদ্গ বড়া, মাস বড়া, কলা বড় মিষ্ট।
ক্ষীর পুলি নারিকেল পুলি পিঠা ইষ্ট॥
সঘৃত পায়স মৃৎকুম্ভিকা ভরিয়া।
তিন পাত্রে ঘনাবর্ত দুগ্ধ তাতে ধরিয়া॥

ঘৃত অতি উপাদেয় বস্তু, মানছি,—আমাদের ধারণা 'ওগ্‌গর ভত্তা' অথবা 'তণ্ডুল-ডাইল প্রেমলীলার খেচরান্নে তার সাদর আমন্ত্রণ ; কিন্তু তাই বলে পায়েসে ঘি? এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না কি কবিরাজ-মশাই? কিন্তু না। ঘৃত দেখছি বারেবারেই ফিরে আসছে পাতে : 'মধ্যে পীত ঘৃত সিক্ত শালান্নের স্তূপ।' এবং পুনরায় 'ঘৃতসিক্ত পরমান্ন মৃৎকুম্ভিক ভরি/চাঁপাকলা ঘন দুগ্ধ আম্র তার পরি॥' এবং তারও পরে পুনরায় "পীত-সুগন্ধি ঘৃতে অন্ন সিক্ত কৈল/চারিদিকে পাতে ঘৃত বহিয়া চলিল।" ভক্ত কবি দেখা যাচ্ছে কামক্রোধাদি ষড় রিপুকেই শুধু নয় 'ক্লোরেস্টেরল রিপুকে'ও জয় করে বসে আছেন! এরপর হয়তো পান্তাভাতেও ঘি পড়বে। তার চেয়ে চলুন যাই পাণিহাটিতে।

নিত্যানন্দ-প্রভু পাণিহাটিতে ভক্ত রঘুনাথের মাধ্যমে যে চিড়ামহোৎসবের আয়োজন করেছিলেন সেখানেও খাদ্যদ্রবের একটি বিস্তারিত বর্ণনা আছে। ঘনাবর্ত দুগ্ধের সঙ্গে রম্ভা, শর্করা সংযোগে চিপীটকের বৃহৎ আয়োজন। সেপাতে হঠাৎ 'হুড়ুম' শব্দটা দেখে আক্কেল গুড়ুম হয়েছিল।

ক্রমাগত কাঁচাফলারের বর্ণনায় যদি আপনাদের অরুচি ধরে থাকে তাহলে আসুন, আপনাদের নিয়ে যাই রাঢ়দেশের শাক্তকবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর ভদ্রাসনে। চণ্ডীদেবীর আশীর্বাদ পেয়ে খুল্লনা স্বামীকে

তৃপ্ত করতে কী রাঁধছেন দেখা যাক :

'ঘৃতে ভাজা পলা কড়ি, উন্‌টা শাকে ফুলবড়ি
চিংড়ি কাঁঠালবীচি দিয়া
অথবা, মসুরি মিশ্রিত মাস সূপ রাঁধে রস বাস
হিঙ্গ জীরা বাসে সুবাসিত।
ভাজে চিতলের কোল রোহিত মৎসের ঝোল
মান বড়ি মরিচে ভূষিত॥'

আপনারা আস্বাদন করেছেন কি না জানি না, আমি কখনো কাঁঠাল বীচি মিশ্রিত চিংড়ির মালাইকারি চেখে দেখিনি।

আর একটি বিচিত্র বর্ণনা পাই কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে। গর্ভবতী নারীর সাধভক্ষণ। কোন কিছুই তখন তার মুখে রোচে না। এমন একটি গর্ভবতী নারী নাকি কবিকে জনান্তিকে তার গোপন মনোবাসনার কথা জানিয়েছিলেন :

'আপনার মতো পাই, তবে গ্রাস চারি খাই
পোড়া-মাছে জামিরের রস।
..... যদি পাই মিঠা ঘোল, বদরী শকুল ঝোল
তবে খাই গ্রাস পাঁচ চারি॥'

অন্যত্র মেয়েটি বলেছে তার সাধ : 'পান্ত-ওদন ব্যঞ্জন বাসি' অথবা 'মীন চড়চড়ি কুমড়া বড়ি, সরল সঙ্করী, ভাজা চিঙ্গড়ী .....'। শেষ দিকে গর্ভবতী মহিলাটি আরও বলেছে "থোড় ডুমুর ইচলা মাছে, খাইলে মুখের অরুচি ঘোচে। হিয়া ধক ধক অন্তরে ভোখ্, মুখে নাহি রোচে এই বড় শোক॥"

স্যাড কেস! বেচারির পেটে ক্ষুধা থাকলেও মুখে রুচি নেই! দুঃখ করিস না মা! সোনার চাঁদ কোলে পেলেই সব শোক কর্পূর হয়ে যাবে!

ঘৃতমিশ্রিত হোক না হোক পায়েস কিন্তু ইক্ষ্বাকু বংশীয়—আখের গুড়ের। না, ভুল হল, ওটা পায়েস নয়, গোবিন্দভোগ তণ্ডুল সহযোগে

'পরমান্ন'। মিষ্টান্ন-পদের মধ্যমণি। একটা কথা : দুধ তো আদি যুগ থেকেই ছিল, লেবু গাছও অপ্রতুল নয়। তবু মধ্যযুগে দুধ থেকে ছানা-কাটানোর পদ্ধতিটা জানা ছিল না বাঙালি রন্ধনবিদদের। সন্দেশের যে বর্ণনা পাই তা ঘনীভূত দুগ্ধ শর্করা সহযোগে প্রস্তুত—ক্ষীরের সন্দেশ, ক্ষীর পুলি, ক্ষীরের নাড়ুকেই সন্দেশ বলা হচ্ছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবি ভারতচন্দ্র রন্ধন তালিকায় হদ্দমুদ্দ করেছেন। প্রতাপকুমার রায় (খাদ্যরসিক বাঙালির অন্নচিন্তা চমৎকারা—দেশ-পত্রিকা ১৮.১২.২০০২) লিখছেন, "মজুমদার বাড়ির রন্ধনের বর্ণনায় মনে হয়, ভারতচন্দ্র কল্পনার লাগাম ছেড়ে দিয়েছিলেন। তেইশটি নিরামিষ পদের এবং আমিষ, মাছ ও মাংসের যে পদগুলি বিবৃত হয়েছে, মনে হবে কোন পাকপ্রণালীর সূচিপত্র পড়ছি। ধরে নিতে পারি, এই রচনা আমাদের ভোজ্যের দিগন্ত নির্দেশ করে।"

একটা কথা খেয়াল রাখতে হবে : বর্তমান লেখক বা প্রতাপকুমার রায় মশাই আজ যা পারি তা ভারতচন্দ্রের পক্ষে ছিল অসম্ভব : কোন পাকপ্রণালীর সূচিপত্র দেখে ভোজ্যদ্রব্যের দীর্ঘ তালিকা টুকে মেরে দেওয়া। কারণ বাঙলা ভাষায় প্রথম পাকপ্রণালীর গ্রন্থখানি (পাক্‌রাজেশ্বর) প্রকাশিত হয়েছিল ভারতচন্দ্র প্রয়াণের সাত দশক পরে। সুতরাং স্বীকার করতেই হবে ভারতচন্দ্র যে তেইশটি নিরামিষ পদের কথা বলেছেন, তার স্বাদ হয়তো তিনি জিহ্বায় পাননি, কিন্তু শ্রুতিতে বা মননে পেয়েছেন।

ভারতচন্দ্রের সমকালীন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের একটি মধ্যাহ্নভোজের কিছু বিস্তারিত বর্ণনা এখানে যুক্ত করলাম, **রূপমঞ্জরী** প্রথম খণ্ড থেকে। কাহিনীর মূল নায়িকা রূপমঞ্জরী বা হটি বিদ্যালঙ্কারের পিতৃদেব রূপেন্দ্র মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রিত হয়েছেন রাজবাড়িতে। বার-মহল আর অন্দরমহলের মাঝামাঝি একটি কক্ষ থাকত রাজবাটিতে। তাকে বলে : 'অন্তরাল'। মহারাজ ও রূপেন্দ্রনাথ সেখানে বসে কথা বলছিলেন—

"এই সময় একটি সুদর্শনা কিশোরী দ্বারপ্রান্তে আবির্ভূতা হল। যুক্ত

করে। রত্নালঙ্কারভূষিতা। অবগুণ্ঠনবতী। মহারাজ তাকে আহ্বান করলেন, এস কস্তুরী.....

কস্তুরী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে গলায় আঁচল দিয়ে দুই ব্রাহ্মণকে প্রণাম করল।

রাজা বললেন, এ হল কস্তুরীবাঈ। আমার অমাত্য শিবভট্টের কনিষ্ঠা কন্যা। ও আমাদের ডাকতে এসেছে। মধ্যাহ্ন-আহারে। তাই নয়, কস্তুরী?

মেয়েটি গ্রীবাভঙ্গিতে স্বীকার করে।

রাজা বলেন, চট করে বলে দাও তো মা, কোন্ পাঁচটি ব্যঞ্জন তোমার স্পর্শে ধন্য হয়েছে?

কস্তুরী জানে, রাশভারী মহারাজা অন্দরমহলে কৌতুকপ্রিয়। বললে, একি আপনাদের পুরুষদের চতুষ্পাঠী? রানী-মার টোলে ও-সব তঞ্চকতা চলে না।

রাজা প্রাণখোলা হাসি হাসলেন। বলেন, ঠিক আছে, মা। তুমি যাও, আমরা এখনি আসছি।

কস্তুরী হাসতে হাসতেই প্রস্থান করল।

রাজা তখন রহস্যটা ভেদ করে দিলেন রূপেন্দ্রের কাছে।

ওঁরা দুজনে এতক্ষণ কথা বলছিলেন 'বার মহলে'। স্ত্রী-স্বাধীনতার বিষয়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রাচীনপন্থী। মহিলারা গঙ্গাস্নান করেন পাল্কি থেকে অবতরণ না-করে। অর্থাৎ বাহকেরা পাল্কিসমেত স্নানার্থিনীকে গঙ্গাজলে নিমজ্জিত করে! রাজা কোনও বিশেষ অতিথিকে আহারে নিমন্ত্রণ করলে ভোজ্যদ্রব্য পরিবেশিত হয় এই 'বার-মহলে'। অন্দরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় না। আজ মহারাজ সে নিয়মের ব্যতিক্রম করতে চলেছেন একটি বিশেষ হেতুতে। বড় মহারানী কিছুদিন ধরে প্রায়শই শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাচ্ছেন। কৃষ্ণচন্দ্রের দুই পত্নী। ইনি শিবচন্দ্রের মাতা। মহারাজের ইচ্ছা ভেষগাচার্যকে অন্দর মহলে নিয়ে এসে তাঁকে একবার দেখানো। রূপেন্দ্র রোগের লক্ষণ জেনে নিয়ে স্বীকৃত হলেন। উপরন্তু জানতে চান, ঐ কস্তুরী কেন আছে তাঁর অন্দর মহলে। আর ঐ মহারাজের সঙ্গে তার

কথোপকথনের অর্থটাই বা কী?

সে-কথাও মহারাজ বিস্তারিত জানালেন।

কৈশোরে পদার্পণ করার পূর্বেই বিশিষ্ট অমাত্যের আত্মজার দল সীমন্তিনী হয়ে যায় ; কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্বে স্বামীর ঘরে যায় না। তারা পর্যায়ক্রমে তখন কয়েক মাস রাজান্তঃপুরে এসে বাস করে। রাজা যেমন বিদ্যোৎসাহী, পুরুষদের জন্য ক্রমাগত চতুষ্পাঠী খুলে চলেছেন, বড় রানী-মাও তেমনি অন্দর-মহলে একটি বিচিত্র চতুষ্পাঠী খুলেছেন। ঐসব শিক্ষানবীশ কিশোরীদের নিয়ে। তাদের নানান বিদ্যায় শিক্ষিত করে তোলার ব্যবস্থা—সীবন, গৃহকার্য, রন্ধন। তাদের পরীক্ষা আর উপাধিদানের ব্যবস্থাও আছে। আজ যেমন ঐ কস্তুরীর রন্ধনের পরীক্ষা। বিচিত্র সে ব্যবস্থাপনা—

মহারাজের জন্য যে দশ-বিশ পদ রান্না করা হয়েছে তার ভিতর মাত্র পাঁচটি পাক করেছে ঐ মেয়েটি, বাদবাকি রন্ধনশিল্পে অত্যন্ত অভিজ্ঞ পাচকবৃন্দ। আহারান্তে রাজা-মশাইকে বলতে হবে—কোন পাঁচটি 'পদ' সেই অভিজ্ঞ পাচকবৃন্দের দ্বারা প্রস্তুত নয়। সেটা যদি সনাক্ত করা না যায়, তাহলেই পরীক্ষার্থিনী উপাধি লাভ করবে। আহারের সময়ে ঐ মেয়েটি উপস্থিত থাকবে পরিবেশনের অছিলায়। রাজা মহাশয় তাকে নানান প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। জেনে নেবেন, রন্ধনবিদ্যায় মেয়েটির জ্ঞান কতদূর। স্বহস্তে যদিচ কখনো রন্ধন করেন না তবু মহারাজ একজন খাদ্য বিশারদ! মরিচ, অম্লাস্বাদ বা লবণাধিক্যের সামান্য হেরফের তো বটেই এমনকি 'ফোড়ন'-এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তারতম্য পর্যন্ত ধরতে পারেন রসনার অনুভূতিতে। আজ ঐ পরীক্ষার্থিনী যে কোন্ পাঁচটি ব্যঞ্জন প্রস্তুত করেছেন—সেগুলি আমিষ না নিরামিষ, ছেঁচকি-'কৌড়া'-ঘণ্ট-কালিয়া না 'ক্রোকে' তা পর্যন্ত জানা নাই।

রূপেন্দ্র সহসা করজোড়ে বলে ওঠেন, একটা অপরাধ হয়ে গেছে মহারাজ! আমি বলতে ভুলে গেছি, আমি নিরামিষাশী!

রাজা হাসেন। বলেন, মারাত্মক ভ্রান্তি! এখন আর উপায় কী? কিন্তু শুনেছিলাম আপনি শাক্ত?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মৎস্য ও মাংস ত্যাগ করেছি সম্প্রতি।

—সম্প্রতি? কতদিন?

—ধরুন পক্ষকাল!

রাজার মুখভাব দেখে বোঝা গেল না তিনি কী ভাবছেন। বললেন, আসুন, অন্দর-মহলে যাওয়া যাক। শুধু নিরামিষই আহার করবেন। 'পলাণ্ডু' সেবা করেন তো?

—আজ্ঞে না!

—তবে তো বড়ই বিপদে ফেললেন। তিন্তিড়ীপত্রের ব্যঞ্জন কি ওরা বানিয়েছে? দেখা যাক। আসুন।

যে কক্ষে ওঁদের মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন সেটিও বৃহৎ। এটি অন্দর-মহলে। মর্মরমণ্ডিত কক্ষতল। প্রাচীন শুভ্রবর্ণের পঙ্খের কাজ করা। উপর থেকে ঝুলছে প্রকাণ্ড একটি সহস্রমুখী ঝাড়লণ্ঠন। কক্ষের একপ্রান্তে একটি শ্বেতপাথরের মেজ, তদুপরি পুষ্পপাত্রে কুসুমগুচ্ছ। এখানে প্রাচীরে কোন তৈলচিত্র নাই—একদিকে দেওয়াল-জোড়া প্রকাণ্ড একটি রঙিন রেশমচিত্র। মহাযানধর্মের কোন মাতৃমূর্তি—তারা, মঞ্জুশ্রী, ভৈরবী অথবা প্রজ্ঞাপারমিতা। তিব্বত অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। কক্ষকেন্দ্রে দুটি পশমের চতুষ্কোণ আসন, অপূর্ব নক্‌শাকাটা। দুটি প্রকাণ্ড অন্নপাত্র—রৌপ্যনির্মিত; আর সেদুটি ঘিরে তিনসারিতে কাঁসা অথবা রূপার কটোরা। সেগুলি সমকেন্দ্রিক বৃত্তের আকারে অন্নপাত্রকে বেষ্টন করে আছে। দু-একটি কষ্টিপাথরের পাত্র অথবা খঞ্চা—যাতে ফল-মূল মিষ্টান্ন পরিবেশিত—মক্ষিকাবারণ সরপোশে আবৃত।

ওঁরা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করা মাত্র বিপরীত দিক থেকে অগ্রসর হয়ে এলেন রানী-মা। রূপেন্দ্রকে প্রণাম করার উদ্যোগ করতেই তিনি সসঙ্কোচে পেছিয়ে গেলেন। বলেন, না, না, মা। আপনি আমাকে প্রণাম করবেন না।

রানী-মা রূপেন্দ্রর প্রায় সমবয়সী, হয়তো সামান্য দু-চার বছরের ছোট।

মহারাজ বলেন, একটা কথা ভেষগাচার্য বলতে ভুলেছেন। উনি নিরামিশাষী। এখন কী করা যায়?

রানী-মা প্রথমটা বিস্মিতা। তারপরেই হেসে ফেলেন। বলেন, তাতে অসুবিধা কিছু হয়নি। কস্তুরী আজ শুধু নিরামিষ-ব্যঞ্জনই প্রস্তুত করেছে।

মহারাজ কস্তুরীর দিকে ফিরে বলেন, কোন ব্যঞ্জনে 'পলাণ্ডু' দেওয়া আছে কি?

—না মহারাজ। আপনি তো পূর্বেই নিষেধ করেছিলেন!

—করেছিলাম, না? আজকাল আর কিছুই স্মরণে থাকে না। আসুন, বসা যাক।

রূপেন্দ্র রীতিমত বিস্মিত। বলেন, সে কী! এ ব্যবস্থা কেমন করে হল?

রাজা বললেন, শোনেননি—'রাজা কর্ণেন পশ্যতি!'

কৃষ্ণচন্দ্র অত্যন্ত বিচক্ষণ। রূপেন্দ্রর বন্ধু ভারতচন্দ্রের নিকট পূর্বেই তথ্যটা সংগ্রহ করেছেন। রূপেন্দ্রের আহাররুচি বিষয়ে। কস্তুরীকে বললেন, ইনি আমার মতো কলির ব্রাহ্মণ নন, আহারকালে বাকসংযম করে থাকেন। ফলে তুমি এখনই কিছু আভাস দিয়ে রাখ মা—কোন্ কটোরায় কী পরিবেশিত।

ওঁরা দুজনে আসনে উপবেশন করলেন। সম্মুখে মর্মর গৃহতলে বসল মেয়েটি। তার হাতে একটি রৌপ্যদণ্ড, তার শেষপ্রান্ত আঁকশির মতো বাঁকানো। ভোজনকারী উপবিষ্ট-অবস্থায় তৃতীয় সারির কটোরার নাগাল পায় না। তাই এই ব্যবস্থা। রৌপ্যযষ্টির সাহায্যে কস্তুরী কটোরাগুলিকে আগিয়ে-পেছিয়ে দিতে পারবে। অনুরুদ্ধ হয়ে কস্তুরী মুখস্থ বলার মতো ভোজ্যদ্রব্যগুলির জাতনির্ণয় করে গেল।

বামদিক থেকে প্রথম সারিতে সর্বপ্রথম একটি ক্ষুদ্র সুবর্ণ-কটোরায় গব্য ঘৃত। তারপর কিছু ভাজা-সবজি—পনসবীজ ও চালকুমড়োর বুকো-বড়া, লাউডগার পোড়ে-ভাজা, শাপলা-ভেলার পাটভাজা। তিনরকম

ডাইল—আমড়া-মুকুলের মটর-ডাল, কমলালেবু সহ ঘন মুগ ডাল এবং ওলকপি মিশ্রিত ছোলার ডাল। দ্বিতীয় সারিতে কাঁচা-পেঁপের চাপরঘণ্ট, এঁচড়ের পাতুরি, বড়ি-সহযোগে পালং-ঝোল, লাউ-পোস্ত, কাঁচকলার ধোঁকা-ডালনা, জলপাইয়ের মাখা-চাটনি, পাঁপড় ভাজা। এরপর তৃতীয় সারি—ক্ষীর, দধি, সরপুরিয়া, সরভাজা, পিষ্টক প্রভৃতি মিষ্টান্ন। সেগুলি সরপোশে ঢাকা।

রূপেন্দ্র বলেন, এ তো আমার এক সপ্তাহের খাদ্য, মহারাজ, এত কি খাওয়া যায়?

—হয়তো যায়, হয়তো যায় না। আপনার যা অভিরুচি তাই গ্রহণ করুন। অপচয় হবে না কিছু। ব্রাহ্মণের সেবান্তিক অবশেষ গ্রহণের লোকের অভাব নেই।

রূপেন্দ্রর নজর হল, কর্পূর-মিশ্রিত পানীয় জল পরিবেশিত হয়েছে দুটি সুবর্ণ-পাত্রে। তার পাশে রাখা আছে মোরাদাবাদী-কাজ করা একটি অপূর্ব রৌপ্য-ভৃঙ্গার এবং একটি পিতলের বড় পাত্র। এ জাতীয় ভৃঙ্গারে সচরাচর মাধ্বী পরিবেশিত হয়। আহার-থালিকার পার্শ্বে সেটি কেন রাখা আছে বোধগম্য হল না। সে বিষয়ে প্রশ্ন করতেও সঙ্কোচ হল।

মহারাজ বললেন, কস্তুরী, তুমি তিন্তিড়ী-পত্রের ব্যঞ্জন করনি?

কস্তুরী অবাক মানে। জবাব জোগায় না। তার হয়ে রানী-মা বলে ওঠেন, না! এ তো আরণ্যক-আশ্রম নয়, এখানে তিন্তিড়ী-ব্যঞ্জনে নানান 'অনুপপত্তি'!

কস্তুরী বুঝল না। কিন্তু যাঁরা বোঝার তাঁরা বুঝলেন। বুনো রামনাথের কাহিনী।

এবার মহারাজ বলেন, পেট ভরবে কী ভাবে? 'শাক, মোচাঘণ্ট, ভুষ্ট-পটোল, নিম্বপাত কিছুই নাই.....

এবারও কস্তুরী বিহ্বল এবং এবারও জবাব দিলেন রানী-মা ; সে-সব সাত্ত্বিক আহার। রাজসিক নয়। ও আপনার পরিপাক হত না।

রূপেন্দ্র বুঝতে পারেন—রানী-মা নিরক্ষরা নন—কৃষ্ণদাস গোস্বামীর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত তাঁর ভালভাবেই পড়া। অন্নপাত্রে নৈবেদ্যের মতো চুড়ো করে রাখা মূল ভোজ্যদ্রব্যটি অন্ন নয়,—ভর্জিত-অন্ন অর্থাৎ পলান্ন। তার এক-এক দিক এক-এক রঙের। লাল, নীল, হলুদ, সবুজ ও সাদা। কীভাবে পলান্নের এই বর্ণ-পার্থক্য হয়েছে বুঝে উঠতে পারেন না। মহারাজ সে বিষয়েই প্রশ্ন করলেন কস্তুরীকে। মেয়েটি জানালো—কোচিনীল দিয়ে রক্তবর্ণ, জাফরান-সহযোগে হলুদ রঙ, সুপুরি মিহি গুঁড়ো করে তার সঙ্গে কালোজামের রস মিশিয়ে নীল রঙ করা হয়েছে। আর সবুজ রঙ তো হলুদ-নীলের সমাহার। মহারাজের প্রশ্নের জবাবে কস্তুরী জানালো এর মূল উপকরণ : গোবিন্দভোগ মিহি পুরাতন চাউল আড়াই পোয়া, গব্যঘৃত এক পোয়া, শর্করা দেড় ছটাক, পাতি লেবুর রস এক ছটাক। আন্দাজ মতো ঘন দুধের সর, তিনচারটি বাদাম বাটা। ছোট এলাচ আটটি। লবঙ্গ সাতটি। দারুচিনির ছোট টুকরো দশটি। সামান্য কলিজিরা ও চার-পাঁচটি তেজপাতা। 'আকনি'র জন্য প্রয়োজন—সাজিরে, ধনিয়া, তেজপাতা, আদ্রক ও দারুচিনি। এই বিচিত্র ভোজ্য দ্রব্যটির নাম : 'পঞ্চরঙ অপলান্ন'।

মহারাজ বললেন, 'পঞ্চরঙ' তো বুঝলাম, কিন্তু 'অপলান্ন' অর্থ কী?

—মহারাজ, পলান্ন হচ্ছে 'পল যুক্ত অন্ন। 'পল' অর্থে মাংস। যেহেতু এটি নিরামিষ পদ তাই এর নাম 'অপলান্ন'।

মহারাজ গৃহিণীর দিকে দৃকপাত করে বলেন, তুমি একে উপাধি দিতে পার : পাকশিরোমণি!

রানী হেসে বলেন, এখনই কী? সেবা হোক। দেখি, পঞ্চ গুপ্তব্যঞ্জনকে সনাক্ত করতে পারেন কি না।

অতঃপর দুজনে পঞ্চদেবতাকে অন্নদান শুরু করলেন। দেখা গেল, অন্ন গ্রহণকালে মহারাজও বাকসংযম করে থাকেন, যদিচ পূর্বে তিনি নিজেকে 'কলির ব্রাহ্মণ' বলেছেন।

রূপেন্দ্র এবার বুঝতে পারেন— ঐ কারুকার্যমণ্ডিত রৌপ্য-ভৃঙ্গার

এবং পিতলের গামলাটি কেন রাখা আছে। মহারাজ প্রত্যেকটি কটোরা থেকে সামান্য—কখনো কণিকামাত্র খাদ্য অন্নপাত্রে উঠিয়ে নিচ্ছেন এবং তার রসাস্বাদনান্তে ভৃঙ্গারের জলে মুখ প্রক্ষালন করে চলেছেন। না হলে, পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের স্বাদগন্ধ পরবর্তীতে অনুভূত হবে—খাদ্যবিচারে ভ্রান্তি হয়ে যেতে পারে।

রূপেন্দ্র বুঝতে পারেন—রন্ধন যেমন শিল্পকর্ম তেমনি তার প্রকৃত রসাস্বাদনও একটি চারুকলা। খাদ্যকে এতদিন উদরপূর্তির উপকরণ বলেই জানা ছিল। নদীয়া রাজের আতিথ্য গ্রহণ না করলে তিনি বুঝতে পারতেন না 'ভোজন'ও একটি চারু-শিল্প।

আপনারা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন নিরামিষ রান্নায় 'আলুর' উল্লেখ নেই। সেকালে আলু, টমেটো প্রভৃতি বাঙালির খাদ্য ছিল না। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কালে 'ডাইল'-এর শুভাগমন ঘটেছে। বাঙালির ভোজন-রঙ্গমঞ্চে 'আলু'-র প্রথম প্রয়োগের তখনো অর্ধশতাব্দি বাকি।

এখানে কয়েকটি তথ্য সবিনয়ে স্বীকার করে যাই। পাঠক যেন না মনে করেন, এটা আমার তরফে হচ্ছে—'আমায় বুঝি করতে হবে আমার লেখার সমালোচন'। এ-কথা লিপিবদ্ধ করছি বঙ্গসংস্কৃতি-ইতিহাসের মুখ চেয়ে। অর্থাৎ উপর্যুক্ত বর্ণনায় কতখানি ঔপন্যাসিকের কল্পনা আর কতটাই বা ঐতিহাসিক তথ্য-নির্ভর। কী জানেন? এসব কথা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলার মতো অশীতিপর বাঙালি সাহিত্যসেবীরা যে দিন-দিন ইতিহাসের নেপথ্যে সরে যাচ্ছেন!

এখানে বর্ণনা করা হয়েছে : তিন সারিতে ভোজদ্রব্য বিভিন্ন কটোরায় মূল অন্নপাত্রকে সমকেন্দ্রিক বৃত্তের আকারে সজ্জিত হয়েছে। যার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ছে একটি আঁকশির, অথবা প্রতিটি ব্যঞ্জন আহারান্তে রৌপ্য-ভৃঙ্গার সাহায্যে মুখপ্রক্ষালনের আয়োজন—এসবের ঐতিহাসিক নজির আছে। না, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের, অর্থাৎ পলাসীযুদ্ধের সমকালে এ বর্ণনা আমি পাইনি। কিন্তু প্রায় এ জাতীয় বর্ণনা আমি শুনেছিলাম

আমার পূজ্যপাদ শ্বশুর মহাশয়ের কাছে। তিনি ছিলেন মৈমনসিংহ-কৃষ্ণপুরের জমিদার রাজা জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরীর দৌহিত্র। রাজা জগৎকিশোর (১৮৬৩-১৯৩৬)—আপনারা জানেন, সমকালীন বঙ্গ

ভূমের একজন কোটিপতি জমিদার। মৈমনসিংহ শহরে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি 'বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয়ে' পঞ্চাশ হাজার (সে-কালীন) রৌপ্যমুদ্রা দান করেছিলেন। শ্বশুরমশাই আমাকে গল্পচ্ছলে রাজা জগৎকিশোরের মধ্যাহ্ন-আহারের বর্ণনা করেছিলেন। সেটিকেই আমি শ-দেড়েক বছর পিছিয়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের (১৭১০-১৭৮২) মধ্যাহ্ন-ভোজন চিত্রাঙ্কনে আরোপ করেছি। অপিচ, ভোজ্যতালিকার যে বর্ণনা করা হয়েছে তা ভারতচন্দ্র-অনুসারী।

দ্বিতীয়ত, রানী-মার এই যে বিচিত্র নারীশিক্ষার ব্যবস্থা—তাঁদের কুমারী ও সদ্যোবিবাহিত যুগে রন্ধনপটিয়সী করে তোলার আয়োজন, এটাও হয়তো ঔপন্যাসিকের কল্পনা নয়। আমার খুল্লতাত প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ অমিয়নাথ সান্যাল (১৮৮৫-১৯৭৮) তাঁর হোমিওপ্যাথিক ডিসপেন্সারির আড্ডায় এমন একটি বর্ণনা করেছিলেন। সে-কালে রানী-মায়েরা নাকি রাজসভার অমাত্যবর্গের আত্মজাদের এভাবে রন্ধনবিদ্যায়

শিক্ষা দিতেন। বাঙালি-রান্নার যে একটা বিশিষ্ট 'ঘরানা' আছে, তা নাকি এ ভাবেই 'গুর্বীমুখীবিদ্যায়' বংশ পরম্পরায় প্রসার লাভ করেছে। সে আড্ডায় তৎকালীন—অর্থাৎ আমার যৌবনকালে—বিশিষ্ট কৃষ্ণনাগরিকরা উপস্থিত থাকতেন। যথা—চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, নির্মলকুমার মজুমদার, বিনায়ক সান্যাল প্রভৃতি। অমিয়নাথ এ তথ্যটি কী ভাবে আহরণ করেছিলেন তা বলেননি। অথবা বলেছিলেন, তা আমার স্মরণে নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি : শরদিন্দু তাঁর 'ঝিন্দের বন্দী' কাহিনীতে এ জাতীয় ব্যবস্থাপনার উল্লেখ করেছেন। যদিও তা বঙ্গদেশে নয়।

বাংলা রন্ধন প্রকরণের আদি গ্রন্থ সম্ভবত **পাকরাজেশ্বর**। এ বইটি আমি দেখতে পাইনি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের লাইব্রেরিতেও নেই। তবে বিভিন্ন স্থানে এই বইটির উল্লেখ থেকে অনুমান করা যায়, বিপ্রদাসের পাকপ্রণালীর কয়েক দশক অগে **'পাকরাজেশ্বর'** প্রকাশিত হয়েছিল। কোথায় যেন পড়েছি, পাকরাজেশ্বর প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৩১ সালে।*

বর্তমান লেখকও পাকরাজেশ্বর বইটি দেখেনি। তবে গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে—অর্থাৎ আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে—সে তার সদ্যোবিবাহিতা জীবনসঙ্গিনীকে বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের এক কপি 'পাকপ্রণালী' উপহার দিয়েছিল। সামান্য অর্থ লগ্নী করে দীর্ঘ জীবন তার প্রভূত 'ডিভিডেন্ট' পেয়েছিল। অর্থাৎ যতদিন না দগ্ধানন কার্ডিয়োলজিস্টরা রক্তচাপবৃদ্ধিজনিত হেতুতে তাঁর 'গৃহমুচ্যতে'-কে নির্দেশ দিলেন : পাকঘর তাঁর কাছে 'আউট অফ বাউন্ডস্'। থাক সেসব ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথা।

বিপ্রদাসের পাকপ্রণালীতে আলুর উল্লেখ অত্যন্ত সীমিত। সিদ্ধ, পোড়া, ছেঁড়কি, ভাজা প্রভৃতি প্রকরণে আলুর একান্ত অনুপস্থিতি ইঙ্গিত দেয় যে, বাঙালি, পাকরঙ্গমঞ্চে 'আলু'-নামক কুশীলবের তখনো প্রবেশ ঘটেনি। আলুর উল্লেখ শুধুমাত্র একস্থানে : 'আলু-উচ্ছে ভাতে'। কেন? আলুর যদি উচ্ছের সঙ্গে মেলবন্ধন হয়, তবে তাকে শুধুমাত্র তিক্তস্বাদে

* প্রভাতকুমার রায়, তদেব।

কেন বন্দী করেছিলেন মুখুজ্জে-মশাই? কেন তাকে পটল-কুমড়ো-বেগুন মায় রোহিত-মৎস্যের সঙ্গে খুন্তির আন্দোলনে কড়াই-নৃত্যমঞ্চে নাচতে দেওয়া হল না? বিপ্রদাসবাবুর বইতে আলু যেন করণিক-ঘরণী। অফিসার-ঘরণীদের কক্‌টেল পার্টিতে তার সসঙ্কোচে উঁকি-ঝুঁকি!

মাত্র একদশক পরে প্রকাশিত হয়েছিল প্রজ্ঞাসুন্দরীর একটি পাকপ্রণালীর চটি বই। আলু সেখানে জাঁকিয়ে বসেছে। প্রায় প্রতিটি আনাজের সঙ্গে সে সপ্রতিভ করমর্দনে 'হাডুডু' করছে : 'আলু-ভাজা, আলু-পটলের ঝোল, আলু-কুমড়োর ছেঁচকি ; মায় রোহিত-রাজপুত্রের সঙ্গেও সে হাতে-হাত দিয়ে ডেকচিতে বলডান্স নাচতে শুরু করেছে।

তা থেকে কি ধরে নেব আলু বাঙালির রান্নাঘরে প্রবেশ করেছে বিংশ শতাব্দীর জন্মলগ্নে? কিন্তু মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই আলুর হুঙ্কার শোনা গেল : ভিনি, ভিডি, ভিসি!

স্বামিজীর অনুজ মহেন্দ্রনাথ দত্তের রচিত **'কলকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথায়'** একটি বিয়েবাড়ির ভোজের বর্ণনা আছে। অনুষ্ঠানটি হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দির শেষ পাদে। সেখানে দেখছি, লুচির সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছিল কুমড়োর ছক্কা, কচুরি, খাজা, নিমকি ও মতিচূর। তার সঙ্গে শাকভাজা, পটল ভাজা প্রভৃতি। আলুমিশ্রিত কোনও তরকারি বা ছানার তৈরি কোনো মিষ্টান্নের উল্লেখ সেখানে নজরে পড়েনি।

প্রাচীন যুগে—ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে—বাঙালির খাদ্যে মূল উপাদানগুলি ছিল : তণ্ডুল (চাল), দুগ্ধ, গৌধূমচূর্ণ (গম), ইক্ষুজাত শর্করা, এছাড়া শাকপাতা, কিছু আনাজ, মৎস্য ও মাংস। ছানা সম্ভবত এসেছে পর্তুগীজদের হাতফিরি হয়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে। দুধ থেকে ঘি অথবা দুধ ঘন করে ক্ষীর তৈরি করার কায়দা সে-আমলেও জানা ছিল। কিন্তু গরম দুধে ল্যাকটিক বা সাইট্রিক অ্যাসিড যোগ করে অম্লীকৃত করা হলে যে ছানা উৎপন্ন হবে এ তথ্যটা জানা ছিল না। তাই ছানাজাত কোনও খাদ্যের উল্লেখ প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায় না। দুধের শতকরা আশিভাগ প্রোটিন যে ছানায় আবদ্ধ করা যায় এ

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তখনও অনাবিষ্কৃত। 'সন্দেশ' শব্দের উল্লেখ বৈষ্ণব সাহিত্যে আছে। সম্ভবত তা ক্ষীরের পাক, ছানার নয়।

কোন্ বাঙালি কারিগর সর্বপ্রথম ছানা বানিয়েছিলেন তার হকহদিস জানা যায় না। কিন্তু ছানা থেকে প্রস্তুত কয়েকটি বাঙালি-ঘরানার মিষ্টান্নের আবিষ্কার-প্রসঙ্গে কিছু প্রচলিত ইতিকথার হদিস পেয়েছি। সেগুলি এখানে লিপিবদ্ধ করে যাই। আবিষ্কারকের নামরূপের সঙ্গে এই মুখে-মুখে চলে আসা গাল-গল্পগুলিও লিপিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

আগেই বলেছি, দুধ থেকে ঘি এবং দুধ ঘন করে ক্ষীর প্রণয়নের প্রকরণ জানা ছিল বাঙালি কারিগরের। ফলে ছানার নাগাল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল ছানা ও ক্ষীর একত্র করে নানান মিষ্টান্ন-প্রণয়নের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বিশুদ্ধ ক্ষীর ও গোধূমচূর্ণ মিশিয়ে নানান-জাতির পিঠা তৈরির প্রচলন তো আগের যুগেই ছিল।

ছানা ও ক্ষীর মিশিয়ে তা ঘিয়ে ভেজে পরে শর্করা রসে জ্বাল দিয়ে যে মিষ্টান্নগুলি প্রস্তুত করা হল তার বিভিন্ন আকার হলেও তাদের স্বাদ ও আনন্দদায়িকা-শক্তি প্রায় একই রকম : পানতুয়া, কালোজাম, তোতাপুলি, গোলাপজাম, লেডিকেনি। এগুলির অগ্রজ হচ্ছে ক্ষীরবিবিক্ত ছানার মিষ্টান্ন : সন্দেশ। শুধু ছানা ও শর্করা সহযোগে।

সন্দেশ : মহেন্দ্রনাথ দত্ত-বর্ণিত বিয়েবাড়ির ভোজে মিষ্টান্নের তালিকায় রসগোল্লা অনুপস্থিত; কিন্তু পিষ্টক-জাতীয় মিষ্টান্নের সঙ্গে উল্লেখ রয়েছে বিখ্যাত পেনেটির '**গুপো-সন্দেশ**' বস্তুটির। 'বিখ্যাত' বিশেষণে বোঝা যায় বস্তুটির আবিষ্কার কয়েক দশক পূর্বে। আগেই বলেছি, এই বিয়েবাড়ির নিমন্ত্রণটি হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দির শেষ পাদে। 'সন্দেশ' নামের উৎপত্তি বিষয়ে পাটনার স্বনামধন্য অধ্যাপক রঙিন হালদার (গোপাল হালদারের অগ্রজ) আমাকে কথাপ্রসঙ্গে কিছু প্রাচীন যুগের সন্দেশ দিয়েছিলেন। সেকালে খানদানি-পরিবারে 'পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনীয়' মনে করা হত না। ডাকযোগে বা পিওন-মারফৎ পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ বিলকুল নামঞ্জুর। কেউ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসবে না। বিবাহ,

উপনয়ন, অন্নারম্ভ প্রভৃতি আনন্দ-অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করতে আসতেন মূল নিমন্ত্রণ কর্তার তরফে কোন নিকট-আত্মীয়। সঙ্গে নিয়ে যেতে হত মিষ্টান্ন সাধারণত কাঁসার রেকাবিতে সরপোশ ঢাকা দিয়ে। রসসিক্ত মিষ্টান্ন পরিবহনে নানান দুর্ঘটনার আশঙ্কা। তাই নিয়ে যাওয়া হত রসবর্জিত ছানার-পাকে প্রস্তুত মিষ্টান্ন। যেহেতু আগামী শুভকর্মের সংবাদবাহী, তাই মিষ্টান্নটির নামকরণ করা হয়েছিল : **সন্দেশ**। উপেন্দ্রকিশোর এই উভয় অর্থেই শিশুসাহিত্যের মাসিক পত্রিকাটির নামকরণ করেছিলেন।

কিন্তু পেনেটির বিশেষ জাতের গুপো-সন্দেশ এল কোন্ সুরঙ্গ পথে? দুটি সম্ভাবনার কথা মনে হচ্ছে। হয়তো মূল আবিষ্কারকের ডাকনাম ছিল গুপি। 'গুপি আবিষ্কৃত সন্দেশ' মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ের সূত্রে হয়েছে 'গুপি-সন্দেশ'। অথবা কে জানে আবিষ্কারকের হয়তো ছিল 'বাংলার বাঘের' মতো জবর এক-জোড়া গোঁফ। গুঁফো-সন্দেশ থেকে লোকের মুখে মুখে হয়েছে **গুপো-সন্দেশ**।

হাসবেন না। আবিষ্কারকের দেহবৈশিষ্ট্যে খাদ্যদ্রব্যের নামকরণ হয়ে থাকে। তত্ত্বটা আমি প্রত্যক্ষজ্ঞানে জানি। তাহলে সেই কিস্‌সাটাই আগে শোনাই :

বাঙালির প্রিয় একটি মিষ্টান্নের কী করে এমন বেয়াড়া নামকরণ করা হল এ প্রশ্নটা আমাকে দীর্ঘদিন ভুগিয়েছে। ঘটনাচক্রে সেটার সমাধান হল গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে। আমি তখন বর্ধমান শহরের কাছাকাছি শক্তিগড় গ্রামনগরীর পত্তনিদার, মানে টাউনশিপ-নির্মাণ কার্যের অ্যাসিস্টেন্ট এঞ্জিনিয়ার। শক্তিগড় স্টেশন রোড যেখানে জি. টি. রোডে পড়েছে সেখানে আছে একসার মিষ্টির দোকান। সবগুলিতে একই 'সাইনবোর্ড'—মানে দোকানের বিশেষণ হিসেবে। নামগুলি যদিও পৃথক।

কলকাতায় যদুবাবুর বাজারের কাছাকাছি একসার সোনা-রূপার দোকান আছে দেখে থাকবেন। তার কোন্‌টি যে 'লক্ষ্মীবাবুকা আস্‌লি সোনাচাঁদিকা দুকান', খুঁজে নেওয়া কষ্টকর। কারণ প্রত্যেকটি দোকানে

ওই সাইনবোর্ড। ঠিক তেমনি এখানেও প্রতিটি মিষ্টান্ন-দোকানের সাইন-বোর্ডে লেখা আছে 'শক্তিগড়ের বিখ্যাত ল্যাংচার আদি ও অকৃত্রিম মিষ্টান্নের দোকান।'

আমি অবশ্য যে দোকানটির কথা বলছি সেটা একমেবদ্বিতীয়ম্। সে-দোকানে নটসূর্য উত্তমকুমারের স্বহস্তলিখিত একটি 'সার্টিপিটি' টাঙানো আছে : 'এই দোকানের ল্যাংচা খাইয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম।'

সেই দোকানে ষাটের দশকে এক অশীতিপর বৃদ্ধের কাছে শোনা কাহিনী। তিনি শুনেছিলেন তাঁর ঠাকুর্দার কাছে।

সে-অনেক-অনেকদিন আগেকার কথা। বর্ধমান মহারাজের এক পুত্রের সঙ্গে বিবাহ হল নদীয়ারাজের এক রাজকন্যার। কৃষ্ণনগর থেকে এক নোলকপরা সালঙ্কারা বালিকা এসে আশ্রয় নিলে বর্ধমান রাজপ্রাসাদে। বালিকা হল কিশোরী, ক্রমে তরুণী। একদিন রানী-মার নজর হল বধূমাতার আহারে নিদারুণ অরুচি।

'হিয় ধকধক অন্তরে ভোখ্
মুখে নাহি রোচে এই বড় শোক॥'

রানী-মা পাকা গিন্নি। সহজেই বুঝে নিলেন সংসারে সোনার চাঁদ আসছে। কিন্তু এ কী কাণ্ড! বধূমাতা যে কিছুই মুখে দিচ্ছে না! রানী-মা প্রতিদিনই জনান্তিকে প্রশ্ন করেন, বল বৌমা, লজ্জা কর না—কী খেতে ইচ্ছে করে তোমার?

সীতাভোগ-মিহিদানা হার মেনেছে, এমনকি নস্ট্যালজিয়া-মাখা সরপুরিয়া-সরভাজাও। বধূমাতা সবকিছুতেই শিরশ্চালনে অস্বীকার করে। তারপর একদিন বড় জা-এর পীড়াপীড়িতে ফস্ করে কী-একটা মিষ্টান্নের নাম আধা-উচ্চারণ করেই অবগুণ্ঠন-আড়ালে জিহ্বাদংশন করে।

বড়-জা ঝুঁকে পড়ে বলেন, কী? কী বললে? 'লাঞ্চা'? তার মানে?

নববধূ আর কোন কথা বলে না। নূপুর নিক্কণে অন্দর-মহল ঝংকৃত করে ছুটে পালিয়ে যায় তার শয্যাকক্ষে। কী লজ্জা! কী লজ্জা! মুখ ফসকে এ কী বলে বসল সে!

কিন্তু রানী-মা অত সহজে হার মানতে রাজি নন। পুত্রের মাধ্যমে সংগ্রহ করলেন গূঢ় সন্দেশটা। না, সন্দেশ নয়। সে অন্য একজাতের মিষ্টান্ন। বর্ধমানে তা পাওয়া যায় না। বধূ সেটা তার বাপের বাড়িতে খেয়েছে। মিষ্টান্নের নামটা মনে নেই—বাল্যস্মৃতিজড়িত স্বাদের সঙ্গে তার স্মরণে আছে যে-ভিয়েনকর সেই মিষ্টান্ন রাজবাড়িতে সরবরাহ করত সে ছিল খঞ্জ। বধূ বলতে চেয়েছিল, 'কেষ্টনগরের সেই ল্যাংচা ভিয়েনকর যে মিঠাই বানায় .....'

মহারানী এই গূঢ় বার্তাটা পেশ করলেন মহারাজকে, মশারি-ফেলা জনান্তিক আলাপচারিতে। পরদিন এক অশ্বারোহী সংবাদসহ ছুটে গেল নদীয়া-কৃষ্ণনগর-মুখো। বেয়াই-মশায়ের অনুরোধে নদীয়ারাজ তাঁর এক বিশেষ ভিয়েনকরকে বন্দী করে পাঠিয়ে দিলে বর্ধমানে। রাজধানীর মাইল দশেক পুবে বড়শূল গ্রামে তার জন্য পাকা ঘর বানিয়ে দিলেন বর্ধমানরাজ। বৃত্তির ব্যবস্থা হল। শক্তিগড় রেল স্টেশনের কাছাকাছি পাকা দোকানঘরও। কৃষ্ণনগরের সেই খঞ্জ ভিয়েনকর সব কিছুই পেয়েছিল বর্ধমানে এসে— সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, সম্মান। হারালো শুধু মাত্র একটি জিনিস। তার আবিষ্কৃত সেই পাশবালিশ আকারের মিষ্টান্নটার নাম। সেটা হয়ে গেল : ল্যাংচা!

পানতুয়া, তোতাপুলি, লেডিকেনি, ল্যাংচা, কালোজামের স্বাদ অরসিকের আপতজিহ্বায় হয় তো একরকম। কিন্তু খাদ্যরসিকের কাছে তাদের আকারই শুধু নয় আস্বাদনের ফারাকও আশমান-জমিন। বিশ্বাস না হয় আমাকে দিয়েই একদিন পরীক্ষা করতে পারেন। আমাকে নিমন্ত্রণ করুন। আমি চোখ বুঁজে হাঁ-করব। কোন্‌টা মুখে দিলেন তা চোখ বুঁজেই বলে দিতে পারব। যদিও খাদ্যবিশারদ হিসাবে আমার কোন খেতাব নেই। পানতুয়া অনেক নরম, তোতাপুলি, ল্যাংচাও তাই। কালোজাম— তা সে যতই কালো হোক—তার আছে একটা কৃষ্ণকলি—মনোহরণ স্বাদ। লেডিকেনির নামটা কীভাবে এসেছে তা আপনারা সবাই জানেন। কিন্তু 'লেডিকেনি'-তে যে একটা লবণাক্ত অশ্রুবিন্দুর স্বাদ আছে তা কি

টের পেয়েছেন? না, জিহ্বা তার খবর জানে না। সেটা মননের স্বাদ।

সিপাহী বিদ্রোহ বা ভারতের প্রথমে স্বাধীনতা-সংগ্রাম ব্যর্থ হবার অব্যবহিত পরে ইংলন্ডেশ্বরী ভারতের শাসনভার নিজ হাতে গ্রহণ করেন —ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে। ইংলন্ডেশ্বরীর প্রতিনিধি হিসাবে ভারত শাসন করতে এলেন চার্লস জন ক্যানিং (১৮১২-১৮৬২)। তখন তাঁর বয়স ছেচল্লিশ। সঙ্গে তাঁর সহধর্মিণী—লর্ড স্টুয়ার্ট দ্য রথমের জ্যেষ্ঠা কন্যা—লেডি শার্লট ক্যানিং। তখন তাঁর মধ্যযৌবন—মাত্র আটত্রিশবছর বয়স। এঁরা দুজনেই ভারতবর্ষের প্রথম ভাইসরয় ও তদীয়পত্নী। তাঁদের কলকাতা-আগমনে সে কালীন এক রহিস জমিদার (দুঃখিত, নামটা সংগ্রহ করতে পারিনি) এক মহাভোজের আয়োজন করেন। জনৈক বাঙালি ভিয়েনকর সেই ভোজসভায় একটি নতুন মিষ্টান্ন সরবরাহ করে সুনাম কিনেছিল (বাঙালি ইতিহাসবিস্মৃত জাতি—তাঁর নামটাও জানি না)। যতদূব জেনেছি, সে ভোজসভা হয়েছিল ১৮৬০ সালে। পরবৎসর কলকাতাতেই লেডি ক্যানিং প্রয়াত হলেন ১৮.১১.১৮৬১ তারিখে। লর্ড ক্যানিং প্রচণ্ড মনোকষ্টে তাঁর বড়লাটের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বিলেতে ফিরে যান। পর বৎসরই মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে তিনি প্রয়াত হন। তাই বলছিলাম, 'লেডিকেনি'র সঙ্গে মিশে আছে একবিন্দু লবণাক্ত অশ্রুর স্বাদ। জিহ্বা তা টের পায় না, এই যা!

বিবর্তনের দ্বিতীয় ধাপ ক্ষীরবর্জিত অথচ রসসিক্ত একটি মিষ্টান্ন। পানতুয়া, তোতাপুলি, লেডিকেনি, ল্যাংচার মতো তা ঘিয়ে ভাজা নয়। আবার সন্দেশের মতো রসবর্জিতও নয়। বাঙালি ভিয়েনকরের আবিষ্কৃত এই মিষ্টান্নটা ভারতবিখ্যাতই শুধু নয়, পৃথিবীবিখ্যাত : **রসগোল্লা।**

এক্ষেত্রে আবিষ্কারকের নামটা সংগ্রহ করতে পেরেছি। পরিচয়টাও। তিনি ছিলেন সুবিখ্যাত কবিয়াল ভোলা ময়রার জামাতাবাবাজীবন। আবিষ্কর্তার নাম নবীনচন্দ্র দাস। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যুতে এ.ভি. স্কুলের

বিপরীতে তাঁর আদি-অকৃত্রিম দোকানটি আজও সগৌরবে টিকে আছে বলে দাবী করা হয়! রসগোল্লার আবিষ্কার বিষয়ে একটা কাহিনী বাগবাজার অঞ্চলে আজও বৃদ্ধদের মুখে-মুখে ফেরে :

রাত গভীর। নবীন্দ্রচন্দ্র একাই কাজ করছিলেন ভিয়েনে। পুত্রটি, অর্থাৎ ভোলা ময়রার নাতিটি—মাঝরাতে ঘুম ভেঙে উঠে কাঁদতে শুরু করেছে। তার মা তাকে থাবড়ে থাবড়ে ঘুম পাড়াচ্ছে। নবীনচন্দ্রের সামনে পাশাপাশি দুটো উনুন। একটায় ঘি গরম হচ্ছে, একটায় ফুটছে শর্করা-রস। পরদিন এক নিমন্ত্রণ বাড়িতে একমণ পান্তুয়া সরবরাহ করার কথা। সারাটা রাত জাগতে হবে নবীনকে। তার এপাশে কাঠের এক প্রকাণ্ড বারকোশ। তাতে রয়েছে প্রকাণ্ড একতাল ছানা। ক্ষীরটা তখনো ভাঁড়ার ঘরে শিকেয় ঝুলছে। নবীন কিছু অন্যমনস্ক ছিলেন। কিছু চিন্তিত। তাঁর সহকারী বিশ্বনাথ—বিশেটা সন্ধ্যাবেলা দু-লোটা সিদ্ধির সরবৎ বানিয়ে সেই যে বাড়ি গেছে, এখনো তার পাত্তা নেই। একা হাতে সারারাতে একমণ পান্তুয়া বানানো বড় সোজা কথা নয়। লাহাবাবুদের দেউড়িতে দারোয়ান পেটা ঘড়িতে রাত এগারোটা বাজার ঘোষণা জানালো। নবীনচন্দ্র এক লোটা সিদ্ধি ইতিপূর্বেই শেষ করেছেন; এখন দ্বিতীয় লোটাটার দিকে হাত বাড়ালেন। বুঝলেন, বিশু আর আসবে না। বউকে পাশবালিশ করে এতক্ষণে সে নাক ডাকাচ্ছে।

আরও আধঘণ্টা পরে। ও ঘরে খোকা ঘুমিয়েছে এতক্ষণে। পাড়াও জুড়িয়েছে। খোকার মা ভিয়েনঘরে এসে চিক্কুর পাড়ে, ও কী করছ তুমি? ক-লোটা সিদ্ধির সরবৎ গিলেছ বল তো? ছানায় এখনো ক্ষীর মেশানো হয়নি আর তুমি নির্বিচারে তা ঘিয়ের কড়াইয়ে ঝাড়ছ?

—ঝাড়ছি? আমি?

—দ্যাখনা, এক গণ্ডা গোল্লা নষ্ট করেছ! ও মা! ঘিয়ের কড়াই কোথা গো? তুমি তো ঝেড়েছ রসের কড়াইয়েতে। তুলে ফেল, তুলে ফেল..

নবীন বিদ্যুৎবেগে গৃহিণীর শাঁখাসর্বস্ব নরম হাতটা চেপে ধরে বলেন তা হোক! কিন্তু দ্যাখতো কী সুন্দর গোল-গোল হয়ে ভাসছে! কাৎলার পোনার মতো ডুবছে আর ভাসছে...দেখি না, কী স্বাদ হয়!

সিদ্ধির নেশাই হোক অথবা দেবদত্ত দুর্লভ পরমসিদ্ধি! নবীনচন্দ্র আবিষ্কার করে বসলেন একজাতের নতুন মিষ্টান্ন : **রসগোল্লা**।

দৈবনির্দেশে রনৎজেন সাহেব এক্সরে আবিষ্কার করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন (১৯০১); আর নবীনচন্দ্র বিশ্ববিখ্যাত রসগোল্লা আবিষ্কার করে স্বমহিমায় **বাঙালী চারতাভিধানে** একটা নিজস্ব এন্ট্রি পর্যন্ত জোটাতে পারেননি।

রাধাবল্লভী ঃ এ নামেরও একটা ঐতিহ্যমণ্ডিত ইতিহাস আছে। রাধার বল্লভ তো স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তাহলে রাধাবল্লভী কে? শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া?—তিনি তো সেই রাধাই। এ যেন মাইকেলের ঘুরে-ফিরে সেই বাবলা-গাছ : 'অসুরারিরিপু'! না, তা হয়। রাধাবল্লভী হচ্ছে রাধাবল্লভের একটি প্রিয় নৈবেদ্য। শোন বলি ঃ

> *লোচিকার নাম নিশ্চয় শুনেছ? মিহি গোধূমচূর্ণের ঘৃতপক্ক পিষ্টক : লোচিকা। সেটা তো সে আমলে অনেকানেক বৈষ্ণব আখড়ায় ঠাকুরের ভোগের নিমিত্ত প্রস্তুত হত। এ তারই এক রকমফের। পিষ্টকের দুটি পরতের ভিতর ভিয়েনকর কী জানি কী-করে প্রবিষ্ট করিয়ে দেয় আর্দ্রক-মৌরী-হিঙ্গজিরা সুরভিত ডাইলের এক অনুপান। ঘৃতভাজিত এই বিশেষ পিষ্টকটি সে-আমলে গৌড়মণ্ডলের মাত্র দুইটি দেবমন্দিরে ভোগার্থে নিবেদন করা হত। প্রথমত, মুর্শিদাবাদে কান্দির সিংহ-পরিবার প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে। দ্বিতীয়ত, ভাগীরথীর পশ্চিমপাড়ে, ফ্রেড্রিকনগরের কাছাকাছি দেবালয়ে। দুইটি দেববিগ্রহের একই অভিধা : রাধাবল্লভ। পিষ্টকটি পরবর্তীকালে শুধু বৈষ্ণব বাবাজিদেরই নয়, সাধারণ গৌড়জনের কাছেও বড়ই সমাদৃত হয়েছিল। এখন তার বহুল ব্যবহার। তোমরা হয়তো তার নাম শুনে থাকবে : 'রাধাবল্লভী'।* *

---

*রূপমঞ্জরী প্রথম খণ্ড : পৃঃ ৩৪৬

মানুষের পরিচয় তার নাম ও রূপে। নামটা শুনে চিনতে পারলেই, তার দেহাকৃতিটা মানসপটে ভেসে ওঠে। আবার চেনা একজন মানুষকে দেখলেই বিপ্রতীপ স্মৃতিতে মনে পড়ে যায় তার নামটা। খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে 'নাম-রূপ' নয়, 'নাম-রস'। আহার্যবস্তুটি দেখলেই মনে পড়ে যায় তার নাম। অথবা নামটা শুনলেই জিহ্বায় রসসিক্ত স্মৃতি উথলে ওঠে। মনে পড়ে যায় তার আস্বাদন-মাধুর্য : রস! ক্ষেত্র বিশেষে তা কিন্তু যায় না। অনেক চেনা-মানুষের নামটা যেমন কিছুতেই মনে আসে না। তেমনি পরিচিত আহার্যও অনেকসময় নামবিভ্রাটে বিকট বিড়ম্বনায় ফেলে আমাদের। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে সেবার নবদ্বীপ তীর্থের অভিজ্ঞতা :

মিনিবাস বোঝাই করে আমরা নবদ্বীপ-মায়াপুর বেড়াতে গেছি। থুড়ি, তীর্থ করতে গেছি। ড্রাইভার-ক্লিনার সমেত আমরা ষেটের কোলে ষোলোজন। আমি নামেই দলপতি; মূল ব্যবস্থাপক আমার ভাইপো, চন্দন। সে অনেক সুলুক-সন্ধান জানে। চৌখস ছেলে। বললে, ছোটকাকু, হোটেলে খাবেন না। আমার পরিচিত একটি গোঁসাইজীদের আখড়া আছে। চলুন, সেখানেই দুপুরের ব্যবস্থাটা সেরে ফেলি।

আমি বলি, দেখ চন্দন, শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে আমরা ষোলোটি প্রাণী; কোন্ মুখে গিয়ে বলব আমরা সবাই দুপুরে এখানে খাব?

'চন্দন দেড়-ইঞ্চি আন্দাজ জিব বার করল। দু-হাত দুকানে স্পর্শ' করিয়ে বললে, 'খাব' বলতে নেই ছোটকাকু, বলতে হয় 'প্রসাদ পাব'।

চন্দন বৈষ্ণব নয়। এ যুগের তুখোড় ছেলে। থিয়েটার করে, পার্টি করে, মুর্গির ঠ্যাঙ ওর প্রিয় খাদ্য। কিন্তু গোঁসাইজীদের আখড়ায় গতায়াত আছে তো; পারিভাষিক শব্দগুলো বেশ কিছুটা রপ্ত করেছে। ও বললে, দেখুন, আপনি বয়ঃজ্যেষ্ঠ, প্রথমেই গিয়ে পাঁচ-ষোলোং আশি টাকা—

ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলি, আশ্রমে মীল-চার্জ কি পাঁচ-টাকা?

এবারও সে শিহরিত হয়ে দু হাত দু'কানে স্পর্শ করিয়ে বললে, 'মীল-চার্জ' নয় ছোটকাকু, আপনি প্রণামী দেবেন। আর বলবেন, আমরা

ষোলোজন দুপুরে প্রসাদ পেতে আসব। কেমন?

সেই মতোই ব্যবস্থা হল। গোঁসাইজীদের আখড়ায় শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন করে আমি নির্দেশমতো টাকা—থুড়ি, প্রণামী দিয়ে, জানিয়ে এলুম মধ্যাহ্নে এসে—ইয়ে—প্রসাদ পেয়ে যাব। গোঁসাইজী বৈষ্ণব-বিনয়ে সম্মত হয়ে বললেন, এ তো আমাদের পরম সৌভাগ্য।

সাতরাজ্যি ঘুরে আমরা মধ্যাহ্নকালে ফিরে এসে দেখি, বারান্দায় গোনা-গুনতি ষোলোটি আসন পাতা। হস্তপদপ্রক্ষালনাদির একটা ব্যাপার ছিল। সেটা সেরে আমরা সারি সারি বসলুম। মাটির খুরিতে জল, আহার্য পরিবেশিত হল কলাপাতায়। সব কিছুই পবিত্র, পরিচ্ছন্ন, অতি সুস্বাদু। কিন্তু আমরা ক্রমাগত হোঁচট খেতে থাকি ঐ পারিভাষিক প্রতিবন্ধকতায়। গোঁসাইজী যুক্তকরে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন সামনে; অতিথিসেবা পরিদর্শন করতে। জুনু যেই বলেছে, আর দুটি ভাত...

অমনি গোঁসাইজী শিউরে উঠলেন। জিহ্বার প্রান্তভাগ দাঁত দিয়ে কামড়ালেন। দু-হাত নিজ কর্ণমূলে স্পর্শ করিয়ে জুনুকে বললেন, অনুগ্রহ করে ও-কথা আর বলবেন না!

জুনু তো হাঁ। এখানে সেকেন্ড-হেল্‌প্‌ অশাস্ত্রীয় ব্যাপার, তা কে জানত?

কিন্তু জুনুর আশঙ্কা অমূলক। পরমুহূর্তেই গোঁসাইজী পাকশালার দিকে ফিরে হাঁকাড় পাড়লেন, বাবা নবীনকিশোর, অন্নপাত্রটা নিয়ে এস এদিকে।

নবীনকিশোর জনে-জনে পরিবেশন করে গেল।

জুনুর বরাতে ভাত আর জুটল না, জুটল—অন্ন।

দু-নম্বর শহীদ দেবু গুপ্ত। দোষের মধ্যে সে আর একটু ডাল চেয়েছে।

এবারেও গোঁসাইজী শিউরে উঠলেন। এবারেও তাঁর হাঁকাড় শুনে নবীনকিশোর বালতিতে করে নিয়ে এল : 'রসা'। ভাতের সঙ্গে ডাল খেতে পার, অন্নের সঙ্গে 'রসা' সেবা করাই বিধেয়।

আমার জলের গ্লাসটা খালি হয়ে গেছে। একটু জল চাইব। কিন্তু

তার পারিভাষিক শব্দটা জানি না। জানি, 'জল' চাইলেই গোঁসাইজী পুনরায় শিউরে উঠবেন। যথারীতি জিহ্বা দংশন করে দু-হাত কর্ণে স্পর্শ করাবেন। ছেলে-ছোকরাদের কথা আলাদা, কিন্তু এই ধেড়ে-খোকার সেটা বরদাস্ত হবে না। চন্দন বসেছে আমার ডান-পাশে। তাকে কানে কানে শুধাই, ও চন্দন, আমার যে একটু জলের দরকার। 'জল'কে এঁরা কী বলেন?

চন্দন নিজের শূন্যগর্ভ মাটির গেলাসটা দেখিয়ে বললে, আমারও সেই অবস্থা, ছোটকাকু। কিন্তু কথাটা কিছুতেই মনে আসছে না। আপনি ফিস-ফিস করে জলের সব সমার্থক শব্দগুলো আউড়ে যান দেখি, শুনলেই মনে পড়ে যাবে।

এ কী বিড়ম্বনা! বসেছি মধ্যাহ্ন আহারে—এখন জলের প্রতিশব্দ আউড়ে যেতে হবে? থাক; জল চাই না আমার। হাত ধুয়েই না হয় কল থেকে অঞ্জলি পেতে খাব। কিন্তু শরীর তা মানবে কেন? নাভি-কুণ্ডলী থেকে তৃষ্ণার্ত একটা ঔদরিক আকূতি বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে : কঁক্!

চন্দন শিউরে ওঠে। বলে, রাধামাধব! এটা কী বলছেন ছোটকাকু! এ তো রামপাখির ডাক! বৈষ্ণবের আখড়ায় ওসব কী বলতে আছে? জলের প্রতিশব্দ ঃ কঁক্?

আমি সামলে নিয়ে বলি, না না, ওটা হেঁচকি। শোন ঃ জল ইজুকালটু বারি, অপ্, অম্বু, উদক, তোয়, নীর, কঁক্!

চন্দন বললে, প্রায় হয়ে এসেছে! আর দু-চারটে?

—অন্তঃ, সলিল, ওয়াটার, এইচ-টু-ও, অ্যাকোয়া—কঁক্!

—নাঃ! আপনি ক্রমাগত কঁক্-কঁক্ করতে করতে এবার উজানে নৌকা বাইতে শুরু করেছেন। ইংরেজি, ল্যাটিন শুরু করেছেন। ওভাবে হবে না। শুনুন, আপনি গ্লাসটা ঠক্-ঠক্ করুন। গোঁসাইজী তাকালেই শূন্যগর্ভ গ্লাসটা দেখিয়ে বলবেন : কঁক্!

—তুমিও এতক্ষণে 'কঁক্' ? কিন্তু উনি যদি জিজ্ঞাসা করেন—কী চাই?

—না, মানে, আপনি এমন ভাব দেখাবেন যেন খেতে বসে কথা

বলেন না। আমরা এতক্ষণ কথা বলেছি। আপনিই একমাত্র নির্বাক আহার করেছেন।

চন্দন শুধু থিয়েটারে অভিনয়ই করে না। ডাইরেকশনও দেয়। তার নির্দেশে আমি মূকাভিনয়টুকু সুসম্পন্ন করলুম। গোঁসাইজী রন্ধনশালার দিকে ফিরে হাঁকাড় দিলেন, নবীনকিশোর, 'জীবনপাত্রটা' নিয়ে এস তো বাবা!

চন্দন ফিস ফিস করে বললে, অ্যা—অ্যাই! আপনি এত বই-টই লেখেন, ছোটকাকু, আর মনে করতে পারলেন না যে, জলের আর এক নাম হচ্ছে—কঁক্!

এল জীবনপাত্র। পিতলের জগে। সকলের নিঃশেষিত গ্লাসে 'জীবন' ঢেলে দিল।

প্রসাদ অতি উচ্চপর্যায়ের। পরম পরিতৃপ্তি হল। ঠিকই বলেছিল চন্দন। হোটেলে এত তৃপ্তি হত না। পারিভাষিক প্রতিবন্ধকতায় কিছুটা বিব্রত হয়েছি, দু-একবার কঁক্-কঁক্ও করতে হয়েছে, কিন্তু এমন সুস্বাদু অন্নব্যঞ্জন এবং এমন সস্নেহ, সযত্ন পরিবেশন হোটেলে কোথায় পাব?

শেষ ধাক্কাটা কিন্তু চন্দন নিজেই দিল। আহারান্তে সে জানতে চাইল এঁটো-পাতটা কোথায় ফেলতে হবে। 'এঁটো' বা 'উচ্ছিষ্ট' শব্দটা শিষ্টাচারসম্মত নয়, বিশেষত এটা প্রসাদ! ও তাই 'পাতা' শব্দটাকে মার্জিত করে বলল, প্রভু, পত্রটি কোথায় ফেলব?

গোঁসাইজী বললেন, আশ্রমের প্রবেশপথেই দেখবেন একটা ডাকবাক্স আছে...

চন্দনই এবার গোঁসাইজীর অনুকরণে জিহ্বা প্রদর্শন করে এঁটো হাতেই কর্ণমূল স্পর্শ করে সসঙ্কোচে বলে, সে পত্র নয় প্রভু! আমাদের এই সেবান্তিক কদলীপত্র!

হাঁ হা করে ছুটে এলেন গোঁসাইজী, রাধামাধব! তাও কী হয়? এতে যে আমাদের অতিথি সেবার ব্যত্যয় হবে! কদলীপত্রগুলি ওখানেই থাক, আমরা পরিমার্জনা করব।

কিন্তু চন্দন শুনবে কেন? মহাপ্রাণ ভক্ত বৈষ্ণবকে সে তার এঁটো পাতা ছুঁতেই দেবে না। গোঁসাইজীও ছোড়নেওয়ালা নন। সেবা তিনি করেই ছাড়বেন। শুরু হল হাতকাড়াকাড়ি! দক্ষ রাগবি-খেলোয়াড়ের মতো ডাইনে-বাঁয়ে ঝুল দিয়ে চন্দন ওঁর বগলের তলা দিয়ে সুরুৎ করে বেরিয়ে গেল এঁটোপাতা নিয়ে। আমরাও ঐ সুযোগে যে-যার উচ্ছিষ্ট উঠিয়ে আবর্জনাস্তূপে ফেলে দিয়ে এলুম।

খাদ্যদ্রব্যের নাম ভুল করে যে বরাবর বিড়ম্বিতই হয়েছি এমন কথা বলতে পারি না। সেবার তো অল্পের জন্য বেঁচে গেলাম ভুল নাম বলায়। এই তো মাত্র দুবছর আগে—২০০১ সালে।

আমি বাংলাদেশে এসেছি। সেই প্রথমবার। ভারত বিভাগের পরে। অত্যন্ত প্রতিভাময়ী আমার এক সহপাঠিনীর জীবনী অবলম্বনে একটা উপন্যাস রচনা করার শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে। সে ছিল বাঙলা দেশের মেয়ে। তারই সুলুক-সন্ধানে।

সেদিনটা ছিল বাংলাদেশের বার্ষিকজীবনে একটি সুচিহ্নিত দিবস : একুশে ফেব্রুয়ারি। ভাষাশহিদ দিবস। শহিদ দিবসের অনুষ্ঠান শুরু হয় মধ্যরাত্রে। রাত বারোটায়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শহিদ-স্মারকে প্রথম মাল্যদান করেন। অতরাত্রে সেখানে যাবার মতো দৈহিক ক্ষমতা আমার ছিল না। তাই খুব ভোর-ভোর উঠে রওনা দিয়েছি। অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে বেলা বারোটা বেজে গেল। তখন খেয়াল হল সকাল থেকে পেটে কিছুই পড়েনি। ভোর-ভোর পথপার্শ্বের দোকান থেকে এক কাপ-চা আর একটি মনোট্রেট ব্যতিরেকে। এবার তাই শোকার্ত জনারণ্যের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজি। কিছু খেতে হবে। রমনা-বাজারের কাছেই একটা ভালো খানা-কামরা চোখে পড়ল। শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত রেস্তোরাঁ। বাইরে প্রকাণ্ড প্লেট-গ্লাসের দরজা। ঢুকে পড়ি সেখানে। নজর হলো সার্ভিং-টেবিলে বড় মাপের গরমা-গরম সিঙাড়া জমা হচ্ছে। আমি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসি। দোকানের একজন

কমবয়সী ছোকরা এগিয়ে আসতেই বলি, 'দো গরমা-গরম সামোসে, এক লাড্ডু, ঔর চায়ে—'

ছেলেটা অর্ডার নিয়ে চলে গেল।

সে-সময় দোকানে লোক বিশেষ ছিল না। নাস্তা বা প্রাতরাশের লগ্ন অতিক্রান্ত, অথচ মধ্যাহ্ন-আহারের সময় হয়নি। নজর হল, অদূরে কাউন্টারে বসে আছেন একজন সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ। প্রায় আমারই বয়সী। ব্রজেন শীলের মতো বভ্‌ভো দাড়ি, মাথায় কাজ-করা তালশির সফেদ টুপি। কী মনে করে গুটিগুটি এগিয়ে এলেন আমার টেবিলের দিকে। বসলেন আমার বিপরীত চেয়ারে। একগাল হেসে প্রশ্ন করেন, 'আপনি অরে 'সামোসা' লয়ে আসতে কইলেন ক্যান? এইহানে আমরা সিঙাড়া বানাই—'সামোসা' নয়।'

আমিও হেসে বলি, 'আমার মনে ছিল না যে, ঢাকায় এসে গেছি। আমাদের ওখানে দোকানিরা সিঙাড়াকে 'সামোসা'ও বলে কি না।

—'বোঝলাম। আপনাগো হেই পারের কতা। কইলকাতা থিকে আইসেন মনে লাগে। কবে আইলেন?'

—মাত্র গতকাল। আজই ঢাকায় আমার প্রথম দিন।

—বোঝলাম। জনাবের নামটা Zানতে পারি?

একটু বিরক্ত বোধ করি। এ খেজুরে-আলাপ সেই সময়ে আমার ভাল লাগছিল না। মাত্র আধঘণ্টা আগে শোকস্তব্ধ জনতার শ্রদ্ধাঞ্জলির বাণীহীন বেদনার অনুভূতি তখনো আমার অন্তরে অনুরণিত হচ্ছিল। বলি, কী হবে নাম শুনে?

উনি আদাব জানাবার ভঙ্গি করে বললেন, 'বান্দার নাম সৈয়দ হবিবুর রহ্‌মান।' উঠবার উপক্রম করলেন না কিন্তু। জিজ্ঞাসুনেত্রে বসেই রইলেন। মনে হলো, এর পর নিজের নামটা না-বলা অভদ্রতার পরিচায়ক হয়ে যাবে।

নামটা শুনে বলেন, বিরক্ত না হইলে আরও এড্ডা কতা জিগাই?

বিরক্ত বিলক্ষণ হচ্ছি। কিন্তু সে-কথা তো বলা যায় না। আমি কুঞ্চিত

ভ্রূভঙ্গে তাঁর দিকে তাকিয়েই থাকি। সে দৃষ্টির অর্থ : কয়েন? কী জিগাইবেন?

ইতিমধ্যে ছোকরা বেয়ারা একটা প্লেটে দুটি সিঙাড়া আর মিষ্টান্ন নিয়ে উপস্থিত। সৈয়দ রহ্‌মান ছেলেটার বুকে হাত দিয়ে তাকে রুখে দিলেন। আমাকে বললেন, 'এই সামোসা কিন্তুক বড় গোস্ত-এর। আপনে খায়েন তো?'

রীতিমতো চমকে উঠি। বীফ আমি খাই না। খাইনি জীবনে। নিজের অজান্তেই আমার ওষ্ঠাধর উচ্চারণ করে বসে, ন্‌না!

উনি হাসলেন। ছোকরাকে বললেন, লয়্যা যা। ফিস পাকোড়া লয়্যা আয়।

অনেকক্ষণ আলাপ হল তাঁর সঙ্গে। ওঁর কলেজ জীবন কেটেছে কলকাতায়। প্রাক স্বাধীনতা যুগে। ঘণ্টাখানেক আলাপচারি করে ওঠার সময় বলি, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি নিজে থেকে উঠে এসে আমাকে সাবধান করে না দিলে, ও সিঙাড়াগুলো—

উনি আমাকে বাধা দিয়ে বললেন, হেইডা কী কইলেন সান্যাল-মশয়! ধইন্যবাদের আছেডা কী? হেইডা তো আমার কর্তব্য আছিল। আপনে হেঁদু, আমি মোছলমান, আপনে হেইপারের, আমি এইপারের। কিন্তুক আমরায় তো একই জাত! বাঙালি! না কী কন? যখন মুহে বোল ফোটে নাই তখন আপনে মায়ের কোলে শুইয়া যা শোনছিলেন, আম্মো তাই শোনছি আমার আম্মাজানের কোলে শুইয়া : 'চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়া যা—'

আমি সোৎসাহে বলি, এক্কেরে হক্কথা! আমাদের শাসক আলাদা, পতাকা পৃথক, কিন্তু আমরা দুজনেই বাঙালি। মায়ের মুখের ভাষা ছাড়া আরও একটি রাখীবন্ধনের সূত্র আছে হবিব-ভাই। সারা পৃথিবীতে এমন দুটি ভিন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাম আপনি করতে পারবেন না যেদুটি রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত একই কবির অন্তর-নিংড়ানো বাণী।

উনি সায় দিয়ে বলেন, হেইডাও হক্কথা! কী জানেন, সান্যাল মশয়—

"নানান রকম গাভীরে ভাই, একই বরণ দুধ!
জগত ভরমিয়া দ্যাখলাম রে ভাই : একই মায়ের পুত।"

তাই মনে হচ্ছে : বাঙালির খাদ্যবিহারটা আর একটু ব্যাপক হওয়া দরকার। এতক্ষণ আমরা সে বিষয়ে সচেতন ছিলাম না। হবিব ভায়ের ওই উদ্ধৃতির পর পুব-বাঙলার বাঙালির খাদ্য-বিচারটা একই পাতে পরিবেশন না করলে আধপেটা খেয়ে উঠতে হবে।

আপনারা আমার সঙ্গে একমত হবেন কিনা জানি না। আমার ধারণা এই খাদ্য-বিহারের ময়দানে যখন খেলাটা পড়ে আমিষ-ময়দানে—মেছো পাড়ায়—তখন মোহনবাগান হেরে যায় ইস্টবেঙ্গলের কাছে ; আর খেলাটা যখন নিরামিষ মাঠে তখন মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে দেয়। কারণটা সহজবোধ্য—বাংলাদেশ নদীমাতৃক ভূখণ্ড। মাছ সেখানে যতটা সহজলভ্য এখানে ততটা নয়। আর আমিষ-নিরামিষ খতম করে যখন শেষ পাতে মিষ্টি পড়ে? তখন খেলাটা ড্র হয়ে যায়। এ পাড়ার মিষ্টান্ন : বর্ধমানের সীতাভোগ-মিহিদানা, কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়া-সরভাজা, জয়নগরের মোয়া, শান্তিপুরের নিখুঁতি, বাগবাজারের রসগোল্লা, পেনেটি-চন্দননগরের কড়াপাক এককথায় অনবদ্য। তেমনি ওপারের নানা মিষ্টান্ন : পোড়াবারির চমচম্, রাজসাহীর রাঘবসাই, নাটোরের কাঁচাগোল্লা, ময়মনসিংহের মণ্ডা—তাদেরই বা তুলনা কোথায়?

খাদ্যের বিচার তার আস্বাদন-রসে। স্বাদবৈভিন্ন্যে রস হচ্ছে ছয় প্রকার : কটু, তিক্ত, কষায়, লবণ, অম্ল, মধুর। এর ভিতর—খাতাকলমে থাকলেও বাঙালি ভোজে কটু-স্বাদ দুষ্প্রাপ্য। তিক্ত দিয়েই ভোজনের শুরু : নিম, গুলঞ্চ, বাসক, পলতা ও কণ্টিকারী। এর ভিতর আবার নিম্বজাতের নানান ব্যঞ্জন সচরাচর বাঙালি-খানার প্রাধান্য পেয়েছে—নিমপাতা ভাজা, নিমবেগুন প্রভৃতি। উচ্ছে বা করলা দিয়েও প্রথম পাতে তিক্ত স্বাদের প্রারম্ভ।

তিক্তের পরবর্তী অনেকগুলি পদ লবণ-শ্রেণীর। যাবতীয় তরকারি, ভাজা, ডাল, মাছ, মাংস প্রভৃতি।

তারপর অম্লস্বাদ : অম্লের সঙ্গে লবণ এবং মিষ্টস্বাদ যুক্তভাবে থাকে। এরপর তো মধুরেণ সমাপয়েৎ।

ভারত একটি সুবিশাল দেশ। প্রতিটি প্রত্যন্তদেশেই পোশাক-আশাক, ভাষা, আচার-বিচার, জীবনযাত্রার বৈচিত্র্যে নানান অভিনবত্বই এখানে প্রত্যাশিত। নূতনত্বের সুসমঞ্জস সমন্বয়েই গড়ে উঠেছে জাতীয় চরিত্রের মেরুদণ্ড। খাদ্যবিহারেও আমরা সেই দিবে-আর-নিবে মন্ত্রে বিশ্বাসী। দাক্ষিণাত্যের ইডলি-দোসা-দহিবড়া-উপ্‌মায় তৃপ্ত হচ্ছে বাঙালি-বিহারী। আবার মদ্রদেশীয়রাও আস্বাদন করছে উত্তর-ভারতের আলুকা-টিকিয়া অথবা বায়গন-কা-ভর্তা। কিন্তু পক্ষপাতহীন বিচারে স্বীকার করতেই হল যে বাঙালির খাদ্যতালিকায় যে বিপুল বৈচিত্র্য তা অন্যান্য অঞ্চলে আদৌ দেখা যায় না। খাদ্যরসিক প্রতাপকুমার যথার্থই লিখেছেন :

> *"সমগ্র দক্ষিণভারতে মাত্র একটি ডালই ব্যবহৃত হয়— অড়হর ডাল। বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে অড়হর ডালই মানুষের আহার্যের মধ্যে পড়ে। সম্বর নামে যে ভোজ্যটি দক্ষিণভারতের ভোজনপাত্রে সদা উপস্থিত সেটা, আবহমান-কাল থেকে দক্ষিণী রুচিকে আবৃত করে রেখেছে। ঠিক কতকাল সম্বরের একচ্ছত্র রাজত্ব দক্ষিণ ভারতে চলছে তা আমার জানা নেই। ডাল যদি আর্যদের দান হয়, তাহলে হয়তো একই সময়ে দক্ষিণ ও পূর্বভারতে ডালের প্রচলন হয়েছিল। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত বাঙালির ডালের বৈচিত্র্য অবাক করে দেবার মতো।**

অত্যন্ত খাঁটি কথা। বাঙলায় ডালের কত জাতের রকমফের : মুগ, মশুর, মাসকলাই, ছোলা, মটর, অড়হর। প্রত্যেকটির স্বাদ আলাদা। এই ছয় রকমের ডালের ফোড়নও বিভিন্ন প্রকার। মুগের ডালে লঙ্কা-

*প্রভাতকুমার রায়—তদেব দেশ ১৮.১২.২০০২

তেজপাতা অথবা জিরে ফোড়নে স্বাদবৈচিত্র্য ঘটানো হয়। আবার মাছের মুড়োর সঙ্গে যুক্ত হলে তা হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের। ছোলার ডালে নারকোল-কিশমিশ দিয়ে ভিন্নতর স্বাদ আনা হয়। বাড়িতে যে ছোলার ডাল খাই তার সঙ্গে দ্বারিক বা পুঁটিরামের দোকানে লুচিসহযোগে ডালের স্বাদে পার্থক্য প্রচুর। এদিকে মশুর ডালে পেঁয়াজ-রসুন দিয়ে আমিষ ধরনের স্বাদ আনার চেষ্টা হয়। ডালকে আবার আমের সঙ্গে যুক্ত করে কখনো বা আমের মুকুলের সঙ্গে, অম্লস্বাদের ভিন্নতর মেজাজও আনা হয়।

ইদানীং বাঙালির খাদ্যে অভিরুচির কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তার হেতু : গৃহিণীদের সময়াভাব এবং ডাক্তারবাবুদের নানারকম বায়নাক্কা। আমাদের গড়পড়তা স্বাস্থ্যও ভেঙে যাচ্ছে। অল্পবয়সেই ব্লাড প্রেশার, শুগার, ক্লোরেস্টেরল জাতীয় উপদ্রবে—ডাক্তারি নির্দেশে—আমরা অনেক খাবার বা অনুপান ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছি। মাখনবর্জিত টোস্ট তো যৌবনকালে আমাদের কাছে ছিল ডেনমার্কের রাজকুমারকে বর্জন করে হ্যামলেট অভিনয়। এককালে পাড়ায় পাড়ায় ছিল তেলেভাজার দোকান। সরিষার তেলে ভাজা পেঁয়াজি, ফুলুরি, চপ-কাটলেট। আমরা স্কুল-কলেজে ক্লাস পালিয়ে অনায়াসে খেতাম। এখন বয়স্করা তো বটেই—কিশোর বা তরুণ বয়স্করাও তা খেতে চায় না। ফলে তেলেভাজার দোকানগুলি একে একে উঠে গেল। তার স্থলাভিষিক্ত হল পাড়ায় পাড়ায় ফাস্ট ফুডের কাউন্টার : পরোটা রোল, মাটনরোল, এগরোল, চাউমিন ইত্যাদি। তারাই তেলেভাজার বাজারটা দখল করেছে।

পৌষপিঠে আজকাল কটা বাড়িতে তৈরি হয়? অথচ একসময়ে পৌষসংক্রান্তিতে নানান জাতের পিঠেই ছিল আমাদের একমাত্র ভক্ষ্য। মা-ঠাকুমাকে বড়ি দিতে দেখেছি। প্রথম বড়িটিকে দুর্বা-সিন্দুর মাখিয়ে শাঁখ বাজানো হত। সূর্যকে বন্দনা করে কয়েকটি বড়ি কাক-চড়াই-পিঁপড়েদের নিবেদন করা হত। তারপর রোদে বড়ি শুখানোর পালা। আমরা ছেলেবেলায় হাফপ্যান্ট পরে যেভাবে ছাদে বসে লাঠি হাতে

আমসত্ত্ব বা বড়ির থালা পাহারা দিয়েছি, বীরবিক্রমে বজরঙবলীদের বিতাড়িত করেছি, এখনকার বাচ্চাদের আর তা করতে হয় না। তারা

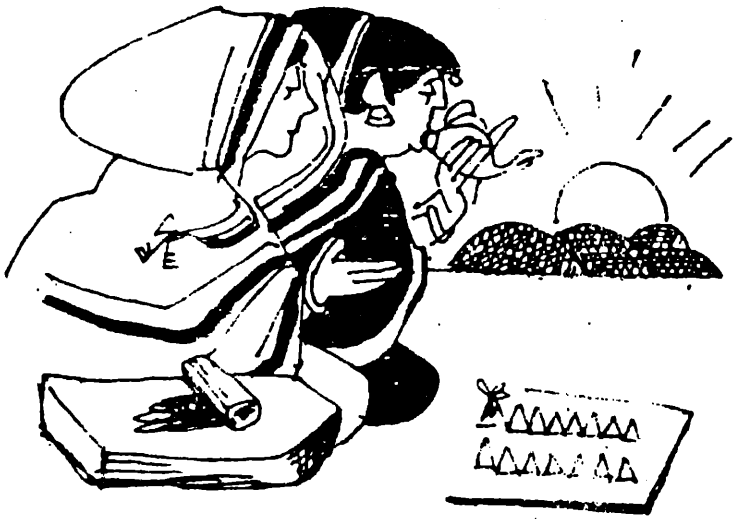

সেই সময়ে 'কম্পুটার গেমস্' খেলে অথবা টি. ভি. তে কার্টুন দেখে। বড়ি-আমসত্ত্ব-আচার সবকিছুই আসে বাজার থেকে। ঠোঙা এবং বোতল বন্দি হয়ে। এমনকি ভাতের মাড় পর্যন্ত! কী কাণ্ড!

আমাদের বাল্যকাল ছিল প্রাচুর্যের যুগ। দুই থেকে তিন টাকা হিমসাগর বা ল্যাঙড়া আমের শ। আমার মনে আছে ১৯৩২ সালে বাবা আমাদের সবাইকে স্টিমারে করে কলকাতা থেকে গৌহাটি নিয়ে গিয়েছিলেন। ভাগীরথী বেয়ে দক্ষিণে নেমে সুন্দরবনের খাঁড়ি পথে নানান ঘাট পার হয়ে শেষে মাথাভাঙা নদী বেয়ে ব্রহ্মপুত্র। তারপর উত্তরমুখো। পুরো এগারোদিন লেগেছিল যেতে। এই এগারো দিনের ভোজ্যদ্রব্য সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল। স্টিমার থেকে বাবাকে চার-আনা জোড়া দেড়সেরি ইলিশমাছ কিনতে দেখেছি। সে আমলে 'বনারস-কা-ল্যাংড়াই আম' বাজারে বিকাতো তিনটাকা শ-দরে। এত খেতাম যে দুপুরে বা রাতে ভাতের পাতে বসতে চাইতাম না। তবে স্বীকার করি : ম্যাগি, চাউমিন,

আইসক্রীম বা পেপসি কোলার স্বাদ আমরা পাইনি। পাইনি তো পাইনি—তা নিয়ে কোনো খেদ নেই। বয়েই গেল!

কৈশোরকালে—আমি তখন হিন্দুস্কুলে ক্লাস সেভেনে পড়ি—জামাইবাবুর হাত ধরে হ্যারিসন রোডের মোড়ে 'দিলখোশা' রেস্তোরাঁয় যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেই আমার জীবনে প্রথম দোকানে বসে 'কাটলেট' খাওয়া। তার আগে 'কাটলেট' বস্তুটার নাম শোনা ছিল। বন্ধুদের মুখে তার প্রশংসাও শুনেছি। কিন্তু কোনও নিমন্ত্রণ বাড়িতে কখনো কাটলেট বা ফিশ ফ্রাই খাইনি। তখন নিমন্ত্রণ বাড়িতে এসব রান্নার রেওয়াজই ছিল না। হাফপ্যান্ট পরে, শার্টের কলার উল্টে দিয়ে আমি তো গম্ভীর মুখে দিলখোশায় বসেছি। জামাইবাবু জিজ্ঞেস করলেন 'কী খাবি, বল?'

আমি নির্দ্বিধায় বললাম : কাটলেট!

জামাইবাবু বেয়ারাকে ডেকে বললেন, আমাদের দুজনকে দুটো কোবরেজি কাটলেট দিতে। শুনে আমার তো আক্কেল গুড়ুম। সর্বনাশ! আমি আশা করেছি 'মটন-কাটলেটের' অর্ডার দেবেন জামাইবাবু, অথবা

ফিশ-কাটলেট (মুর্গি তখনো আমাদের পরিবারে চালু হয়নি) কিন্তু উনি বললেন 'কোবরেজি কাটলেট'! লজ্জায় মুখ ফুটে বলতে পারলাম না— 'না। পাঁচনে ডুবিয়ে কোবিরাজি কাটলেট খাব না!'

কিন্তু বেয়ারা যখন দুটি প্লেট দিয়ে গেল তখন আবার আমার আক্কেল গুড়ুম! কোন্ কবিরাজ এ জাতীয় কাটলেট আবিষ্কার করেছেন? অত্যন্ত সুস্বাদু। ডিমে ভাজা মটন-কাটলেট।

অনেক পরে জেনেছি—ওটা 'কভারড্ কাটলেট। অর্থাৎ ডিমের আস্তরণে আচ্ছাদিত কাটলেট। 'কাভার্ড' বিশেষণটা বাঙালি উরুশ্চারণে হয়ে গেছে 'কোবরেজি'।

আমাদের ছেলেবেলায় মা-ঠাম্মা-দিদিমা-বৌঠানেরা কী যত্ন নিয়ে কত বিচিত্র ঢঙের সব রান্না করতেন। তার ফিরিস্তি তৈরি করতেই একালের গৃহিণীরা তিনবার কলমের রিফিল বদলাবেন! ধরুন আমার জেঠশ্বাশুড়ি ঠাকরুণের কথা। সেটা আমার যৌবনকালের বৃত্তান্ত। তিনি ছিলেন মৈমনসিংহের মুক্তাগাছার জমিদার-বাড়ির গৃহবধূ—রেণুকা দেবী (১৯০৯—১৯৮৫)। অসামান্যা রন্ধন পটিয়সী। তাঁর লেখা দু-তিনখানা রান্নার বই কিনেছি—রন্ধনবিদ্যা শিখব বলে নয়। গিন্নিকে উপহার দেব বলে। নিজের স্বার্থেই। নতুন জামাই হিসাবে তাঁর রান্নাকরা অন্নব্যঞ্জনের স্বাদও পেয়েছি (১৯৫১)। সেসব ভোলা যায় না। খেতে খেতে সেই 'বাগানবাড়ির জেঠিমার' কাছে গল্প শুনেছিলাম যে, তার পনের বছর আগে তিনি দিল্লিতে তরুণ কংগ্রেস নেতা জহরলাল নেহরু আর কোকিলকণ্ঠী সরোজিনী নাইডুকে কীভাবে স্বহস্তে পরিবেশন করে আপ্যায়ন করেছিলেন মধ্যাহ্ন আহারে (১৯৩৬)।

তখন তাঁর বয়স বছর সাতাশ। তাঁর স্বামী ধীরেন্দ্রকান্ত কেন্দ্রীয় বিধানসভায় সে আমলের অবিভক্ত বাংলার ভূস্বামিবৃন্দের একমাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধি। নিমন্ত্রণ গ্রহণের পর জওহরলাল ধীরেন্দ্রকান্তকে বলেছিলেন যে, সেটা তাঁর মহাগুরু-নিপাতের বছর, তাই তিনি শুধু নিরামিষ আহার গ্রহণ করবেন। সরোজিনী পণ্ডিতজীর কথার পিঠে বলে বসলেন, 'আমি বাপু নিপাট বাঙালির মেয়ে; আমার মাছভাত চাই,

রেণুমা। নিরামিষ আমি ছোঁবই না'।

জেঠিমা পরদিন দুই সম্মানিত অতিথিকে—বল্লে না-পেত্যয় যাবেন—চৌষট্টি দুগুণে একশ আঠাশ পদ পরিবেশন করেছিলেন! তবে তিনি নিজেই সবকিছু রাঁধেননি। লিখেছেন,

"নয়াদিল্লির তখন গোড়াপত্তনের যুগ। মুষ্টিমেয় বাঙালি সমাজ। এই খাওয়ানোর ঘটনাটা অচিরে দিল্লির প্রবাসী বাঙালি-সমাজের কাছে একটা 'প্রেস্টিজ ইশু' হয়ে দাঁড়াল। বাঙালি বড় বড় ব্যবসায়ীর ধর্মপত্নীরা আই. সি. এস. ঘরণীরা মহিলা ক্লাবে আমাকে বললেন, 'কুছ পরোয়া নেই, রেণুকা, আমরা তো মরে যাইনি!' ... তাঁরা এক এক বাড়ি থেকে কয়েকটি পদ রান্না করে টিফিন-ক্যারিয়ার ভর্তি করে পাঠালেন। শেষে দুজনকে আলাদা করে চৌষট্টিপদ আমিষ আর চৌষট্টি পদ নিরামিষ ভোজ পরিবেশন করা হয়েছিল।"

—এই হচ্ছে সে-কালীন বাঙালি গৃহিণীকুলের কীর্তি।

জেঠিমার বইতে দেখছি বাঙালি রান্নায় কী প্রচণ্ড রকমফের!

ভাজা : বাহান্ন প্রকারের। ঘন্টো-শুক্তো-ঝোল : ঊনত্রিশ রকমের। ডাল তেতাল্লিশ, তরকারি একুশ, মায় নিরামিষ পোলাওয়ের প্রকারভেদ সতের। জেঠিমার পরবর্তী রান্নার বইটি হচ্ছে **রকমারি আমিষ রান্না**। তাতেও মাছ-মাংস-ডিম মিলিয়ে ছয়শত রান্নার প্রকরণ বিধি। কিছু কিছু খাদ্য আমার কাছে 'রুট-ওভার-মাইনাস-ওয়ান'ও নয়। অর্থাৎ স্বাদ বা প্রত্যক্ষ পরিচয়ের কথা দূর অস্ত, তার নামই শুনিনি জীবনে। যেমন একটি বাগদাদী পদ : 'বাবা গানুস পোড়া'। আজ্ঞে না, 'গণেশ' নয়, 'গানুস'। শব্দটা অভিধানে নেই। তবে হ্যাঁ, রবীন্দ্ররচনাবলীতে আছে। শিশু কবিতাগ্রন্থে। খোকার জবানিতে। খুকি তো কিছুই বোঝে না। তাই 'গণেশ'কে নাকি বলে 'গানুশ'।

খাদ্যবিহারের এই বাঙালিয়ানা বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা, সারা ভারতে আর কোথাও দেখা যায় না। বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণের কয়েকটি রাজ্যে 'ডাল' বলতে বোঝায় অড়হরের ডাল। তেঁতুল যোগে তা অম্লস্বাদের সম্বর। এছাড়া অন্য কোন ডালকে তারা চেনে না। ইডলি-দোশা-বড়া উত্তপম আর দহিবড়া এই হচ্ছে দাক্ষিণাত্যে স্বাদের দিগন্ত। তার সঙ্গে যুক্ত হবে রসম, সম্বর আর চাটনি—তাতে দধি ও তিন্তিরির একাধিপত্য। তেমনি পাঞ্জাবি খানা—তন্দুরি রুটি ঔর গোস্। তন্দুরির বদলে হাতে-গড়া মোটা মোটা রুটি পেতে পারেন, সৌখিন রহিসব্যক্তি নিমন্ত্রণ করলে ভাগ্যক্রমে রুমালি-রুটিও জুটতে পারে; কিন্তু 'গোস'—তা সে পাঁঠার, ভেড়ার অথবা মোরগার যাই হোক না কেন স্বাদে অপরিবর্তনীয়। প্রচুর আলু, প্রচুরতর টমেটো সহযোগে মাংস সেখানে একটা থকথকে ভিস্কাস্ ভীশাস পঙ্কে নিমজ্জিত। পাঞ্জাবি খাদ্যরসিকেরা শতাব্দিকাল সেই রসে মজে আছেন, যেমন মদ্রদেশীয়রা আছেন সহস্রাব্দি কাল সম্বর-সাগরে।

বাঙালি তাদের জাতীয় কবির ওই নীতিটা মনে প্রাণে মেনে চলে : 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে।' নিজস্ব-ঘরানার নানান বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও বাঙালি সেই বিদেশী খাদ্যগুলিকে অবহেলা করেনি। কলকাতা শহরে দীর্ঘ-দীর্ঘ দিন সেই 'মহাভারতীয়' প্রাকপ্রণালীতে

প্রস্তুত আহার্যদ্রব্য তারা সাদরে গ্রহণ করেছে।

প্রতাপকুমার রায় বর্তমান বাঙলার একজন সুপ্রতিষ্ঠিত রহিস খাদ্যবিশারদ রূপে স্বীকৃত। বিশারদ নয়, তিনি কনৌসার! সারা কলকাতায় বিভিন্ন দোকান এবং রেস্তোরাঁতে ঘুরে বিখ্যাত খাদ্যদ্রব্যগুলি আস্বাদন করেছেন এবং নোটবুকে লিখে নিয়েছেন। ভোজন-রসিক হিসাবে তাঁর নিষ্ঠা অতুলনীয়। কলকাত্তাইয়া খাদ্যরসিকের উপকার হতে পারে বলে তিনি প্রায় বছর-দশেক আগে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন : **সুখাদ্য সুবচন**। বইটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। তাই তাঁর গবেষণা-প্রসূত কিছু কিছু তথ্য এখানে লিপিবদ্ধ করা গেল। যাতে আপনারা ইচ্ছা হলে 'মহাজনগতস্য পন্থায়' সেইসব খানাকামরায় গিয়ে জিহ্বা-কর্ণের বিবাদ নিজেরাই মেটাতে পারেন। রায়মশাই অবশ্য তাঁর গ্রন্থে গোটা ভারত দাবড়ে বেরিয়েছেন—লক্ষ্ণৌর অখ্যাত গলি, বোম্বাই (তখন তাই ছিল) -দিল্লি-কানপুরের কোথায় এঁদোস্য এঁদো গলির কোন্ দোকানে কী অনবদ্য খাদ্য পাবেন তা বলা হয়েছে। আমরা এখানে তা শুধু কল্লোলিনী কলকাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করছি। এগুলির অধিকাংশই আমার পরিচিত। রায়-মশায়ের বক্তব্য সমর্থন করে আমার জিহ্বা ও রসপিপাসু অন্তর। তবে অনেকগুলি আমার অপরিচিত। হোক 'হেয়ার-সে'—পাঠক-পাঠিকার ডিভিশন বেঞ্চের কাছে আমার সবিনয় নিবেদন : আমাকে বলতে দিন, য়োর অনার্স।

কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় যাতায়াত আছে অথচ গোলদীঘির পূর্বপারে মহাবোধি সোসাইটির পাশে দুটি সরবতের দোকানের খবর রাখেন না এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। গত পঞ্চাশ বছর ধরে গ্রীষ্মের দুপুরে সবন্ধু 'প্যারাগন' ও 'প্যারাডাইস' -এ সরবৎ পান করেছি। ওঁদের সেরা আইটেম ছিল 'মালাই'। এখন একটি দোকান উঠে গেলেও দ্বিতীয়টি বর্তমান। আমার ধারণা ছিল এ দুটিই কলকাতার সেরা সরবতিয়া। প্রতাপবাবু কিন্তু লিখছেন, "এই শিল্প ভাবনা একেবারে তুঙ্গে উঠেছে বিধান সরণীর আর একটু দক্ষিণে। যেখানে কৈলাস বোস স্ট্রিট এসে মিশেছে। ভাবতে

পারেন, কোন দোকানে লেখা আছে : কাহাকেও একসঙ্গে দুই গ্লাসের অধিক সরবৎ দেওয়া হইবে না। দোকানের নাম যে **কপিলাশ্রম** সেটা ভালো করে নজরে পড়ে না। গুণীজন এই সাবধানবাণীতে নিরস্ত হন না। গরমকালে দোকানের সামনে দীর্ঘ কিউ পড়ে।"

কৈলাস নয়, কেদারের পথে একটি সরবতের দোকান **কপিলাশ্রমে** সরবৎ পান করে পরম তৃপ্তি পেয়েছিলাম। সেকথা লিখেও গেছি **পথের মহাপ্রস্থান** গ্রন্থে। সেটা পথপার্শ্বের জুড়ানি বাগানে। কৈলাস বোস স্ট্রিটে নয়। ডালমুট প্রসঙ্গে রায়মশায় লিখেছেন "দোকানটি উজ্জ্বলা সিনেমার উত্তরের গলির মাথায়, বড় রাস্তার উপর। এ দোকান নাকি ১৯৪০ সাল থেকে আছে। ছোট জায়গা। দুটো বড় গামলায় ডালমুট ঢালা রয়েছে। ছোট বড় নানান রঙের ঠোঙাতে একজন ওজন করে ডালমুট ভরে

সাজিয়ে রাখছে। একজন বিক্রি করছে। ... ডালমুট একটু খেয়েও দেখলাম। উপাদেয়। ... ঝালমশলা বেশি বা রুচিমতো চাইলে, ঠোঙা

খুলে সেইমতো মশলা মিশিয়ে দেওয়া হয়। বস্তুত এই মশলাই ওই দোকানের বিশেষত্ব।"

ঝালমুড়ি আমাদের কৈশোর ও তারুণ্যের যুগে ছিল বৈকালিক আনন্দ-আহরণের এক আবশ্যিক অনুসঙ্গ। বিশেষত খেলার মাঠে, দুর্গাপূজার প্যান্ডেলে অথবা ক্বচিৎ কখনো ছপ্পড়ফোঁড় সুযোগ হলে বান্ধবীদের সঙ্গদান কালে। ইদানীং ছেলেমেয়েরা তার বদলে 'ফুচকা' অথবা 'ফাস্ট ফুডের' দোকানে হানা দেয়। দোষ শুধু তাদের নয়। সেকালীন ঝালমুড়ির স্বাদ চলে গেছে ইতিহাসের নেপথ্যে। সে-আমলে ঝালমুড়িতে যুক্ত হত পাঁচ-ছয় রকমের ছোলা-মটর, বাদাম, ঝুরিভাজা, এছাড়া নানান মশলা। লোকাল ট্রেনের ভেন্ডাররা কেউ-কেউ সেই বাপ-পিতেমোর গুরুমুখী বিদ্যাটাকে ধরে রাখতে চায়। প্রভাতকুমার ঝালমুড়ি প্রসঙ্গে লিখছেন।"

> *"ঝালমুড়ির জনৈক নিষ্ঠাবান শিল্পী ওয়েলিংটন-স্কোয়ারে এখনো মুড়ির ঐতিহ্য অক্ষত রেখেছেন। দোকানটি আমিই দেখছি পয়তাল্লিশ বছর। যদিও যে মুড়ি বেচছিল সে বলল, দোকানটি প্রথম মহাযুদ্ধের সমসাময়িক। মালিকের বাড়ি বিহার-সরিফ। দোকান প্রতিষ্ঠার সময় ভদ্রলোক মুড়ি মাখার যে নিজস্ব ধারার প্রবর্তন করেন তার কোনও হেরফের হয়নি। দোকানটি ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়ের মাথায়, উত্তর-পশ্চিম কোণে। সাইনবোর্ড নেই ... আপনি পঁচিশ পয়সার মুড়ি চাইলে ছোট ছোট ঠোঙাতে তিনভাগ মুড়ির সঙ্গে একভাগ ডালমুট মিশিয়ে দেওয়া হবে। ... এদের ঝাঁঝালো, সুরভিত, মুচমুচে ডালমুট-সহযোগে মুড়ি যে কত সুস্বাদু হতে পারে, না আস্বাদন করলে বোঝা যাবে না।"*

নিরামিষ জলখাবারের বিপণী হিসাবে সেকালে স্বনামধন্য হয়েছিল কয়েকটি দোকান। **দ্বারিক** ও **পুঁটিরামের** লুচি-ডাল। প্রত্যেকটি ফুলকো। আটা মেশানো লালচে পুরি নয়, সাদা-ময়দার পূর্ণযৌবনা অমধ্যক্ষামা

গৌরবর্ণা। ডাল চাপ-চাপ, নারকোল-কুচি ও কিশমিশ সহযোগে কিঞ্চিৎ মিষ্টিস্বাদের। সে যুগে **ভীমনাগ** ও পরে রাসবিহারীর জুনিয়ার **গুপ্ত ব্রাদার্সের** হিঙের কচুরিও প্রসিদ্ধ। বাগবাজার, শ্যামবাজার ও শেয়ালদহ অঞ্চলে কিছু মিষ্টির দোকানে আলুরদম সহ রাধাবল্লভী খেয়ে তৃপ্ত হয়েছি। মিষ্টান্ন প্রসঙ্গে ভীমনাগ, দ্বারিকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে **সেন-মহাশয়**, শ্যামপুকুরের **চিত্তরঞ্জন মিষ্টান্নভাণ্ডার**, ইনকেলাব-যুগের প্রাগ্‌বর্তী-কালে **জলযোগ** ছিল সমান বিখ্যাত। পরবর্তী কালে সারা-কলকাতায় অনেক নামী-দামী দোকান সুনাম কিনেছে। সল্ট লেক অঞ্চলে **ভি. আই. পি**, মধ্য ও দক্ষিণ কলকাতায় **মিঠাই, ভিয়েন, মৌচাক, নেপাল সুইটস্**। বেহালা চারমাথার মোড়ের কাছাকাছি একাধিক দোকান। রসগোল্লার ক্ষেত্রে আদি আবিষ্কর্তার বংশধর **কে.সি.দাশ**। কিছু কিছু ছোট দোকানেও কিন্তু দারুণ মিষ্টি পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বলব ভবানীপুর অঞ্চলে নর্দার্ন-পার্কের কাছাকাছি **দক্ষিণাকালী**।

এখানে শুধু কলকাতার কথাই বলা হয়েছে। এদিকে বারাসাত, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর আর ওদিকের পেনেটি, চন্দননগর, বর্ধমান প্রভৃতির কথা বাদ দিতে হল। এবার বরং আমিষপদের প্রসঙ্গে আসি।

চিৎপুর রোডের উপর, পশ্চিম ফুটপাথে মহাত্মা গান্ধী রোডে অবস্থিত রয়াল ইণ্ডিয়ান হোটেল। আসলে হোটেল নয়। রেস্তোরাঁ। দোতলা বাড়ি। উপরে ও নিচে প্রশস্ত বসার জায়গা। প্রতাপকুমারের মতে এখানকার সবসেরা পদ মটন চাঁপ। চপ নয়, উরুশ্চারণে ভুল করে বসবেন না।

"বিশেষ কোন জারক রসে মাংসের এমন চরিত্র বদল হয় যে, মাংস বলে চেনা গেলেও তার স্বাদে একটা অভিনবত্ব আসে। ... জাফরানের মৃদু সৌরভ দিবাস্বপ্নের সুখাভাস আনবে।"

চৌরঙ্গীর 'অনাদি কেবিনের' মোগলাই পরোটা আর মহাত্মা গান্ধী রোডের 'দিলখুশা'র কোবরেজি কাটলেটের স্বাদ আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমল থেকেই পেয়েছি। উত্তরপ্রদেশের সাবির-সাহেব ভারত স্বাধীন হবার বছরেই 'সাবির' রেস্তোরাঁ খুলে বসেছিলেন। এখানে নানান জাতের

উত্তর ভারতীয় বা মোগলাই খানা পাবেন। যেমন চিকেন চাঁপ, মটন চাঁপ, চিকেন বিরিয়ানি। কিন্তু কৃষ্ণনগরে গেলে আপনি যেমন রসগোল্লা, সন্দেশের সন্ধান না করে জানতে চাইবেন—খাঁটি 'সরপুরিয়া' কোথায় পাব? এখানেও তেমনি সাবিরের সেরা রেসিপি হচ্ছে : 'রেজালা'! দোকানটি সহজে নজরে পড়ে না, চাঁদনির এক অখ্যাত রাস্তার উপর। কিন্তু ও অঞ্চলের বাসিন্দা প্রশ্ন মাত্রেই আপনাকে এই প্রসিদ্ধ অন্তেবাসী দোকানটির সন্ধান বাতলে দেবে। প্রতাপকুমার তাঁর প্রবন্ধে শেষ নিদান হেঁকেছেন, "অনেকে রেজালার স্বাদ রসনায় রেখে বাড়ি ফিরতে চান, তাঁরা মিষ্টান্নের দিকে নজর দেননা। বিপরীতপন্থীরা শাহি টুকরা, ... বা ফিরনির আদেশ করেন। রেজালার সুখস্বাদ তাঁদের জিহ্বায় নয়, স্মৃতিতে থাকে। স্মৃতির মতো সুখের আর কী আছে?"

এবার বলি 'নিজাম'-এর কথা। শেখ হাসান রাজা প্রায় ছয় দশক আগে 'নিজাম' নামে এই ভোজনশালাটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। খাদ্যতালিকা দীর্ঘ। কিন্তু বর্ধমানের যেমন সীতাভোগ, জয়নগরের যেমন মোয়া, ময়মনসিংহের যেমন মণ্ডা অথবা সাবিরের যেমন রেজালা—নিজামেও তেমনি একটি বিশেষ মেনুর প্রতি খদ্দেরদের নজর : 'কাঠিরোল'। আগে ছিল পরোটা-কাবাব। এখন কাঠিতে মাংসমিশ্রিত পরোটা জড়িয়ে একটা নতুন পদের সৃষ্টি হয়েছে : কাঠি-কাবাব। নবীনচন্দ্রের রসগোল্লা আবিষ্কারের যেমন মনগড়া কাহিনী ইতিপূর্বে শুনিয়েছি সেভাবেই প্রভাতকুমার কাঠি-কাবাবের উদ্ভাবন বর্ণনা করেছেন। "জনৈক শ্বেতাঙ্গ পরোটা ও কাবাবকে কীভাবে কব্জা করবেন বুঝতে না পেরে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন। হয়তো হাত লাগাতেও চাননি। নিজাম তখন বিপত্তারণ মধুসূদনের মতো পরোটা কবাবে মুড়ে নিম্নাঙ্গে একটুকরো কাগজ জড়িয়ে মুহূর্তে সমস্যার সমাধান করেন। যুগপৎ একটি নূতন পদের উদ্ভাবন হল—'কাঠিরোল।' তার সঙ্গে পরিচয়ের ক্ষণেই আমরা তার মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি।"

চীনা রেস্তোরাঁ এখন পাড়ায়-পাড়ায়। কয়েকটি চীনা পদ তো এখন মেলে পথের মোড়ে-মোড়ে ফাস্ট-ফুডের দোকানে : চিকেন চাউমিন,

প্রন চাউ, চিলি-চিকেন ইত্যাদি। ট্যাংরা অঞ্চলে আমার যাতায়াত কম, ঠিক জানি না। চায়না-টাউনও তথৈবচ। চীনা খাবার খাওয়ার মন হলে আমি সে আমলে যেতাম চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যুয়ে, চাং ওয়াতে, অথবা পার্ক স্ট্রিটে আউট্রাম মূর্তির (যেটি স্বাধীনতা লাভের পর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে নির্বাসিত, যদিও গোটা এশিয়ায় অমন অপূর্ব অশ্বারোহী মূর্তি আর আছে কি না সন্দেহ) বিপ্রনীত 'পিকিঙ' রোস্তোরাঁয়। ইদানীং ক্যামাক স্ট্রিট-পার্ক স্ট্রিটের সংযোগস্থলে 'ওয়ালডর্ফে'। বহুবার মালিকানা বদল হলেও এদের চীনারান্নার স্বাদে কোনও বদল হয়নি। ইদানীং কল্লোলিনী কলকাতায় চায়নাবৌল জাতীয় অনেক-অনেক খানদানী চীনা রেস্তোরাঁরও জন্ম হয়েছে বটে; কিন্তু সাহস করে মাথা গলাইনি। কারণ আমি ক্যাশে বিল মেটাই, ক্রেডিট-কার্ডে নয়। দ্বিতীয়ত হাজার টাকার নোট হাতে এলে পাড়ার ব্যাঙ্ক আমাকে ভাঙিয়ে দেয়।

বিরিয়ানি পোলাও-এর স্বাদেও দেখেছি ভিন্ন লোকের ভিন্ন রুচি। আমার জিহ্বা হেড-একজামিনার হলে ফার্স্ট-ক্লাস ফার্স্ট হবে পার্ক স্ট্রিট আর সার্কুলার রোডের সঙ্গমস্থলে 'সিরাজ'।

আমার জানা কলকাতায় নিখুঁত 'বাঙালি ভোজন' তিনটি স্থানে প্রাপ্তব্য। শেয়ালদহ অঞ্চলে এবং অন্যান্য বাজারের কাছাকাছি একাধিক পাইস-হোটেলে মাছ-ভাত, মুড়িঘণ্ট, ধোকার ডালনা, মাছ-পাতুরি বা দই-মাছ হয়তো পাবেন; কিন্তু সেগুলি নির্ভেজাল বাঙালি রান্না নয়। অধিকাংশই উৎকলী পাচকদের দ্বারা প্রস্তুত এবং অধিকাংশ হোটেলেই মোগলাই অথবা পঞ্জাবি রান্নার ভেজাল ঢুকে পড়েছে। দোকানদারকে দোষ দিচ্ছি না—তারা যুগের রুচি বজায় রেখে চলেছে। যে তিনটি নির্ভেজাল বাঙালি রান্নার ভোজনাগারের কথা বলছি, তাদের পরিবেশন-ব্যবস্থায় কিছু পার্থক্য আছে। একটিমাত্র পাইস-হোটেল, বাকি দুটিতে 'থালি' পাওয়া যায়। যদিও 'আ-লা-কার্টে'র ব্যবস্থাও আছে। একে একে বলি :

বহুবাজার আর ওয়েলিংটন স্ট্রিটের মোড়ে, দক্ষিণ-পশ্চিমে একটা সাইনবোর্ড দেখবেন : 'বঙ্গবাসী'। রাস্তা থেকে একমুখো সিঁড়ি বেয়ে দ্বিতলে উঠে যান। সেখানেই বেঞ্চিতে আহারের আয়োজন। পাইস সিস্টেমে। প্রতি হাতা ভাত, প্রতি হাতা ডালের জন্য আপনার মিটার উঠবে। পরিবেশক হাঁকাড় পেড়ে যাবে 'দু নম্বরে দু-হাতা ভাত, তিন নম্বরে একহাতা চচ্চড়ি ...' ইত্যাদি। দূরে বসে ম্যানেজার শ্রুতিলিখন লিখে চলেন। আহারান্তে পান চিবাতে চিবাতে সেই ফর্দ অনুযায়ী আপনি দক্ষিণা দেবেন। আমার অনেক উত্তর ভারতীয় বা দক্ষিণদেশের বন্ধুকে—যাঁরা কলকাতায় এসে টিপিকাল বাঙালি-খানা খেতে চেয়েছেন—তাঁদের এখানে এনে খাইয়েছি। অভারতীয় কোন বন্ধু যখন নির্ভেজাল বাঙালি-ভোজে আপ্যায়িত হতে চেয়েছেন তখন সেখানে নিয়ে যাইনি। গেছি এলিয়ট রোডের **সুরুচি**-তে।

সুরুচি একটি টিপিকাল বাঙালি ভোজনালয়। আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড থেকে এলিয়ট রোডে সাপের মতো এঁকে বেঁকে ট্রাম রাস্তা চলেছে ওয়েলেসলি মুখো। সেই রাস্তাতেই সার্কুলার রোডের মোড়ের কাছাকাছি সুরুচি ভোজনালয়। বাড়িটার বাইরে চাকচিক্য নেই। ভিতরে বাঙালি ঘরানার ঘরোয়া পরিবেশে অন্নব্যঞ্জন পরিবেশনের ব্যবস্থা। না, আসন পিঁড়ি হয়ে মাটিতে বসতে হবে না তা বলে। সকাল নটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত দোকান খোলা। প্রভাতকুমার এর সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন কয়েকটি ছত্রে— "দোকানের বাইরেটার মতোই খাবারও চেঁচিয়ে কথা বলে না। গেরস্তবাড়ির মেয়ের মতো নম্র। কোথাও উগ্রতা নেই। তেল, মশলা, ঝাল পরিমিত ... খাবার ও দাম উভয়ই মনোমত। বেশি নির্বাচনে যেতে না চাইলে 'থালা' অর্ডার দিতে পারেন। ভাত, রুটি অথবা লুচি, ডাল, মোচার ঘণ্ট কিংবা এঁচোড়ের ডালনা, অথবা ফুলকপির তরকারি, রুইমাছের কালিয়া, শেষকালে একটা পুলিপিঠে। সাত টাকা।"

সবই অপরিবর্তিত আছে আজও। শুধু ওই শেষ পাতের 'সাতটাকা' শব্দটাকে ব্যতিক্রম হিসাবে ধরে নিলে। ওটা দশ বছর আগের রচনা।

এটি অল বেঙ্গল উইমেন্‌স্‌ ইউনিয়ন পরিচালিত। নিরাশ্রয় অনাথ মা-বোনদের রুজি-রোজগারের একটি শুভ প্রচেষ্টা। মেয়েরাই রান্না করে, পরিবেশন করে, ক্যাশ দেখে। বিল মেটানোর পর মিষ্টিগলায় বলে, 'আবার আসবেন।' প্রায় প্রতিদিনই তিন রকমের মাছ থাকে। ইচ্ছে মতো থালির অতিরিক্ত অর্ডার দেওয়া যায়—ইলিশের ভাপা অথবা সর্ষেবাটা, চিংড়ির কালিয়া বা নারকোল-সহযোগে মালাইকারি, কই-পাতুরি, ভেটকির পাতুরি, অথবা চিতলমাছের সেই বিখ্যাত বিরল পরমস্বাদ : 'মুট্টা'। কোন্‌টা কবে পাবেন তা আপনার কপাল নির্ভর। কারণ ভোজ্যতালিকা প্রত্যহ পরিবর্তিত হয়। তবে বাঙলা পাঁজি দেখে পৌষসংক্রান্তির তারিখটা যদি ডায়েরিতে চিহ্নিত করে রাখেন এবং সেদিন সবন্ধু ওখানে সকাল-সকাল যান তাহলে একাধিক পিষ্টকের সন্ধান পেতে পারেন : রাঙা আলুর পুলি পিঠে, গোকুল পিঠে, দুধ পুলি, পাটিসাপটা। এঁরা পাটিসাপটা তৈরি করেন পুব বাঙলার ঢঙে। অর্থাৎ ঘিয়ে ভাজার পর পাতলা শর্করার রসে চুবানো হয় না। গা-মাখা গা-মাখা গাঢ় খেজুরগুড়ের হালকা আস্তরণে সে পাটিসাপটা আপনাকে এক নস্টালজিয়ার স্বাদ এনে দেবে—যদি আপনি ওপার বাঙলার ছিন্নমূল মানুষ হন। না হলেও ক্ষতি নেই। এপার বাঙলার বাসিন্দা কি ধলেশ্বরীর মাঝিভাইয়ের ভাটিয়ালী শুনে উদাস হয়ে যায় না?

বাঙালি-ভোজনের তৃতীয় আয়োজন যেটির কথা বলতে যাচ্ছিলাম সেটা উচ্চকোটির জন্য সীমাবদ্ধ। খানা-কামরা বাতানুকূলিত। দেওয়ালে শান্তিনিকেতনী নক্‌শা সমন্বিত ট্যাপেস্ট্রি। নেপথ্যে সুচিত্রাদি, মেহরদি, কিংবা জর্জদার সুমিষ্ট কণ্ঠে হালকা রবীন্দ্রসঙ্গীত। যাঁরা পরিবেশন করেন তাঁদের সাজ-পোশাকও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদের বাবু-কালচারে। এই বাঙালি ভোজনস্বর্গে মাথা গলিয়েছিলাম একবার, মাথা মুড়োনোটা আর হয়নি। অর্থাৎ অভুক্ত ফিরে এসেছিলাম।

কিন্তু সে দুঃখের কথা বলার আগে নিজের দুটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা কবুল করা প্রয়োজন। আপনারা এ দুটিকে 'দোষ' বলতে পারেন।

আমি তা মানি না। বলি : চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। 'সেকেন্ড নেচার'। স্বভাব। 'দোষ' নয়।

প্রথমটি হল : মধ্যাহ্ন বা নৈশ আহারে আমি পাতে কিছু ফেলে রেখে উঠে যেতে পারি না। নিজের বাড়িতে খাবার টেবিলে হাতা করে প্রয়োজন মতো অন্ন, ব্যঞ্জন, মিষ্টান্ন উঠিয়ে নিই। নিমন্ত্রণ বাড়িতে পরিবেশককে পূর্বেই সতর্ক করে দিই। বিবাহিত জীবনের আদিপর্বে এ জন্য বারে বারে বিড়ম্বিত হয়েছি। শেষপাতে আমাকে চেটে পুটে খেতে দেখলে শ্বাশুড়ী ঠাকরুণ মনে করতেন জামাইয়ের বুঝি উদরপূর্তি হয়নি। আমার ব্যাঘ্রঝম্পন-বাধা অস্বীকার করে তিনি আরও কিছু অন্নব্যঞ্জন পাতে ঢেলে দিতেন। আমার কষ্ট হত, তবু সেটাও ভক্ষণ করে যখন হাত চাটতাম তখন শ্বাশুড়ি মা কী করবেন ভেবে পেতেন না। আমার সদ্যোবিবাহিতা জীবনসঙ্গিনী অনেক কষ্টে তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিল—এটা তাঁর জামাইয়ের একটা বদ অভ্যাস। শ্বাশুড়ী ঠাকরুণ শেষমেশ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। মদো-মাতাল-রেসুড়ে জামাইকেও তো মেনে নিতে হয়, এই চাষাড়ে রীতিটাকেও জমিদার বাড়ির গৃহিণী মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। যতই আয়োজন কর যত পদই রাঁধ—ও শেষমেশ হাত চাটবেই, পাত চাটবেই!

একবার—এই দীর্ঘ আশি বছরের জীবনে মাত্র একবার—আমাকে ভুক্তাবশিষ্ট পাতে ফেলে উঠে যেতে হয়েছিল। স্ত্রী-আচারের অলঙ্ঘনীয় নির্দেশে। সে আজ অর্ধশতাব্দী পূর্বে।

মধ্যাহ্নভোজে প্রকাণ্ড কাঁসার থালায় ষোড়শোপাচারে আমাকে আহার্য পরিবেশন করা হয়েছিল। আমি তার এক তৃতীয়াংশ শেষ করতে পেরেছিলাম। কাঁসার থালার এক-তৃতীয়াংশে ভাত-পোলাও-লুচি মেখে নোংরা করে। বাকি দুই-তৃতীয়াংশ ছিল ঝকঝকে আয়নার মতো সাফা। এ ঘটনার প্রমাণ দিতে পারব না, কিন্তু সাক্ষী মজুত আছেন আমার গৃহেই : 'গৃহমুচ্যতে'। সেটা আমার বাসিবিয়ের দিন দুপুরের খাওয়া।

যাক, যেকথা বলছিলাম। এসপ্ল্যানেড অঞ্চলে সেই বাতানুকূলিত

খানদানি বাঙালি ভোজনবঞ্চনার ইতিকথা। বছর পাঁচেক আগেকার কথা। আমার এক সহপাঠী বন্ধু— গৌরদাস বসুমল্লিককে নিয়ে সেখানে মধ্যাহ্ন আহারের উদ্দেশ্যে হানা দিয়েছিলাম। মেনুকার্ডে দেখি, নানান বাঙালি খানার উল্লেখ। সেই সঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে—'থালি' পদ্ধতিতে দু-রকম খানার অর্ডার দেওয়া যায় : 'ভোজ' আর 'মহাভোজ'। ভোজ প্রতি প্লেট তখন ছিল, একশ পঁচিশ টাকা, মহাভোজ দেড়শ।

ভোজে দেওয়া হবে : অন্ন, লোচিকা, পোলাও, পাঁচ রকমের ভাজা, চার-পাঁচ রকমের নিরামিষ ও তিন-চারটি আমিষ পদ। তৎপরে চাটনি, পরমান্ন, দু-তিন রকমের পিঠা, কড়াপাক সন্দেশ ও রাজভোগ। মেনুকার্ডে আরও লেখা আছে যে-কোন পদ যতবার ইচ্ছে 'রিপিট-দ্য-মিক্সচার' করা যাবে। 'মহাভোজে' কী সরবরাহ করা হয় নজর করে দেখিনি। বকরাক্ষসের বংশাবতংশ না হলে সেদিকে নজর দেওয়া ধৃষ্টতা।

পরিবেশক ছেলেটি কোঁচানো ধুতি, গিলে করা সিল্কের পাঞ্জাবি পরে এগিয়ে এসে নমস্কার করল। আমি বলি, একটা 'ভোজ' থালি আর একটা বাড়তি থালা।

ছেলেটি আমাদের দুজনের দিকে দেখে নিয়ে বললে, স্যার, আমরা এক এক জনকে এক থালাই পরিবেশন করি—একটা অর্ডার দিলে। বাড়তি থালা, মানে ভাগা-ভাগি করে খাওয়ার কানুন নেই।

আমি বলি, সে কী! কথা দিচ্ছি আমরা কোন সেকেন্ড হেল্প চাইব না। আপনারা প্রথমে যা দেবেন তাই দুজনে ভাগ করে খাব।

ছেলেটি অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে বল্‌লে, সরি স্যার, বাড়তি থালা দেওয়ার নিয়ম নেই।

—কাঁসার থালা না হয়, একটা চিনেমাটির প্লেটই দিন। কথা দিচ্ছি, সেটা আমরা নিজেরাই ধুয়ে দিয়ে যাব ওয়াশ-বেসিনে।

ছেলেটি এবার নির্বাক। দুই হাত জড়ো করে দাঁড়িয়ে রইল।

—তাও নামঞ্জুর? সেক্ষেত্রে আপনাদের ম্যানেজারকে অনুগ্রহ করে এই টেবিলে পাঠিয়ে দিন। আমি তাঁকে কয়েকটি কথা বলতে চাই।

আশপাশের টেবিলে অনেকে কৌতূহলী দৃষ্টিপাত করছে। সম্ভবত যতটা নিচু গলায় জর্জদা ক্যাসেটে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছেন তার চেয়ে উচ্চস্বরে আমি শেষ অনুরোধটা পেশ করেছি। এবার ছেলেটি বললে, ম্যানেজার একটা হিসাব নিয়ে ব্যস্ত আছেন। আপনি যা বলতে চান তা আমাকেই বলুন না?

গৌর বাধা দিয়ে বলে, যথেষ্ট হয়েছে। চল 'পীটার ক্যাট'-এ যাই।

আমি বলি, তাই চল।

উঠে দাঁড়িয়ে নাম-ঠিকানা লেখা একটি কার্ড ছেলেটির হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলি, আপনাদের ম্যানেজারকে বলবেন, তাঁর হিসেব দেখা শেষ হলে আমাকে যেন একটা টেলিফোন করেন। তাঁর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

দুজনে গুটি গুটি এগিয়ে যাই নির্গমন দ্বারের দিকে। লিফটের সামনে অপেক্ষা করছি এমন সময়ে সেই ছেলেটি দৌড়ে ফিরে এল। সঙ্গে ম্যানেজার। তিনি আত্মঘোষণা করে বললেন, কী আশ্চর্য! আপনি না খেয়ে চলে যাচ্ছেন, স্যার! তা হবে না। আসুন। আপনাকে আমি চিনি। অনেক বই পড়েছি।

প্রশ্ন করি, আপনি কি আপনাদের হৌসের নিয়ম লঙ্ঘন করে আমাদের দুজনকে ভাগাভাগি করে অন্নগ্রহণ করতে দেবেন?

—সে প্রশ্ন ওঠে না, স্যার! আপনারা দুজন আমার অতিথি! আসুন।

আমি বলি, সে প্রশ্নও ওঠে না! সিঁড়ির মুখে এমন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে আমি অপারক। আমার প্রশ্নের সরাসরি জবাবটা দিন।

—আসুন স্যার? না হয় আপনি একটা প্লেটেরই দাম দেবেন!

আমি বলি, দেখতেই পাচ্ছেন, আমরা দুজন বৃদ্ধ। এক এক প্লেট 'ভোজ' খাওয়া আমাদের সাধ্যে কুলাবে না। তাহলে আমরা যা খেতে পারব না, তা আপনি কী করবেন? নিশ্চয় ডাস্টবিনে ফেলে দেবেন, তাই নয়?

বাহুল্যবোধে ম্যানেজার জবাব দিতে পারলেন না। তখন তাঁকে প্রশ্ন

করেছিলাম, আপনার জন্ম নিশ্চয় উনিশ তেতাল্লিশের পরে। তাই নয়?

বিহ্বল হয়ে ম্যানেজার জানতে চান, হঠাৎ এ কথা কেন, স্যার?

—তেতাল্লিশের মন্বন্তরের সময় আমি কলেজের ছাত্র। আমাকে মার্জনা করবেন! আমি এখানে খাব না!

সেই খানদানি 'ভোজ' আমি খাইনি। ফলে, আপনাদের সে বিষয়ে কিছু জানাতে পারছি না। আমার মনে হয়—আমার ওই 'অভ্যাসটা'—চেটেপুটে খাওয়ার বদ-অভ্যাসটা—সেই তেতাল্লিশ সাল থেকে আমার অবচেতনে স্থায়ী আসন গেড়েছে। সে বছর দেখেছিলাম—আগের বছর যারা ছিল ধোপা-নাপিত-জেলে, মজুর চাষী, মায় বর্ধিষ্ণু ভাগচাষী, তারা গ্রাম ছেড়ে দলে দলে কৃষ্ণনগর শহরে চলে আসছে। তারা গৃহস্থ-বাড়িতে গিয়ে পয়সা চাইত না—মুদ্রা তার ক্রয়ক্ষমতা হারিয়েছে। ভাত চাইত না, জানত সব বাড়িতেই মা লক্ষ্মী 'বাড়ন্ত'। 'অন্নপূর্ণা যার ঘরে সেও আজি ভিক্ষা করে'র সেই জমানায় দেখেছি, নিরন্ন মানুষ বাড়িবাড়ি গিয়ে শুধু বলত ঃ মা-রে; টুক্ ফ্যান দিবা?

দুটি বদ-অভ্যাসের কথা বলব বলেছিলাম, না?

দ্বিতীয়টা হচ্ছে অন্নপাত্র সামনে দেখলেই আমি ভোজন শুরু করি। এটা নিশ্চয় মানতে হবে : বদ-অভ্যাস। কী জানেন? বাড়া ভাতের সামনে আমি হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না। সেটা তো সময়ের অপব্যবহার। তাই নয়? একই কারণে আমি বেশিক্ষণ আড্ডা দিতে পারি না। কাজের কথা শেষ হলেই দূরভাষণের লাইন কেটে দিই। আমার বারে বারে মনে পড়ে যায় তারাশঙ্করের **কবির** সেই ছোট্ট গানের কলিটা : 'জীবন এতো ছোটো কেনে?'

এই বদ-অভ্যাসের জন্যও নানানভাবে ভুগতে হয়েছে। ধমক খেয়েছি—মায়ের কাছে, মেজদির কাছে, মায় গৃহিণীর কাছে। পংক্তি ভোজনে বসেই চট করে পাতে হাত দিয়ে বসি। আর পাঁচজন ততক্ষণে গুছিয়ে বসেছে

কিনা নজর না করেই। তার চরম শিক্ষা হল ধেড়ে বয়সে। তখন আমি নতুন জামাই।

পঞ্চাশ সালের তেশরা জ্যৈষ্ঠ তাকে ঘরে এনেছি। আর সেটা আশ্বিনমাস। নগেন লাহিড়ী মশায়ের বাড়িতে মহাষ্টমী পূজায় প্রসাদ পাওয়ার আমন্ত্রণ। নগেন লাহিড়ীর স্ত্রী—আলোদি—আমার স্ত্রীর দিদি। পূজা মিটতে মিটতে বেলা আড়াইটে বাজল। কব্জি ডুবিয়ে মহাপ্রসাদ সেবা করতে হবে বলে প্রাতরাশটা হালকা করেছি। বেলা আড়াইটা নাগাদ ডাক পড়ল। ততক্ষণে পেট চুঁইচুঁই করছে।

বেশ বড় একখানা ঘর। মার্বেলের মেঝেতে পনের-বিশটি কুশাসন পাতা। শুধু ঘরের এক প্রান্তে দুটিমাত্র পশমের ফুলকাটা আসন। সে দুটি আসনের সামনে প্রকাণ্ড কাঁসার থালায় অন্নব্যঞ্জন। থালাকে চক্রাকারে বেষ্টন করে সাত-আটটি বাটিতে নানান তরকারি। মৎস্য এবং মহাপ্রসাদ। পাশে একটি পাথরের রেকাবিতে তিনচার রকমের মিষ্টান্ন এবং পরমান্নের বাটি। আর সকলের কুশাসনের সামনে কদলীপত্র, মাটির খুরিতে জল। এ ঘরে বসেছেন নিকট আত্মীয়েরা—সকলেই ব্রাহ্মণ। সামনে পশমের আসন দুটি দুই বিশিষ্ট অতিথির। একজন—যাকে ইংরেজিতে বলে 'গেস্ট-অব-অনার'—নাটোরের মহারাজা ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুরের। তাঁর বাঁপাশে কুশাসনে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সুরজিত সিংহ—তখন শান্তিনিকেতন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। আর ডানপাশের পশমের আসনটি নতুন জামাইয়ের জন্য নির্দিষ্ট!

মহারাজ আসন গ্রহণ করলেন। তাঁর পাশের ফুলকাটা আসনে আমাকে সলজ্জে কোঁচা-সামলে বসতে হল। আমাদের দুজনের পাতে অন্নব্যঞ্জন ইতিপূর্বেই সুসজ্জিত। অন্যান্যদের জন্য অন্ন পরিবেশন শুরু হয়ে গেল। ভাতের পর ডাল আসছে। এমন এক ব্রাহ্মমুহূর্তে নতুন জামাই এক 'কেলো' করে বসল!

আমার পেটে তখন ক্রমাগত ইঁদুরে ডন দিচ্ছে। পাতায় তিন-চার রকমের ভাজা। তার পাশে শাক, বাটিতে সুক্তো। কিন্তু আমার নজর

পড়ল একটি অপ্রত্যাশিত পদের দিকে : ঘি এবং কাসুন্দি দিয়ে মাখা খানিকটা বেগুন পোড়া; আমার অত্যন্ত প্রিয় পদ। আমি আর ডাইনে-বাঁয়ে তাকাইনি। খপ করে বেগুন পোড়ার এক খাবলা তুলে মুখে পুরে দিয়েছি। আর ঠিক পরমুহূর্তেই পাশ থেকে ভেসে এল জলদগম্ভীর স্বরে একটি শব্দ : বাবাজীবন!

চর্বণকার্য বন্ধ হল। চোখ দুটি গেল খুলে। দেখি মহারাজ আমার দিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন।

—তুমি পঞ্চদেবতাকে অন্ন নিবেদন কর না?

আবার মুণ্ডুটা ঘুরে গেল। না, মানে আক্ষরিক অর্থে। সিনেমার ভাষায় যাকে 'প্যান' করা বলে সেই ভাবে আমার দৃষ্টি ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে পাক মারল। দেখি সকলেই পঞ্চদেবতাকে অন্নদানে ব্যস্ত : 'ওঁ নাগায় নমঃ, কূর্মায় নমঃ...' কেউ-রা পঞ্চদেবতাকে অন্নদান সমাপ্ত করে কলাপাতায় জলগণ্ডুষ ছিটাচ্ছেন 'অমৃতমাস্তরসি স্বাহাঃ'! মহারাজ তখনও অন্নস্পর্শ করেননি। এদিকে বেগুন-পোড়া ততক্ষণে আমার কণ্ঠনালীর টানেল অতিক্রম করেছে। চট করে আমার দৃষ্টি চলে গেল ওপাশের দরজার দিকে। কপাটের কিনারে দেখলাম লাল বেনারসী পরা এক সদ্যোবিবাহিতা। আমি নেই!

ঘরের বিশ-ত্রিশ জোড়া চোখ আমার দিকে নিবদ্ধ!

পূর্বপুরুষদের আশীর্বাদ—এ বিষয়ে সন্দেহের কিছু নেই। চট করে বুদ্ধি খুলে গেল। নতুনজামাইসুলভ সলজ্জ ভাষণে বলি, আপনি প্রশ্নটা করায় আমার আর সঙ্কোচ রইল না। এ প্রশ্নটা আমার মনে দীর্ঘদিন ধরে জমে আছে। দেখুন, আমরা এখন মধ্যাহ্ন আহার করছি না। প্রসাদ গ্রহণ করছি মাত্র। এই অন্নব্যঞ্জন ইতিপূর্বেই জগন্মাতাকে নিবেদন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পূর্ব-নিবেদিত অন্নের ভাগ কি পঞ্চদেবতাকে পুনর্নিবেদন করা বিধেয়? শাস্ত্রের কী নির্দেশ?

মহারাজ হাসলেন। মহাজ্ঞানীই শুধু নন, তিনি সংসারাভিজ্ঞ! প্রখর বুদ্ধিমান। নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন, কী কৌশলে আমি একঘর লোকের

সামনে আত্মসম্মান বজায় রাখতে এই প্রতিপ্রশ্ন তুলেছি। বললেন, তুমি শুধু জিজ্ঞাসু নও বাবাজী। তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান! না, প্রসাদ গ্রহণ কালে পঞ্চদেবতাকে অন্নপ্রদান বাধ্যতামূলক নয়।

মহারাজ পঞ্চদেবতাকে না দিয়েই ঈশ্বরকে স্মরণ করে অন্নগ্রহণ শুরু করলেন।

ঘাম দিয়ে আমার জ্বর ছাড়ল।

কিন্তু প্রশ্নের কি শেষ আছে? সে-রাত্রে মশারিফেলা জনান্তিকে আবার আমাকে একটি কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হল : আচ্ছা, সত্যি করে বল তো? ওই প্রশ্নটা তোমাকে এতদিন ধরে খোঁচাচ্ছিল?

—কোন্ প্রশ্নটা?

—ওই যে, প্রসাদকণিকা পঞ্চদেবতাকে নিবেদন করা যায় কিনা?

আমি সহধর্মিণীকে একটা দার্শনিক তত্ত্ব বোঝাবার উদ্যোগ করি—'ফ্যাক্ট' আর 'ট্রুথ'-এর পার্থক্য বিষয়ে। 'তথ্য' আর 'সত্য'-এর মধ্যে কী প্রভেদ। আমাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে ও বললে, ওসব বাজে কথা। আসলে 'বেগুন-পোড়া' তোমার খুব প্রিয়। দেখেছি তো! আর তুমি লোকটা বাবু ভীষণ লোভী!

এটা 'তিরস্কার' না 'পুরস্কার'? দুটোর মধ্যে পার্থক্য কী? একঘর লোকের সামনে আমি যে তার মানরক্ষা করলাম সে জন্য তোমাদের দিদা কি আমাকে তিরস্কার করতে পারে? তোমরা বিশ্বেস করতে পার?

'বেগুন-পোড়ার' কথায় মনে পড়ে গেল পোড়া দেশের কথা। গোয়াড়িগঞ্জের এক কিস্‌সা। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সেবার এক অমাত্যের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রাখতে গেছেন। রাজবয়স্য গোপাল ভাঁড় উপস্থিত। কিন্তু সে জাতে 'নাপিত'। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসতে পারে না। মহারাজ অন্নপাত্রের দিকে দৃক্‌পাত করে বললেন, ও গোপাল, এঁরা যে বিরাট আয়োজন করেছেন দেখছি। তা, কোথা থেকে শুরু করব বলতো?

গোপালের চটজলদি জবাব : আজ্ঞে, মহারাজ, বেগুন পোড়া দিয়ে।

—বেগুন পোড়া! কেন? শুকতো, উচ্ছেভাজা, শাক কী দোষ করল?

—আজ্ঞে না, মহারাজ, ওদের দোষ কিছু নেই। তবে বেগুন-পোড়া দিয়ে শুরু করলে দেখবেন পোড়ামুখে বাকি সবই সুস্বাদু লাগবে। না, না, অমন করে আমার দিকে তাকাবেন না! আপনি বামুন মানুষ! দ্যাখ-না-দ্যাখ ভস্ম হয়ে যাব। তবে, কি-বলে-ভাল, দগ্ধানন রামভক্তদের দেখেছি তো—তাঁদের পোড়ামুখে খোসাসমেত কদলী, ভূতি-সমেত পণস দিব্যি রুচিকর লাগে। তাই বলছিলাম আর কি। বজরঙবলী মহাবীরদের পদাঙ্কই অনুসরণ করুন। ওই কি-বলে-ভাল, বেগুন-পোড়া দিয়েই।

মহারাজ সেদিন কী দিয়ে শুরু করেছিলেন সে-কথা অবশ্য জানি না।

পঞ্চাশ বছর ধরে তাঁর রান্না করা নানান পদ পরমানন্দে আস্বাদন করে এসেছি। বিশেষ করে ইলিশ মাছের ভাপা, রুইয়ের দই-মাছ, আর চিংড়ির মালাইকারি। ইদানীং এক বেগুনপোড়া-খাওয়া ডাক্তারবাবুর নির্দেশে তাঁর রান্নাঘরে ঢোকা বারণ। আমারও শরীর বেজুতের। তবে বিগত ৩রা জ্যৈষ্ঠ, মানে সতেরোই মে আমরা দুজনেই স্থির করেছিলাম বেশ জমিয়ে বিবাহের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবটা পালন করব। না—নেমন্তন্ন-টেমন্তন্নর ঝামেলায় যাব না। দুজনে নিরালায়। কিন্তু মাছের বাজার, আপনারা তো অস্থিতে-অস্থিতে জানেন—আগুন! তবে আমরা দুজন ছাড়বার পাত্র নই। আমার ক্যানভাস আছে। ম্যাগনিফাইং গ্লাস আছে, গিন্নির আছে সাবেক-আমলের বিরাট বঁটি। সারাটা সকাল ধরে ছিপে গেঁথে অনেক খেলিয়ে-খেলিয়ে তুলির মুখে তুলে আনলাম এক আড়াই কে. জি. ওজনের বিরাট মৎস্য। গিন্নি তাই দিয়ে কী কী পদ বানিয়েছিলেন সেসব কথা আপনাদের বুঝিয়ে বলতে যাওয়া বৃথা।

সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। বাঙালির খাদ্য-বিহারের কথা বিস্তারিত লিখে কী লাভ? সে খাঁটি ঘি-তেল-দুধ-ছানা অথবা আমার

সেই ছিপে-খেলিয়ে তোলা দু-আড়াই কে. জি. মাছ সবই কর্পূর। আর থাকলেই বা কী লাভ হত? সেই পরিপাক-শক্তিও যে নেই আপনাদের। থাকার মধ্যে আছে ডায়াবেটিস, হাই-প্রেশার, কোলেস্টেরল, ধুকপুকে বুক আর পেট-জোড়া পিলে।

কী ফায়দা গুরুবাক্য শুনিয়ে : "সেরা রস রসনায়!"

বাঙালির সারস্বত সাধনা : সানফ্রান্সিস্কোতে!

আমার সঙ্গে সর্বাণীর আলাপ গত শতাব্দীর চুরাশি সালে। সানফ্রান্সিস্কোর শহরতলি ওয়ালনাট ক্রীকে। আমার বড় কন্যা অনিন্দিতা বসুর বাড়িতে। সেখানে আমার নাতনি ছয় বছরের অন্তরাদেবীর অভিভাবকত্বে আমেরিকায় বেড়াতে গেছি। সর্বাণী আমাকে আমন্ত্রণ করতে এসেছিলেন—বার্কলেতে গিয়ে তাঁর বাংলা স্কুলে আমাকে একটি বক্তৃতা দিতে হবে। শুনে আমি তো থ। সানফ্রান্সিস্কোয় 'বাংলা স্কুল'! জিজ্ঞেস করি, কোথায় তোমার "বাংলা স্কুল?"

—বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ে, মেশোমশাই।

শুনে আমার তো হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাবার দাখিল! বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম নিশ্চয় শুনেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে জার্মানিতে যেমন ছিল 'গ্যোটেনজেন', যুদ্ধোত্তর মার্কিন মুলুকের পশ্চিমপ্রান্তে তেমনি বার্কলে। সে এক বিশ্ববিশ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়। অ্যাটম বোমার অন্যতম আবিষ্কারক লরেন্স-সাহেবের ল্যাবরেটরিটা ছিল এখানে। এই বার্কলে পাহাড়েই তিনি আবিষ্কার করেছিলেন ; 'ক্যালুট্রন'! নাম শোনেননি তো? আম্মো শুনিনি। 'বিশ্বাসঘাতক' নামে একটি কেতাব লিখতে গিয়ে দৈবাৎ শুনেছি। সেটা নাকি ছিল অ্যাটম বোমার ষোলোকলার ষোড়শ কদলী!

গত তিন-চার দশক ধরে এখানে অধ্যাপকমশাইদের মধ্যে 'নোবেল লরিয়েটের' সংখ্যা : গড়ে চার। কখনো কমে তিন, কখনো বেড়ে পাঁচ! সেই বার্কলেতে গিয়ে বক্তিমে দিতে হবে শুনলে কার না প্লীহা-কম্পন হয়, বলুন?

সর্বাণী আমাকে অভয় দিয়ে বললেন, অডিটোরিয়ামে কোন নোবেল লরিয়েট থাকবেন না। যাঁরা থাকবেন তাঁদের বয়স : গড়ে দশ। কমে পাঁচ, বেড়ে পনেরো। কী ব্যাপার? শোনা গেল, সবাই সানফ্রান্সিস্কো বে-এরিয়ার 'প্রবাসী বাংলা স্কুলের' ছাত্রছাত্রী।

সে সময়ে স্কুলের বয়স ছিল দশ। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা উনিশ। স্কুলে দুটি বিভাগ। জুনিয়ার বিভাগে বিদ্যার্থীদের বয়স পাঁচ থেকে নয়। তাদের বাংলা অক্ষর পরিচয় হয়েছে। 'পুঙ্খানুপুঙ্খ' অথবা 'প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব' শব্দের বানান জিজ্ঞেস করলে অবশ্য 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' হয়ে পড়বে। সিনিয়ার বিভাগে ছাত্রছাত্রীর বয়স দশ থেকে পনেরো। সে ক্লাসের মনিটার সর্বাণীর কন্যা শর্মিলা ঘোষাল। বাংলায় তার বেশ ভাল দখল।

আদিযুগে ক্লাস নেওয়া হতো বিভিন্ন গার্জেনের ভদ্রাসনে। পর্যায়ক্রমে। তাতে মূলাগায়েন সর্বাণীদি নারাজ হলেন। কারণ যাঁর বাড়িতে সপ্তাহান্তে ক্লাসটা বসছে তিনি মা সরস্বতীর চেয়ে খানা-পিনার ব্যাপারটাতেই বেশি গুরুত্ব দিতে থাকেন। এটা সর্বাণীর মনপসন্দ্ নয়। দ্বিতীয় যুগে তাই ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা হল সেন্ট আলবান্স চার্চে। রোব্বার দুপুরে। 'মাস্'-এর পরে। কিন্তু তাতেও জুৎ হল না। বিদেশের চার্চ-এ সাবাথ ডে-তে সবাই হর-হপ্তা 'ভারত আবার জগতসভার শ্রেষ্ঠ আসন লবে', বলে চেল্লাচেল্লি করাটা সৌজন্যে বাধে।

সর্বাণী কিন্তু নাছোড়বান্দা। প্রবাসী বাঙালি ছেলেমেয়েদের তিনি বাংলা ভাষাটা না শিখিয়ে ছাড়বেন না, তাই ধরে পড়লেন ওই বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বড়কর্তাকে।

ব্যবস্থা হল। বড়কর্তা সর্বাণীকে বললেন, 'ও. খ্যে! রোব্বারে ঘরগুলো তো ভেকেন্ট পড়েই থাকে। তোমরা কাপ্‌ল অব রুমস্ ইউজ

করতে পার। শেখাও, তোমাদের কিড্‌স্‌দের শেখাও পোয়েট টেগোরের ওই ল্যাঙ্গোয়েজ'।

তারপর থেকে ওখানেই হর-হপ্তা রোব্বারের দুপুরে দুটি ঘরে বসে 'প্রবাসী বাংলা স্কুল'। বেলা দেড়টা থেকে তিনটে। বিশ-পঞ্চাশ মাইল দূর থেকে বাঙালি বাবা-মায়েরা পেট্রল—থুড়ি—গ্যাস পুড়িয়ে—বাচ্চাদের নিয়ে হাজিরা দেয়। বাচ্চারা ঘরে ক্লাস করে, বাবা-মা করে গাছতলায় গুলতানি। সবাই নয়, পালা করে একজনকে ('মোস্টলি মম্‌ম্‌! 'কজ ড্যাডস্‌ ইউজুয়ালি হ্যাভ টু ভ্যাকুয়াম দ্য হাউস—য়ু নো!' আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল একটি লালচুলো ছাত্রী, জ্যাকেলিন। তার মা 'ম্যারিকান।) বছরে একমাস ক্লাস নিতে হয়। বাবা-মার মধ্যে যে বাঙালি তাকে। দুজনেই বাঙালি, হলে যার হিম্মতে কুলায়। এটাই 'স্কুল ফি'। আর সব খরচ সর্বাণীর। কারণ স্বগৃহে আহারান্তে সর্বাণী বন্যমহিষ বিতরণ ব্রতয় দীক্ষিত। সিনিয়ার ক্লাসটি তিনি নিজে নেন। বছরে বাহান্ন বার। হর-হপ্তা।

প্রবাসী বাঙালির সন্তানেরা—মা-বাবা দুজনে বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও উঁচু ক্লাসে উঠে সেকেন্ড ল্যাঙ্গোয়েজ হিসাবে ওরা বেছে নেয়—ফ্রেঞ্চ, জার্মান অথবা স্প্যানিশ। ভবিষ্যৎ উপার্জনের আশায়। বাংলা ভাষা ওরা শোনেই বা কতটুকু? মাতৃভাষা তো মায়ের জাত-নির্ভর নয়, জিহ্বা-নির্ভর। জ্ঞান হবার পর বাঙালি বাপ-মায়ের সন্তানেরা শোনে ড্যাডি মমকে ডাকছে : 'হানি', মম সাড়া দিচ্ছে : হাঈ! ক্রিব অথবা বেবিকটে শুয়ে শুয়ে দুধের বাছারা শোনে পাশের ঘরে ড্যাড-মম ধুন্ধুমার দাম্পত্যকলহ চালিয়ে যাচ্ছে—'ইঞ্জিরিতে', মার্কিনী 'উরুশ্চারণে'! বাংলা হয়তো কেউ-কেউ এট্টু-আধটু কইতে পারে, কিন্তু জুৎ পায় না। এ সমস্যা সর্বত্র। লন্ডন, প্যারি, নিউইয়র্ক, লস্‌-এঞ্জেলেস্‌—সর্বত্রই প্রবাসী বাঙালি বাচ্চাদের এই হাল। মায়, ভারতেও—মুম্বাই, চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর, নাগপুর, বিলাসপুরেও!

সর্বত্রই দেখেছি, একমুঠো হীরের টুকরো বাঙালি ছেলেমেয়েকে।

পশ্চিম বাংলায় তারা সুযোগ পায়নি। পাত্তা পায়নি। দু'তিন দশক আগে তারা ছিল প্রেসিডেন্সি, লেডি ব্রেবোর্ন, শিবপুর, যাদবপুরে। সেখানে ফার্স্ট সেকেন্ড হতো। তারপর কল্লোলিনী কলকাতাকে বিদায় জানিয়ে বিভূমে এসেছে। এখন বাবা হয়েছে, মা হয়েছে।

ওই হারিয়ে যাওয়া হীরের টুকরোগুলোকে ফিরিয়ে এনে গলায় শতনরীর মালা পরবে এমন সৌভাগ্য নেই জন্মভূমি-মায়ের। অক্ষমতা শুধু আর্থিক উপার্জনের জন্য নয়, মর্মান্তিকভাবে মানসিকতারও! মা-ছাঁ দু-তরফেই! অনেক সাগরপারের বাসিন্দার নাগরিকতাও ঘুচেছে! হয় খোয়া গেছে, অথবা 'খোরানা' হয়ে গেছে! কিংবা দেওয়ানা!

অনেকে নামমাত্র ভারতীয়, অর্থাৎ বাঙালি। তবু ওরা কায়মনবাক্যে প্রার্থনা করে মা সরস্বতীর কাছে—ওদের খোকাখুকুর নাকের ডগায় যেন সেই অবাক দরওয়াজা বন্ধ না হয়ে যায়। যে দরজার 'চিচিং-ফাঁকে' উঁকি দিলে অনাবাসী বাঙালি বাপ-মায়েরা আজও দেখতে পায় : থরে থরে হীরে-মুক্তো-মানিক! মাটির পিদিম, তুলসীর মঞ্চ, ধানসিঁড়ি ক্ষেত, ঘুঘুর ডাক, শিশিরভেজা ঝরা-শিউলি অথবা ঝড়ে-ঝরা ফোটা কদম! যার জন্যে পাঁজরের খাঁজে-খাঁজে আজও বাজে নস্ট্যালজিক বেহাগের মূর্ছনা। সেই গানের ওপারেই যে দাঁড়িয়ে আছেন : বীরভূমি বাউল, বিদ্রোহী ভৃগু, অপু-দুর্গার পুরুৎ বাপ, অথবা হাজার বছর ধরে পথচলা কোন ক্লান্ত পথিক।

এ বেদনা বাচ্চাদের নয়। তাদের ড্যাড-মমের। তাজা ড্যাফোডিলের মতো ফুটফুটে একটা বাচ্চা ছেলের সঙ্গে বাংলা স্কুলে আলাপ হল। বছর ছয়েক বয়েস হবে—তার বাবা বাঙালি, মা মার্কিনী। নীল চোখ, সোনালি চুল। শুধোলাম, তুমি কেন বাংলা শিখতে আস বব্?

সে আমাকে ফিস্ ফিস্ করে বললে, 'কজ মাই গ্যর্ল ফ্রেন্ড ডাজন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইংলিশ অ্যাট অল! বাট শী ল্যভস্ মী হেড-ওভার হিলস্!

আমি তো তাজ্জব। বলি, কোন্ মেয়েটা?

—সে কি এখানে থাকে? সে তো আছে বার্ভওয়ানে, নিয়ার

ক্যালকাটা। শি ইজ মাই গ্র্যান্ড-মম!

সেই 'গ্যর্ল ফ্রেন্ড'কে বাংলায় চিঠি লিখবার বাসনা নিয়ে ও বাংলা শিখছে!

সর্বাণীর মতে : বাংলা-মায়ের আঁচলের খুঁট খুলে ওই যে একমুঠো শিউলি ফুল স্রোতে ভাসতে ভাসতে চলে এসেছে অতলান্তিক বা প্রশান্তের ওপারে—তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য একান্ত প্রয়োজন দুটি জিনিসের : ডানা আর শিকড়!

ওরা রামধনুর মতো আকাশে ফুটে উঠতে চায়। তাই চাই একজোড়া ডানা। ওরা কালবৈশাখীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাঁশঝাড়ের মতো লুটোপুটি খাবে, তবু ভেঙে পড়বে না—তাই চাই শিকড়টাও! যে ঘাটে গিয়ে ঠেকেছে সেখানে ওরা সহজেই জোগাড় করবে একজোড়া ডানা : Wings! পক্ষিরাজের বদলে স্পেস্-শাট্‌ল্, উপেন্দ্র-দক্ষিণারঞ্জন-সুকুমার রায়ের পরিবর্তে হান্স অ্যান্ডারসন, গ্রীম্‌স ভাইদের, লুইস ক্যারলকে। কঙ্কাবতীর বদলে অ্যালিস্, কুঁচবরণ রাজকন্যার পরিপূরক স্নো-হোয়াইট!

কিন্তু : Roots? শিকড়?

রামায়ণ-মহাভারত-ধ্রুব-নালক-একলব্য-মৈত্রেয়ী-সত্যকাম?

তাঁদের ক্যালিফোর্নিয়ান সুপার-মার্কেটে পাওয়া যায় না।

ওরা 'অজগর' দেখেনি, 'আম' পায় না; 'এক্কাগাড়ি' পুষ্পকরথের চেয়েও দুর্লভ', ঋষিমশাই' ইয়েতির চেয়েও। তাই সর্বাণী পড়ান : বল জ্যাকেলিন, 'অ-য় অক্টোপাস আসছে তেড়ে/আ-য় আপেলটি খাব পেড়ে।'

জ্যাকেলিন প্রতিবাদ করে, বাট সর্বাণী-আন্টি, Apple ইজ নট 'আপেল', ইট্‌স্ 'অ্যাপ্ল্'। রাইট?

হায় ঈশ্বর! না, মানে আমি বিদ্যার সাগরকে বলছি—ওই ক্যালিফোর্নিয়ান চুন্নুমুন্নুগুলোর জন্যে তুমি এযুগে আবার সম্ভবামি হচ্ছ না কেন? নতুন করে বর্ণপরিচয় লিখতে?

বঙ্গ-সরস্বতীর সেই একনিষ্ঠ-সাধিকা সর্বাণী ঘোষাল বেমক্কা আক্রান্ত হলেন ক্যানসারে। সানফ্রান্সিসকো বে-এরিয়ায় যাবতীয় বাঙালির ঘরে ঘরে নেমে এল শোকের ছায়া। কয়েকশ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে বাঙালি দম্পতি মা-কালীর কাছে প্রার্থনা জানালো : সর্বাণীদিকে ফিরিয়ে দাও! ওদের ফুটফুটে বাচ্চার দল কাতর প্রার্থনা জানালো—মা মেরীকে, কেয়ার-বেয়ারকে, কিংবা ফলিং স্টারকে : সর্বাণী-আন্টিকে ফিরিয়ে দাও!

কেউ সে প্রার্থনায় কর্ণপাত করেনি। না কেয়ার-বেয়ার, না উইশ-ফেয়ারি, না ফলিং-স্টার এবং হ্যাঁ, না মা কালী।

সর্বাণী চলে গেলেন। তাঁর প্রয়াণ-সংবাদ শহর-কলকাতার কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি। কলকাতায় কোন স্মরণসভার আয়োজন

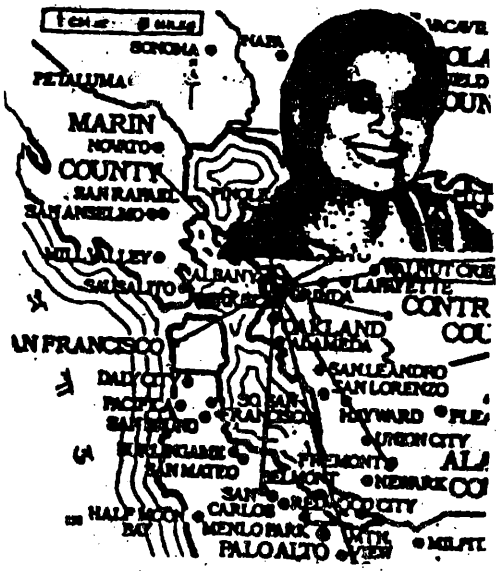

হয়নি। সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু সানফ্রান্সিস্কো বে-এরিয়ার বাঙালিরা একটি স্মরণসভার আয়োজন করেছিলেন। আমি উদ্যোক্তাদের লিখে পাঠিয়েছিলাম : 'সর্বাণীর মহাপ্রয়াণকে তোমরা রুখতে পারনি—তা ছিল তোমাদের ক্ষমতার বাইরে। কিন্তু প্রবাসী বাংলা স্কুলকে তোমরা মরতে

দিও না। একমাত্র সেই প্রতিজ্ঞাপূরণের মাধ্যমেই হতে পারে বাণীদেবীর সেই একনিষ্ঠ সেবিকার উপযুক্ত তর্পণ!'

লিখেছিলাম বটে, তবে এ-কথাও জানতাম : আমার সে প্রার্থনায় কেউ কর্ণপাত করবে না—না কেয়ার-বেয়ার, না উইশ-ফেয়ারি, না ফলিং স্টার অথবা সানফ্রান্সিস্কো বে-এরিয়ার প্রবাসী বাঙালি। কারণ—এ হয় না। এমন উদ্যোগ আবশ্যিকভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। 'মা' চোখ বুজলো, তো 'ছাঁ' অনাথ! দেবীহীন পরিত্যক্ত মন্দিরের মতো! বাদুড়, চামচিকে আর ঝুরি-নামা বট-অশ্বত্থের চারা ছাড়া কেউ তার দিকে ফিরেও চায় না।

আঠারো বছর পর। নতুন সহস্রাব্দীতে আবার মেয়ের টানে—বুঝতেই পারছেন, আসলে নাতনিদের টানে—আবার সানফ্রান্সিস্কো গেছিলাম। এবার সস্ত্রীক। আবার একটি মেয়ে,— সে-কালীন সর্বাণীরই বয়সী,—প্রণাম করে বলল, 'মেসোমশাই, আমাদের স্কুলে আপনাকে একবার আসতে হবে।'

আমি বলি, 'অনসূয়া, তোমাদের মার্কিন-স্কুলে কেউ তো আমাকে চিনবে না।'

ও বলে, 'মার্কিন-স্কুল কেন হবে, মেসোমশাই? এ তো সেই 'প্রবাসী বাংলা স্কুল!'

আমি স্তম্ভিত। বলি, 'সে স্কুল আজও টিকে আছে? প্রশান্ত মহাসাগরে প্রশান্তি লাভ করেনি?'

ও বলে, ষাট বালাই। মরবে কেন? আপনিই তো লিখেছিলেন এটাই হবে সর্বাণীমাসির প্রতি আমাদের শ্রেষ্ঠ তর্পণ!

আশ্চর্য! অপরিসীম আশ্চর্য! দশ বছরের সেই বালিকা আজ আঠাশ বছরের পূর্ণযৌবনা। তার রূপান্তর ঘটেছে। এখন শুধু চুনুমুনু নয়, ধেড়েরাও আসে ক্লাস করতে। কারণ আছে। শুনলাম সব কথা। অনেক মার্কিন যুবক ইতিমধ্যে বাঙালি শ্যামলা মেয়ের কালো হরিণ চোখের

পুষ্পবাণে বিদ্ধ হয়েছে। মজেছে। ঘর বেঁধেছে। যেমন উইলিয়ামস্ ধরা পড়েছে রীতার বীতংসে। তাদের বাড়িতেই এখন বসে হর-হপ্তা 'বাংলা স্কুল'। যেমন আমার সেই ছয় বছরের নাতনি, ফুটফুটে অন্তরা ঘর বেঁধেছে সহপাঠী ম্যাথু জাইখ্‌কে নিয়ে। আবার অনেক বাঙালী যুবককে লালটুকটুক মার্কিনী ব্লন্ডের চোখে মনে হয়েছে : 'প্রিন্স চার্মিং'। তারা বাংলা শিখতে চায়। সারস্বত সাধনায় প্রতি রবিবার সমবেত হয় রীতা উইলিয়ামস্-এর ডেরায়। 'বিদ্যাস্থানে' তারা 'ভ্যয়ে বচ' করে সন্দেহ নেই, তবে সারস্বত-বন্দনাও গায় সমবেত-কণ্ঠে : 'সরস্বতৈ নম-উইকেন্ডং!'

ক্যালিফোর্নিয়ার সারস্বত-সাধনার আদিসূরি সন্দেহাতীতভাবে পরম শ্রদ্ধেয় ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়, (১৮৯০-১৯৩৬)। সে দেশের স্ট্যান্ডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এই মহাপণ্ডিত। সে দেশে বসেই লিখে যান একের পর এক ইংরেজি বই : *রজনী, লায়লা-মজনু* (১৯১৬), *গ্রে-নেক* (চিত্রগ্রীব), *যূথপতি*। গ্রে-নেক একটি কবুতর। সম্ভবত সেটিই বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম না-মানুষী নায়ক। যূথপতি—একটি হাতি; সে দলে সেকেন্ড। তাঁর প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মার্কিন পণ্ডিত মিস্ ম্যাকলাউড বলেছিলেন, 'After Vivekananda Dhan has successfully interpreted India in America.'। মিস্ ক্যাথলিন মেয়োর লেখা *Mother India*—যাতে মেয়ো বরাহশাবকের মতো কর্দমকুণ্ডে অবগাহন স্নানে তৃপ্ত হয়েছিলেন—সেই বইয়ের প্রতিবাদে ধনগোপাল রচনা করেন : *A Son of Mother India Repiles!* পাশ্চাত্য জগতে সেটি সেকালে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছিল।

মাত্র চার মাস ছিলাম সানফ্রান্সিস্কো এলাকায়। এ বিষয়ে কোন গবেষণা করিনি। তবু লিখি-টিখি বলে বে-এরিয়ার নানান প্রবাসী বাঙালি পরিবারে আড্ডা দেবার সুযোগ হয়েছে। অধিকাংশের কাছেই আমি মেসোমশাই; কোন কোন এন.আর.আই.-এর কাছে বি. ই. কলেজ সূত্রে : নারান্দা। সেই সব সপ্তাহান্তিক নৈশভোজের আসরে যেটুকু জেনেছি তাই

জানাই। হয়তো অনেক উল্লেখযোগ্য নাম বাদ থেকে গেল :

ওই এলাকার বেশ কিছু বাঙালি অধিবাসী, দীর্ঘদিনের প্রবাসকাল সত্ত্বেও চমৎকার বাংলা লেখেন। অথবা ইংরেজিতেই বাংলার ঘরোয়া ছবি এঁকেছেন। অধ্যাপিকা মনীষা রায় নৃতত্ত্বের গবেষক। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ মণি নাগের ছাত্রী। তাঁর রচিত ***চার বাড়ি*** (মিত্র ও ঘোষ প্রকাশনা) একটি সার্থক উপন্যাস! নস্ট্যালজিয়ায় আগাগোড়া মোড়াই শুধু নয় একটি রসোত্তীর্ণ সাহিত্যকীর্তি। দুর্ভাগ্যবশত তার সমালোচনা বা বিজ্ঞাপন আমার নজরে পড়েনি। খাঁটি বাঙালিনী চিত্রা দিবাকরণীর ইংরেজি ছোট গল্পের সংকলন *Arranged Marriage* আমেরিকাতেই প্রকাশিত ও পুরস্কৃত। তার বাংলা অনুবাদ হয়েছে বলে শুনিনি। বছর চারেক হল ওই এলাকা থেকে উৎসব নামে একটি সুন্দর পত্রিকা প্রকাশ করেন সুকান্ত ঘোষ, সহকারী রূপক চক্রবর্তী। এর শারদ-সংখ্যা কলকাতার যেকোন পূজা সংখ্যার সঙ্গে সমান পাল্লা দিতে পারে। মুদ্রণে, পরিবেশনে, লেখার মানে। সম্প্রতি দেবসাহিত্য কুটির প্রকাশ করেছেন অনিন্দিতা বসুর ***'আমার বাস কোথা যে...।*** তেরোটি ছোট গল্পের সংকলন। প্রত্যেকটি কাহিনীতে মার্কিন প্রবাসীদের জীবনের প্রতিচ্ছবি। ভূমিকায় অধ্যাপিকা বসু লিখেছেন "উনিশ বছর আগে সানফ্রান্সিস্কো বে-এরিয়ায় আমরা কয়েকজন সদ্যপ্রবাসী বঙ্গসন্তান একটি সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলাম : ***শঙ্খ***। আদি যুগে তা ছিল হাতে-লেখা। তাতে থাকত আমাদের পরবাসী জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, হাসি-অশ্রুর কথা, ছবি। প্রকাশের আকূতিতে কেউ আঁকড়ে ধরেছিলাম কলম, কেউ বা তুলি। কেউ সেই নস্ট্যালজিয়াকে ধরবার চেষ্টা করেছি লেখায়, কেউ বা রেখায়। আমাদের প্রকাশ মাধ্যমে ছিল অমিল। সাধ্যসীমায় বৈষম্য। কেবল মিল ছিল এক জায়গায় : আমাদের 'সাধ'-এ। অরূপরতনের আশায়।"

এই ***শঙ্খ*** পত্রিকাটির প্রতিটি সংখ্যা সম্পাদক আমাকে পাঠিয়েছেন। তাতে বেশকিছু শক্তিশালী কলমের আভাস পেয়েছিলাম। এবং তুলির। সবার নাম মনে নেই। ***কলিমুদ্দিন*** ছদ্মনামে একজনের লেখায় বলিষ্ঠতা

ও রসবোধ দুটোই লক্ষ্য করেছি। আর প্রতি সংখ্যাতেই থাকত বি.ই কলেজের এক স্থপতিবিদের আঁকা ছবি। উদয় সেনগুপ্ত। অত্যন্ত উঁচুদরের চিত্রশিল্পী। যদিও পেশায় তিনি ছিলেন আর্কিটেক্ট। টেম্পারা-পদ্ধতিতে আঁকা তার একটি বিশাল ত্রিপট-চিত্রের (triptych) দুর্গাপ্রতিমা আজও

সানফ্রান্সিস্কো আশ্রমে পূজা করা হয়। মাঝখানে মা-দুর্গা, একপাশের ভাঁজ-খাওয়া চিত্রপটে সরস্বতী-গণেশ ওপাশে লক্ষ্মী-কার্তিক। দুর্ভাগ্যবশত অল্প বয়সেই উদয় আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁর সেই দুর্গাপ্রতিমার ছবিখানি সুরক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন 'গোল্ডেন গেট'-এর 'দ্যে ইয়াং মিউজিয়াম'। উদয়ের আঁকা মা সরস্বতীর একটি চিত্র এখানে পরিবেশন করা গেল। *শঙ্খ* পত্রিকার সম্পাদক অমিতাভ বাসু আমেরিকায় বসেই একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন : Poet of the World। নিজ ব্যয়ে, নিজের প্রকাশনায়—রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশটি গান অমিতাভর ইংরেজি অনুবাদসহ। *শঙ্খ* এখন আর বে-এরিয়া থেকে প্রকাশিত হয় না। তা প্রকাশের বাণিজ্যিক অধিকার বর্তেছে কলকাতার এক নামি প্রকাশকের উপর।

সে শঙ্খে প্রশান্ত মহাসাগরের স্তনন আজ আর তাই শোনা যায় না। কলকাতাবাসী কবি-সাহিত্যিক—যাঁদের চৌহদ্দি টালা থেকে টালিগঞ্জ—তাঁদের হৃদয়োচ্ছ্বাসই শুধু শোনা যায়। বে-এরিয়ার প্রবাসী-বাঙালিদের বলতে শুনলাম না "তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে, কেমন করে সইব!"

সানফ্রান্সিসকো থেকে ফেরার সময় দুখানি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে এনেছি। নিজ দায়িত্বে কম্পোজ করতে দিয়েছি। প্রকাশক এখনো জোগাড় হয়নি। দুজনেই সানফ্রান্সিস্কো বে-এরিয়ার সারস্বত-সাধক।

প্রথমটির লেখক শ্রীরবীন্দ্রনাথ দে। গ্রন্থের কী নাম দেবেন জানি না। এটি তাঁর 'হেইপারের' জীবনস্মৃতি। আদ্যন্ত নস্ট্যালজিয়ায় মোড়া। পুব বাংলার ছিন্নমূল বাসিন্দার দল—যাঁরা এতদিনে এপার বাংলার মূলস্রোতে মিশে গেছেন; তাঁদের পঞ্জরে এর অনুরণন ধ্বনিত হবে বলে আশা রাখি। রবীনবাবু আমারই বয়সী প্রায়। তাঁর পুত্রটি ও-পাড়ার এক বিশিষ্ট বাঙালি ব্যবসায়ী : রঞ্জন। শুনলাম, স্বয়ং বিল ক্লিন্টন তাঁর ভদ্রাসনে একবার ডিনারে আপ্যায়িত হয়েছিলেন, সপার্ষদ।

দ্বিতীয়টির লেখক প্রয়াত অনিলকুমার ঘোষ। গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধাবলী। ভাষাতত্ত্ব ও ভারতীয় সংস্কৃতির উপর সুমননশীল আলোচনা। স্বর্গত লেখকের কৃতিপুত্র নির্মাল্য আমার হাতে পাণ্ডুলিপিটি তুলে দিয়ে বলেছিল : 'দেখুন মেসোমশাই, কিছু করা যায় কি না।'

কলকাতা থেকে একশ আশি ডিগ্রি দ্রাঘিমাংশের দূরত্বে প্রবাসী বাঙালির প্রচেষ্টায় ভারতী যে পূজা পাচ্ছেন এ খবরে আমি যে আনন্দ পেয়েছি তাই আপনাদের সঙ্গে এখানে ভাগ করে নিলাম :

অপূর্ব কোহপি ভাণ্ডারস্তব ভারতী দৃশ্যতে।
ব্যয়তো বৃদ্ধিমায়াতি ক্ষয়ং আয়াতি চ সঞ্চয়াৎ॥

[কী অপূর্ব তোমার ভাণ্ডার, হে মা ভারতী! এ ভাণ্ডার থেকে যতই দান করা যায় ততই দেখছি তা বৃদ্ধি পায়; কৃপণের মতো যতই সঞ্চয় করে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাই, ততই সে ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে।]

ভারতের একতা-রক্ষার্থে
॥ প্রথম বাঙালি শহিদ ॥

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ ভারতীয় শহিদ হয়েছেন। কিন্তু স্বাধীন ভারতে তার একতা রক্ষার জন্য—সব ধর্মের, সব বর্ণের ভারতবাসীর সমঅধিকারের দাবিতে— প্রথম শহিদ হয়েছিলেন মহাত্মাজী। কেন তাঁকে প্রাণ দিতে হল তা ভারতীয়দের জানতে দেওয়া হল না। তার তিন বছরের মধ্যেই খণ্ডিত ভারতের অখণ্ডতা রক্ষার্থে এগিয়ে এসেছিলেন এক বাঙালি; ভারত-কেশরি শ্যামাপ্রসাদ। তাঁর রহস্যজনক মৃত্যুর বিষয়েও তদন্তটা করা হল না।

সহস্রাব্দীর প্রবেশ-তোরণের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আজ এই জীবনসায়াহ্নে পিছন ফিরে তাই একবার দেখতে ইচ্ছে করছে—সদ্য-অতিক্রান্ত শতাব্দীর সেই মহামানবটিকে। বর্তমান প্রজন্মের পাঠক-পাঠিকা তাঁর সব কথা সঠিক জানে না, জানবেও না কোনওদিন। ইতিহাসে তা লেখা হবে না। ইতিহাস রচিত হয় ক্ষমতাশীল শাসকবৃন্দের অঙ্গুলীহেলনে। যে-কারণে বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিক অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে একাদশ খণ্ডে ভারতবর্ষের প্রামাণিক ইতিহাস রচনা শেষ করে প্রতিযোগিতার শেষ 'লেংথ'-এ হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। মৌলানা আজাদের আদেশে। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস তাঁকে রচনা করতে দেওয়া হল না।

'ফিরে দেখা' পর্যায়ে দুইজন ভারতীয় মহামানবের কথা সম্প্রতি রচনা করেছি। তাঁদের স্বচক্ষে দেখেছি, সহস্তে পদধূলি গ্রহণ করেছি—জেনেছি,

গদি-আসীনদের অঙ্গুলীহেলনে কীভাবে তাঁদের কীর্তি বিকৃত হয়ে গেছে।

ত্রিশে জানুয়ারি, উনিশশ' আটচল্লিশে, রাত নয়টার সময় আমি স্বকর্ণে শুনেছি—তখন আমার বয়স চব্বিশ—বেতারবাণীতে প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠস্বর। 'বহ্ তো এক পাগল থে। না-জান-বুঝ কর অচানক গোলি চালা দিয়া'...

সমগ্র ভারতবর্ষ না জানলেও বক্তা সেদিন জানতেন : নাথুরাম গডসে লোকটা পাগল ছিল না আদৌ! শুধু সেদিন কেন? তার দশদিন আগে থেকেই গান্ধীজির প্রার্থনাসভায় প্রথম বোমাবর্ষণ থেকেই দিল্লির গোয়েন্দা বিভাগ জানত 'গান্ধীহত্যা ষড়যন্ত্রের' কথা। জানত নাথুরাম-গোপাল গডসেরা, নারায়ণ আপ্তেরা পাগল ছিল না মোটেই! শুধু প্রধানমন্ত্রী নন, জানতেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেলও! আকাশবাণীতে জওহরলাল যখন কাঁদো-কাঁদো গলায় ভাষণ দিচ্ছেন তখন তিনি জানতেন, গুলি করার আগে নাথুরাম গান্ধীজির পদধূলি নিয়েছিল, জানতেন যে পালানোর কোনও চেষ্টাই সে করেনি; জানতেন যে, টোটা-ভরা রিভলভারটা সে স্বেচ্ছায় পুলিশকে হস্তান্তরিত করেছিল—আত্মহত্যার চেষ্টা করেনি। কেন? সে একটা জবানবন্দি দিতে চেয়েছিল।

হত্যাকাণ্ডের তিন-চার ঘন্টা পরে আকাশবাণীর প্রচারকক্ষে মাইকের সামনে বসে যিনি অমায়িকভাবে একগণ্ডা মিথ্যে কথা বলে গেলেন তিনিই ব্যবস্থা করেছিলেন—হত্যাকারীর জবানবন্দি বিশ বছরের জন্য ঠাণ্ডাঘরে লুক্কায়িত থাকবে। ভারতবাসীকে তা জানতে দেওয়া হবে না। নাথুরাম গডসের সমর্থনে একথা লিখছি না। গান্ধীহত্যা একটা নারকীয় অপরাধ। তবু লিখছি এই জন্য যে, আমাদের প্রশ্ন : জওহরলাল নেহরু কোন্ অধিকারে ভারতবাসীর কাছে সত্য গোপন করলেন? 'জান বুঝ কর' সজ্ঞান মিথ্যার বেসাতি করলেন? তিনি তো তখন ভারতবাসীর নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না। গান্ধীজি অস্বীকৃত হওয়ায় এবং সুভাষচন্দ্র অনুপস্থিত থাকায় ভারতবাসী তাঁকে অবস্থা-বিপাকে সাময়িকভাবে প্রধানমন্ত্রীরূপে মেনে নিয়েছিল মাত্র, তাহলে তিনি গান্ধীহত্যা নিবারণের ব্যর্থতা কেন গোপন করলেন? কোন্ অধিকারে?

জওহরলাল আর প্যাটেল সত্য গোপন করেছিলেন! কিন্তু কেন? কারণ ওই বৃদ্ধটাকে সদ্য-গদি পাওয়া মানুষগুলো আর সহ্য করতে পারছিল না। তাঁর কথাবার্তা, আচরণ সহ্যের সীমান্ত অতিক্রম করতে শুরু করেছিল। বুড়োটার ভীমরথী ধরেছিল! পাকিস্তানকে তাদের ন্যায্য পাওনা পঞ্চান্ন কোটি টাকা ফিরিয়ে দিতে বলেছিলেন। বিহারের দাঙ্গাকে বলেছিলেন স্থানীয় হিন্দু-কংগ্রেসিদের পরিকল্পনা মোতাবেক। সর্বোপরি কংগ্রেস সংগঠনকে ভেঙে দিয়ে গ্রামপঞ্চায়েতের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের নির্বাচন চেয়েছিলেন। নাথুরাম হত্যা করতে না পারলে নাঙ্গা ফকিরটাকে অনশনে আত্মহত্যা করেই মরতে হতো।

একই কথা : আর এক মহামানব প্রসঙ্গে।

বুক-পকেটে লাল গোলাপ গুঁজে পাইলটকারের সাইরেন বাজিয়ে একটা লোক সারা ভারত দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, অথচ মানুষজন ফিরেও তাকায় না। তারা প্রতীক্ষা করে আছে, কবে স্বরাজ্যে ফিরে আসবে তাদের দুয়োরানির সেই নির্বাসিত রাজপুত্র। সে যখন এলগিন রোডের ছাদ থেকে পক্ষিরাজের পিঠে সওয়ার হয়ে দ্যাখ-না দ্যাখ বার্লিনে পাড়ি দিতে পারে, আবার সেখান থেকে সমুদ্রের তলায়-তলায় যুদ্ধের বাজারে অর্ধেক পৃথিবী পাড়ি দিতে পারে, তখন সেই রাজপুত্তুর মৃত্যুঞ্জয়ী। সে ফিরে আসবেই—তার দুয়োরানিমার বুকে লুটিয়ে পড়ে আনন্দবেদনায় অঝোরধারে কাঁদতে!

আবার এক ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলতে হল। রেলমন্ত্রক সম্বন্ধে যার বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা নেই তেমন একজন সৈনিককে রেলমন্ত্রী বানাতে হল। লোকটা যে বলতে রাজি হল : 'তোদের নবকুমার কি আর আছে? তাহাকে শিয়ালে খাইয়াছে।'

আটচল্লিশ সালের ত্রিশে জানুয়ারি বেতারবাণীতে পণ্ডিত নেহরু সজ্ঞান মিথ্যাভাষণ করেছিলেন। তার আগে পঁয়তাল্লিশ সালের সাতাশে অগাস্ট নেতাজির বিমান দুর্ঘটনার কথা শুনে নেহরুজির প্রথম প্রতিক্রিয়া 'সুভাষবাবুর মৃত্যুসংবাদ আমাকে মর্মাহত করিয়াছে, কিন্তু আমাকে স্বস্তিও

দিয়াছে' (আনন্দবাজার, ২৭.৮.১৯৪৫)।

বিস্মিত সাংবাদিকদের পরবর্তী প্রশ্নবাণে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আন্তর-আবেগে স্বস্তিবোধের এমন বাহ্যিক প্রকাশ তাঁর পক্ষে নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক। তাই তিনি শুধরে নিয়ে বলেছিলেন, 'স্বস্তি এজন্য যে, সুভাষবাবুকে যুদ্ধবন্দি হিসাবে কোনও সামরিক ট্রাইবুনালের সম্মুখীন হইতে হইল না' (তদেব)।

তাজ্জব! কোর্টমার্শালে আসামি হওয়ার পরিবর্তে বিমান-দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুটা যে কোন্ যুক্তিতে বাঞ্ছনীয় সে কথা অবশ্য ব্যারিস্টার-সাহেব বুঝিয়ে বলেননি।

গান্ধীজি ও নেতাজির স্মৃতি স্বাধীন ভারতের জনমানস থেকে মুছে ফেলার যে ষড়যন্ত্র হয়েছিল সে-কথা অন্যত্র বিস্তারিতভাবে বলেছি। আজ সহস্রাব্দীর প্রবেশ-তোরণে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে আর এক মহামানবকে শ্রদ্ধা জানাতে বসেছি। এই বৎসরই তাঁর আবির্ভাবের শতবর্ষ পূর্ণ হচ্ছে। তাঁকেও সদ্য স্বাধীন ভারতের কর্ণধারেরা ইতিহাসের মহান নেপথ্যে সরিয়ে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। একই পদ্ধতিতে—মিথ্যার বেসাতি করে।

পিতা ও পুত্র দুজনেই অলোকসামান্য প্রতিভাধর—এমনটা সচরাচর দেখা যায় না। সঙ্গীত-জগতে, অভিনয়-মঞ্চে বা ক্রীড়াঙ্গনে দু-একটি বিরল দৃষ্টান্ত নজরে পড়লেও সর্বমুখী প্রতিভা—ছাত্রজীবন, ব্যক্তিজীবন, কর্মজীবনে অনন্যসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর পর-পর দুই পুরুষে আদৌ দেখা যায় না। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, তিলক-গোখলে, গান্ধীজি, এমনকি মহা অতীতে বুদ্ধদেব, অশোক, গুরু নানক—কোথাও এমনটি দেখিনি। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন মহর্ষি, তাঁর ভগবদ্ভক্তি অপরিসীম, এই পর্যন্তই। উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার ছিলেন একটি বিশেষ প্রাদেশিক ভাষায় শিশুসাহিত্যে অতি সুদুর্লভ হীরকখণ্ড, কিন্তু সত্যজিতের মতো তাঁদের প্রতিভা বিশ্বব্যাপী নয়, এমনকি ভারতব্যাপীও নয়।

সেই দিক থেকে বিচার করলে আশুতোষ-শ্যামাপ্রসাদের যুগলবন্দি ভারত-ইতিহাসের এক অনন্য উদাহরণ। স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দুজনেরই অনতিক্রম্য রেকর্ড। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারে—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ পিতাপুত্রের অবদান বিংশ শতাব্দীর ভারতে অতুলনীয়।

পিতৃদেবের কর্মজীবন ছিল উপবৃত্তাকার—তার দুইটি 'নাভি' : বিশ্ববিদ্যালয় ও হাইকোর্ট। সারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তিল-তিল মণিমুক্তা আহরণ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে রূপান্তরিত করলেন তিলোত্তমায়। স্বাজাত্যভিমানী আশুতোষ শিক্ষা ও বিচারের ক্ষেত্রে শাসক ইংরেজদের সমমর্যাদা দাবি করতেন। তাই প্রথম যৌবনে তাঁকে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হতে হল। ১৮৯৮-১৯০৪এ কলকাতা কর্পোরেশনের সদস্য এবং ১৮৯৯-১৯০৪-এ ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। এইসব নির্বাচনে ধুরন্দর রাজনীতিক সুরেন্দ্রনাথ অথবা ধনকুবের দ্বারভাঙ্গার মহারাজকে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত মহিমা ও পাণ্ডিত্যের গুণে পরাজিত করেছিলেন; কিন্তু ১৯০৪ খ্রি: হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে চিরকালের জন্য সরে দাঁড়ান। সর্বভারতীয় রাজনীতিতে তাই আশুতোষ অনুপস্থিত।

পুত্র পিতাকে এই বিশেষ ক্ষেত্রে অতিক্রম করে গেলেন। বিশ্ববিদ্যালয় ও হাইকোর্টের প্রতি আনুগত্য তাঁর বৃহত্তর দেশমাতৃকার সেবায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারল না। 'বাংলার বাঘ'-কে এক্ষেত্রে অতিক্রম করলেন 'ভারত-কেশরী'।

একই প্রসঙ্গে বারে-বারে আমাকে ফিরে আসতে হচ্ছে। বাধ্য হয়ে। 'জওহর-ইন্দিরা-রাজীব'-এর ভাগ্যলব্ধ হ্যাটট্রিকে কিন্তু আশুতোষ-শ্যামাপ্রসাদের দুর্দান্ত ডবল-সেঞ্চুরির মহিমা ছিল না আদৌ। ওঁরা তিনজনও নিঃসন্দেহে ভারতবিখ্যাত। উপরন্তু বিশ্ববিখ্যাত। কিন্তু কেন? তাঁদের প্রতিভার স্ফূরণের জন্য নয়, চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য নয়,

দেশপ্রেমের জন্য নয়—গদিতে চড়ে বসার দুর্লভ সৌভাগ্যের হেতুতে। দেশসেবক নয়, দেশশাসকের পরিচয়ে। আফগান ও মোঘল বাদশাহের দল : যেমন বংশানুক্রমিকভাবে ভারত-ইতিহাসে শাশ্বতকাল 'মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন'! না হলে ভারত সংস্কৃতিতে কী অবদান ইন্দ্রিয়াসক্ত, অহিফেনসেবী, স্ত্রৈণ জাহাঙ্গীর বাদশাহের? অথবা তাঁর পৌত্র ভ্রাতৃহন্তা, সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী, কুচক্রী ঔরঙ্গজেব-এর?

কেম্ব্রিজ বায়োগ্রাফিকাল ডিক্‌শনারিতে আশুতোষ অথবা শ্যামাপ্রসাদের নামে কোনও 'এন্ট্রি' নেই—আছে ঐ তিন শাসকের। অথচ ছাত্রজীবনে, ব্যক্তিজীবনে, কর্মজীবনে, দেশপ্রেমের নিরিখে পিতাপুত্রের প্রতিভার যে স্ফূরণ তার তুলনায় 'জওহর-ইন্দিরা-রাজীব' রীতিমতো নিষ্প্রভ।

পিতাপুত্র দুইজনই স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রমাগত প্রথম-দ্বিতীয় স্থানাধিকার করে গেছেন। যার তিলমাত্র নজির নেই ওই তিন শাসকের জীবনেতিহাসে। স্কুল জীবনেই—ম্যাট্রিক পাসের আগেই—স্যার আশুতোষ 'কেম্ব্রিজ মেসেঞ্জার অফ ম্যাথমেটিক্স'-এর কিছু দুরূহ গাণিতিক সমস্যার সমাধান করে গণিত-জগতে প্রশংসা লাভ করেন। আশুতোষ ব্যতিরেকে সারা পৃথিবীর কোনও স্কুলের ছাত্র এ-জাতীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছে বলে জানি না। বি. এ. পরীক্ষায় তিন-তিনটি বিষয়ের (সম্ভবত গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন) প্রত্যেকটিতেই সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন (১৮৮২)। এম. এ.-তেও গণিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। পরের বছর পদার্থবিদ্যায় এম. এ. এবং প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। 'ডিফারেন্‌শিয়াল ক্যালকুলাস এবং ইকোয়েশনে' কিছু মৌলিক গবেষণার স্বাক্ষর রেখে গণিত-জগতে চিরস্থায়ী আসন লাভ করেন। অতঃপর 'ডক্টর অব ল' হয়ে একটি প্রামাণিক আইনসংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন : ল অব পারপিচুইটিজ।

পুত্র শ্যামাপ্রসাদ এম. এ. পরীক্ষায় (১৯২৩) যথারীতি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। পরের বছর বিলেতে যান এবং ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে আসেন। দেশবিদেশের নানান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক উপাধি লাভ করেন।

তুলনায় দেখা যাক কেম্ব্রিজ বায়োগ্রাফিকাল ডিক্‌শনারি পণ্ডিত জওহরলালের ছাত্রজীবন সম্বন্ধে কী বলছেন :

After an undistinguished career at Harrow School and Trinity College, Cambridge, where he took the natural sciences, he read for the bar (Inner Temple, 1912), returned home and served in the court of Allahabad.

[হ্যারো স্কুল থেকে মামুলি নম্বর নিয়ে পাস করে তিনি কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে। পরে ইনার টেম্পল বারে ওকালতি পড়তে যান। ভারতে ফিরে এসে এলাহাবাদ হাইকোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করেন।]

বলাবাহুল্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী পিতার ছত্রচ্ছায়ে।

ইন্দিরা বা রাজীব শাসক পরিচয়ে ওই চরিতাভিধানে ঠাঁই পেয়েছেন কিন্তু তাঁদের ছাত্রজীবন নিতান্ত মামুলী। ছাত্রজীবনের কথা থাক, কর্মজীবনেই বা তাঁদের কী অবদান?

রাজীব গান্ধীর সবচেয়ে বড় কীর্তি শ্যাম পেট্রোদার মাধ্যমে ভারতে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার উন্নতি। কম্পিউটার, টেলিভিশন এবং বৈদ্যুতিন পদার্থবিদ্যার সম্প্রসারণ। আর তাঁর সবচেয়ে বড় অতলান্তিক অপকীর্তি শ্রীলঙ্কার রাজনীতিতে ভারতীয় সেনা প্রেরণ এবং মুসলিম ভোটের লোলুপতায় শাহ বানুর সুপ্রিম-কোর্টে-জেতা মামলা হারিয়ে দেওয়া। মুসলিম নারী সমাজকে অপমান করায়!

অনুরূপভাবে বলা চলে ইন্দিরা গান্ধীর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাদের পাশে এসে দাঁড়ানোতে। চীন ও পাকিস্তানের হুমকিতে তিনি আদৌ বিচলিত হননি। এমনকি প্রেসিডেন্ট নিক্সন যখন মার্কিন নৌবহরের 'সেভেন্থ ফ্লীট'কে বঙ্গোপসাগরের দিকে রওনা হবার ফর্মান জারি করলেন তখনও এই ভারতীয় নারী ঝাঁসির রানির মতো নির্ভীক থাকতে পেরেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতায় না থাক, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে ইন্দিরা গান্ধীজির অবদান অনস্বীকার্য।

তাঁরও অন্তত একজোড়া, হিমালয়ান্তিক অপকীর্তি : এমার্জেন্সি এবং

অপারেশন ব্লু-স্টার। দুটিরই মূলপ্রেরণা : স্বৈরাচারিতা। 'ডায়ন্যাস্টিক ন্যাস্টি রুল' টিকিয়ে রাখা। দেশের স্বার্থে নয়, গদির স্বার্থে!

অবশ্য ইন্দিরা ও রাজীব দুজনেই জান দিয়ে নিজ-নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন!

কিন্তু পণ্ডিত জওহরলাল?

অপকীর্তির কথা থাক, দীর্ঘ সতেরো বছর ভারত শাসনের ভিতর তাঁর সবচেয়ে বড় কীর্তি কোন্‌টা? গান্ধীহত্যার প্রকৃত তথ্য ভারতবাসীকে জানতে না দেওয়া? সর্দার প্যাটেলের জেতা কেস হারিয়ে দিয়ে কাশ্মীর সমস্যা-সমাধানের চাবিকাঠি রাষ্ট্রসঙ্ঘের হাতে তুলে দেওয়া? শাহ্‌ নওয়াজ খানকে রেলমন্ত্রী বানানো? নাকি 'হিন্দি-চীনী ভাই-ভাই' গান মাঝপথে থামাতে বাধ্য হয়ে এবং চীনের কাছে গো-হারান হেরে সব দায়িত্ব কৃষ্ণ মেননের স্কন্ধে চাপিয়ে নিজের গদি বাঁচানো? অথবা পাকিস্তান থেকে ছুটে আসা পাকতুনিস্থানের ডেলিগেটদের ইন্টারভিউ দিতে অস্বীকার করা? সীমান্ত গান্ধীকে পাকিস্তানের জেলে পাঠানো হয়েছে শুনে হঠাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে যাওয়া? কোন্‌টা?

ঈশ্বর তাঁর প্রতি অহৈতুকি করুণাময়। ইন্দিরা বা রাজীবের মতো তাঁকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়নি। সেই ভারতরত্নের চিতাভস্ম সরকারি খরচে একটি চার্টার্ড প্লেনে সারা ভারতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত সেই চিতাভস্ম মাঠে না ফেলে ফেলা হল শুধুমাত্র নদীতে। বিপাশা থেকে ব্রহ্মপুত্র, কোশি থেকে কাবেরী! কোটি টাকা ব্যয় করে। মাটিতে ফেললে হয়তো জৈবিকসারে জমি কিছুটা উর্বর হত। সবটাই 'জলে' গেল।

জানি, আপনারা কী বলতে চান। লিখতে বসেছি শ্যামাপ্রসাদের গৌরবগাথা, কিন্তু ক্রমাগত দিয়ে চলেছি অন্য এক, 'ভারতরত্নের' অপকীর্তির ফিরিস্তি। আমার কৈফিয়তটা তাহলে শুনুন :

ভারতকেশরীর যাবতীয় কীর্তিকাহিনী একটি জন্মশতবার্ষিক সংকলন

গ্রন্থ উপচীয়মান। বাংলা ভাষার বিভিন্ন পণ্ডিত, রাজনীতিক, ইতিহাসবেত্তা সেই মহাপুরুষের কীর্তিগাথার এক-এক পর্যায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। ভারতীয় দর্শনে 'অন্ধের হস্তিদর্শন' বলে একটি সূত্র আছে; এ সংকলন গ্রন্থে আমরা সবাই মিলে সেই ঐরাবতের একটি সামগ্রিক চিত্র আঁকবার চেষ্টা করছি, একেকজন একেক দৃষ্টিভঙ্গিতে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক উপনিষদের মন্ত্রে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা : "ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভূনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ" (আমরা গুরুশিষ্য যেন উভয়েই সমানভাবে সাফল্যলাভ করি ইত্যাদি।) শিক্ষক-প্রশিক্ষণের কার্যসূচি, বাংলাভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গণ্য করা, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অনন্যসাধারণ সমাবর্তন ভাষণ ইত্যাদি। আবার ওদিকে পঞ্চাশের মন্বন্তরে তাঁর সেবাধর্ম, হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতিতে তাঁর অবদান, কাজি নজরুল ইসলামের প্রতি তাঁর স্নেহপূর্ণ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া, সাংসদ-হিসাবে তাঁর অতুলনীয় বাগ্মিতার কথা—এইসব কথাই আমরা এক এক করে বলবার চেষ্টা করব। আমি এই অন্ধের হস্তিদর্শনের একটি পর্যায়েই নিজের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে চাই। : ভারতীয় সংহতি রক্ষায় তিনি কী প্রচণ্ড প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং সিংহবিক্রমে সেই প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে গিয়ে তিনি কীভাবে শহিদ হয়ে যান। আজ্ঞে হ্যাঁ, শহিদ! শব্দটা ব্যবহার করেছেন বর্তমান ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী। ভারত-কেশরীর জন্মশতবার্ষিকীতে :

'ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভারতীয় জনসঙ্ঘের সভাপতি নির্বাচিত হবার পর তাঁর সঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাঁর সহযাত্রীরূপে আমি শ্রীনগরে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে তিনি আর ফিরে আসেননি। দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তাঁর শেষ বাণী এখনও আমার কানে বাজে। তিনি বলেছিলেন, সরকারি প্রথা অবজ্ঞা করে আমি জম্মু ও কাশ্মীরে ঢুকেছি। তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্ব, বাগ্মিতা, রাজনৈতিক বিচক্ষণতা এবং সর্বোপরি মানবতাবোধ পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পথচলা

ও প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

'স্বাধীন ভারতের ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় তিনিই প্রথম শহিদ।'

কেন এবং কোন পরিস্থিতিতে ড. শ্যামাপ্রসাদ জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে পদার্পণ করেছিলেন সেই পটভূমিকার পুনরালোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য। বর্তমান প্রজন্ম তা সঠিকভাবে জানে না। তাই অনেকে মনে করেন শ্যামাপ্রসাদ হঠকারিতা করেছিলেন আইন ভেঙে। কোন্ আইন? কে সেই আইনের প্রয়োগকর্তা? ভারতবাসী হিসাবে ভারতেরই কোন এক প্রান্তে যেতে স্বাধীন ভারতীয়ের কেন পারমিট লাগবে? দেখা যাক :

ভারত বিভাগ ও স্বাধীনতাপত্রের চুক্তিতে ব্যবস্থা হয়েছিল যে, যে-সব ব্রিটিশ করদ রাজ্যের সীমান্তে সদ্য স্বাধীন ভারত এবং পাকিস্তান উভয়ই পড়েছে সেখানে সেই করদ রাজ্যটা কোন্ সার্বভৌম রাষ্ট্রে সংযুক্ত হবে তা নির্ধারণ করবেন সেই করদ রাজ্যের তদানীন্তন শাসক। এই সূত্র মেনে নিয়েছিলেন ভারতের তরফে জওহরলাল এবং পাকিস্তানের তরফে মঃ আলি জিন্না। হায়দরাবাদের নিজামের রাজ্যের চতুর্দিকেই ছিল ভারত; কিন্তু নিজাম ভারতচুক্তিতে অস্বীকৃত হয়ে ঘোষণা করলেন : তিনি স্বাধীন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই অচিরে পুলিশি ব্যবস্থা করে নিজামের সেনাপতি কাশেম রেজভিকে বন্দি করলেন। নিজাম নতজানু হলেন। হায়দরাবাদ এল ভারতে। অনুরূপ দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন জুনাগড়ের শাসক। সর্দারজি এক সপ্তাহের ভিতর জুনাগর-অধিপতির খোয়াব দেখা বন্ধ করলেন। তিন নম্বর সমস্যা দেখা দিল কাশ্মীরে। ভূস্বর্গের এক সীমান্তে পাকিস্তান, অপর সীমান্তে ভারত। কাশ্মীররাজ হরি সিং বললেন, আমি কোনও রাষ্ট্রেই যোগ দেব না। কাশ্মীর হবে দুই সার্বভৌম রাষ্ট্রের মাঝখানে একটা স্বাধীন 'বাফার-স্টেট।'

ভারত নীরব রইল। পাকিস্তান রইল না। এই অজুহাতটাই হল তাদের তুরুপের তাস। পাকিস্তানে প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের কিছু ধুরন্ধর ব্রিটিশ জেনারলকে মাইনে দিয়ে পোষা হচ্ছিল। তাদের সহযোগিতায় গিলগিটের

বেশ কিছুটা ভারত-ভূখণ্ড পাকিস্তান ইতিমধ্যেই হাতিয়ে নিয়েছে। এবার মহারাজ হরি সিং-এর আবদার শুনে পাকিস্তান ভূস্বর্গের দিকে থাবা বাড়াল।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ছত্রচ্ছায়ায় রওনা হল একদল আফ্রিদি উপজাতীয় হানাদার। হরি সিং সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। অনতিবিলম্বেই হানাদারেরা লুটতরাজ করতে করতে এগিয়ে আসতে থাকে শ্রীনগরের দিকে। বাধ্য হয়ে রাজা হরি-সিং 'ইন্সট্রুমেন্ট অব অ্যাকসেশনে' স্বাক্ষর করে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

যে চুক্তি বলে ইংরেজের হাত থেকে শাসনক্ষমতা গ্রহণ করে ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃত, সেই চুক্তিপত্র অনুসারেই রাজা হরি সিং-এর ইন্সট্রুমেন্ট অব অ্যাকসেশনে স্বাক্ষর করার মুহূর্ত থেকেই কাশ্মীরের ভারতভুক্তি অনস্বীকার্য হয়ে পড়ে। হরি সিং শরণাগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্দার প্যাটেল কাশ্মীরে সৈন্য প্রেরণ করেন। অসীম ত্যাগ স্বীকার করে, অগুনতি প্রাণ বলিদান দিয়ে ভারতীয় জওয়ানরা পাকিস্তানি হানাদারদের কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়। তখনো লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন স্বাধীন ভারতের নিয়মতান্ত্রিক গভর্ণর জেনারল। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারল যেমন ছিলেন কায়েদে আজম জিন্না। পাকিস্তান যখন চূড়ান্ত পরাজয়ের মুখে তখন অহেতুক রক্তপাত বন্ধ করতে দুই গভর্নর জেনারল মুখোমুখি আলোচনায় বসলেন পশ্চিম-পাঞ্জাবের লাটপ্রাসাদে।

আলোচনা সেরে লর্ড মাউন্টব্যাটেন-সাহেব ফিরে এলেন ভারতে। ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় তিনি কোনও লিখিত রিপোর্ট দেননি। শুধু প্রধানমন্ত্রীকে জনান্তিকে ডেকে এনে কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন। খোদায় মালুম—কী পরামর্শ!

তারপর ঘটল একটা অদ্ভুত ঘটনা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার প্রবল আপত্তি অগ্রাহ্য করে প্রধানমন্ত্রী ১৯৪৯-এর জানুয়ারি মাসে ভারতীয় সৈন্যদলের

অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করলেন। হল্ট। ভারতীয় সৈন্যদল যখন জয়ের শেষ সীমান্তে উপনীত—শেষ হানাদারটিকে কাশ্মীর থেকে বিতাড়নের ক্ষণটি যখন মাত্র এক সপ্তাহের দূরত্বে, তখন জওহরলাল এক তরফা যুদ্ধাবসান ঘোষণা করলেন। কাশ্মীর সমস্যাটি তিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রেরণ করলেন এই অনুরোধ করে যেন রাষ্ট্রসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণ করা হয়। তারা পাকিস্তান যেতে চায়, না ভারতে।

Tale of a tail

কাশ্মীর সুন্দরীকে এভাবে পিছন থেকে জওহরলাল কেন ছুরি মারলেন সেটা একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্য। গান্ধীজি অবশ্য তার আগেই নিহত হয়েছেন। কিন্তু রামমনোহর লোহিয়া, জয়প্রকাশ নারায়ণ, স্যার সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণণ প্রভৃতি সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতারা ছিলেন। নেহরু এবারও অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেবার আগে কারও সঙ্গে কোনও আলোচনা করেননি। মন্ত্রিসভার বিশিষ্ট সদস্যরা—সর্দার প্যাটেল, মৌলানা আজাদ, শ্যামাপ্রসাদ প্রভৃতি তো এ প্রস্তাবের ঘোরতর বিরোধিতা করেছিলেন। নির্বাচনের মাধ্যমে গদি-আসীন না হলেও নেহরু হিটলার বা ইদি আমিনের মতো ভারতের ডিকটেটর ছিলেন না; তবু একক সিদ্ধান্তে সেই ভারতীয় এই মহান

কীর্তিস্তম্ভটি গেড়ে দিয়েছিলেন ভারতের বুকে। সেজন্য আজ পঞ্চাশ বছর ধরে জওয়ানেরা কাশ্মীর রণাঙ্গনে রক্তাক্ত মৃত্যুবরণ করে চলেছে।

আর যাই দোষ থাক নেহরু নির্বোধ ছিলেন একথা তাঁর শত্রুতেও বলবে না। ইন্দিরা গান্ধী কেন অপারেশন ব্লু-স্টারের সর্বনাশা পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, রাজীব গান্ধী কেন শাহ্ বানুর জেতা-কেস হারিয়ে দিলেন তার যৌক্তিকতা বোঝা যায়। কিন্তু জওহরলাল কেন 'জান বুঝ কর', কাশ্মীর সুন্দরীকে জহরব্রত পালনে বাধ্য করলেন তার কোনও ব্যাখ্যা নেই।

কেন?—কেন?—কেন? জবাব নেই।

ভারতীয় প্রেস রুদ্ধবাক। শুধু কিছু ব্যঙ্গ-চিত্রশিল্পী স্থির থাকতে পারেননি। বন্ধুবর চণ্ডী লাহিড়ী সে সময় হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে যে ব্যঙ্গ চিত্রটি এঁকেছিলেন—চাইনিস ইংকে কি চোখের জলে জানি না—তা লা-জবাব : "Tale of a tail"। ব্যাখ্যায় শ্রী লাহিড়ী বলেছিলেন, 'When the Indian army drove away the invaders and captured most of the strategic points, Nehru suddenly called a halt. Thus he kept the Kashmir question alive when it could have been buried permanently.'

সে সময় অনেকে আশা করেছিলেন পণ্ডিতজি মাউন্টব্যাটন-সাহেবের সুপারিশে অচিরেই শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পাবেন। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই যে দুটি পরিকল্পনা গ্রহণকে অগ্রাধিকার দেওয়া আবশ্যিক ছিল পণ্ডিতজি তা আমল দেননি—জন্মনিয়ন্ত্রণ এবং সাক্ষরতা অভিযান তথা শিক্ষা-বিস্তার। তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন নানান আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ডে। পঞ্চশীল, বান্দুং সম্মেলন, হিন্দি-চীনী ভাই-ভাই। কী আপসোসের কথা! জওহরলাল শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পাননি, কিন্তু কাশ্মীরের অশান্তিটা অন্তত চিরস্থায়ী করে যেতে পেরেছিলেন।

ভারতীয় জওয়ানেরা প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে যুদ্ধ আচমকা থামিয়ে দেওয়ায় হানাদারেরা আবার কিছুটা ফিরে এল। তারপর একটা স্থিতাবস্থা রক্ষার আয়োজন হল। ভারত সেই নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর আধখানা কাশ্মীর

নিয়ে সন্তুষ্ট; কিন্তু পাকিস্তান তা নয়। গত পঞ্চাশ বছরে তারা বারে বারে সীমান্ত অতিক্রম করে হুঙ্কার দিয়েছে : 'ও কুমির তোর জলে নেমেছি।' নেহরুর আমলে, লাল বাহাদুরের জমানায়, ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকালে এবং এই তো সেদিন কার্গিল রণাঙ্গনে।

নেহরু কাশ্মীর-সমস্যা রাষ্ট্রসঙ্ঘের হাতে অর্পণ করার পরের বছরই পাকিস্তানের লিয়াকৎ আলি সস্ত্রীক এসে উপস্থিত হলেন দিল্লিতে। ততদিনে লর্ড মাউন্টব্যাটন ফিরে গেছেন স্বদেশে। দীর্ঘ এগারো দিন ধরে দুই প্রধানমন্ত্রী রুদ্ধদ্বার কক্ষে আলোচনা করলেন : কাশ্মীর তথা সংখ্যালঘু সমস্যা নিয়ে। ভারতের গভর্নর জেনারল তখন রাজা গোপালাচারী। সেই ভদ্রলোক, যিনি চল্লিশের দশকে ভারত-বিভাগের প্রস্তাবটা প্রথম উত্থাপন করেছিলেন কংগ্রেসে : 'রাজাজি ফর্মূলা'! বলেছিলেন, মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল—সিন্ধুপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও বাংলাকে জিন্নার হাতে ছেড়ে দিয়ে বাকি ভারতকে স্বাধীনতা দিক ব্রিটেন!

এগারো দিন রুদ্ধদ্বার কক্ষে আলোচনার পর দুই প্রধানমন্ত্রী একটি চুক্তি সম্পাদন করলেন : নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি। লিয়াকৎ আলি জবান দিলেন যে পূর্ব-পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের স্বার্থ দেখবে সেখানকার সরকার। হ্যাঁ, দেখবে কেউ তাদের গায়ে হাত দেবে না, অত্যাচার করবে না। মেরেধরে ভারতে পাঠিয়ে দেবে না। এই প্রতিশ্রুতিতে সন্তুষ্ট হলেন জওহরলাল। তিনি 'বেরুবাড়ি' প্রভৃতি ছিটমহল পাকিস্তানকে হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

এবারও বন্ধুবর চণ্ডী লাহিড়ী একটি অনবদ্য কার্টুন এঁকেছিলেন, আটই এপ্রিল ১৯৫০ সালে। এ ব্যঙ্গচিত্রের ক্যাপশন নিষ্প্রয়োজন।

ডঃ মুখোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করলেন। ওই ৮.৪.১৯৫০ তারিখে। শুধু তিনি একা নন, নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির ক্ষতিকর শর্তগুলি দেখে ওই সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী কে. সি. নিয়োগী এবং ডক্টর জন মাথাই।

শ্যামাপ্রসাদ গঠন করলেন একটি নতুন রাজনৈতিক দল : জনসঙ্ঘ।

পাকিস্তানকে তোষণের জন্য ভারত সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন তিনি। অক্টোবর মাসে দিল্লিতে হল এই সর্বভারতীয় সংগঠনের প্রতিষ্ঠা সভা। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিনিধিরা সমবেত হলেন। এই সময় সাধারণ ভারতীয়ের মৌলিক অধিকার খর্বকারী সংবিধানের একটি সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে লোকসভার তীব্র প্রতিবাদ

জানান শ্যামাপ্রসাদ। পরের বছর সাধারণ নির্বাচনে দক্ষিণ কলকাতা থেকে লোকসভায় পুনর্নির্বাচিত হন।

এদিকে কাশ্মীরে অখণ্ড ভারতের দাবিদার প্রজা পরিষদের আন্দোলনকে শায়েস্তা করার জন্য শেখ আবদুল্লা জওহরলালের কাছ থেকে পেলেন সশস্ত্র রিজার্ভ পুলিশ, পাঞ্জাব সরকারের কাছ থেকে কাঁদানে-গ্যাস স্কোয়াড। গ্রেপ্তার করা হল কয়েক হাজার প্রতিবাদী মানুষকে। সুপরিকল্পিত আক্রমণ চালানো হল জম্মু অধিবাসীদের উপর। জওহরলাল নির্বিকার।

এই অন্যায়ের প্রতিবাদে শ্যামাপ্রসাদ চোদ্দই ডিসেম্বর ১৯৫২ সারা ভারত জম্মু-দিবস পালনের আহ্বান জানালেন। ফলে সারা দেশ জানতে পারল জম্মুর স্বৈরতন্ত্রী শাসনের কথা। ডিসেম্বরের শেষদিকে কানপুরে

জনসঙ্ঘের সভায় স্থির হল একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভারত সরকারকে একটি চরমপত্র দেওয়া হবে। তাতে কাজ না হলে জনসঙ্ঘ সর্বভারতীয় আন্দোলনে নামবে। হয়ত আইন-অমান্য আন্দোলন।

কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ বললেন, এ জাতীয় সরকার-বিরোধী আন্দোলনে দেশের উন্নয়নমূলক কাজগুলি ব্যাহত হয়। তাই প্রথম চেষ্টা করে দেখা উচিত শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পথে সমস্যা সমাধান করা যায় কিনা। এই প্রস্তাবটিই শেষ পর্যন্ত গৃহীত হল। স্থির হল, মীমাংসার প্রচেষ্টায় শ্যামাপ্রসাদ পত্রালাপের মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করবেন—জওহরলাল ও শেখ আবদুল্লার সঙ্গে।

এই ত্রিমুখী পত্রাবলী জানুয়ারির নয় তারিখ থেকে ফেব্রুয়ারির পঁচিশের মধ্যে লিখিত। যাঁরা বিস্তারিতভাবে এই পত্রাবলী পাঠ করতে ইচ্ছুক তাঁরা শ্রীরুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'কাশ্মীর মঞ্চে শ্যামাপ্রসাদ' (বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র কলকাতা—৭০০ ০৭৩) গ্রন্থের সন্ধান করতে পারেন। তাতে দেখা যায়, শ্যামাপ্রসাদ ক্রমাগত আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে চাইছেন, এবং প্রধানমন্ত্রী আর তাঁর বশংবদ শেখ আবদুল্লা তাঁদের সংকল্পে অনড় আছেন। তাঁরা দুজন দমননীতির মাধ্যমেই কাশ্মীরে প্রজা পরিষদের কণ্ঠরোধ করতে বদ্ধপরিকর। জওহরলালের তরফে শ্যামাপ্রসাদের বিরুদ্ধাচরণ যেন জেদাজেদির রূপ নিল। তিনি নিজে বুঝতে পারছিলেন শেখ আবদুল্লা ভুল ও অন্যায় করছেন। কারণ এই সময়ে জওহরলাল বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে একটি পত্রে লিখেছেন, 'শেখ-সাহেব নিজেই ভাল জানেন না কোথায় কী করা উচিত, অথচ আমাদের উপদেশেও কর্ণপাত করতে চান না' (Jawaharlal Nehru, by S. Gopal, New Delhi, 1979, p. 125)। অথচ শ্যামাপ্রসাদকে জানালেন, ওই সময়ে ভারত সরকারের পক্ষে গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী জেনিভাতে পাকিস্তানি পক্ষ ও মিঃ গ্রাহামের সঙ্গে কাশ্মীরের ভাগ্য নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছেন, ফলে শেখ আবদুল্লা ও প্রজা পরিষদের ব্যাপারে ভারত সরকার স্থিতাবস্থা পরিবর্তন করতে অনিচ্ছুক।

আপোস মীমাংসা ব্যর্থ হওয়ায় শ্যামাপ্রসাদ বুঝলেন আন্দোলন ব্যতীত আর কোন পথ খোলা নেই। এই সংগ্রাম কেবলমাত্র কাশ্মীরের ভারতভুক্তির সংগ্রাম নয়, এ হচ্ছে সমগ্র ভারতের অখণ্ডতা রক্ষার সংগ্রাম। শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে জনসঙ্ঘ দেশের সর্বত্র সভা ও শোভাযাত্রার আয়োজন করল। সরকার পাঞ্জাব রাজ্যে ১৪৪ ধারা জারি করল; জম্মু এবং কাশ্মীরের বাইরে জনসঙ্ঘ নেতাদের গ্রেপ্তার করা শুরু হয়ে গেল।

জনসঙ্ঘ পাঁচই মার্চ সমগ্র ভারতে 'কাশ্মীর দিবস' পালনের আয়োজন করল। দিল্লির কুইন্স গার্ডেনে হল এক বিরাট জনসভা। সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় স্বামী করপঞ্জজী। শ্যামাপ্রসাদ তাঁর বক্তৃতায় জানালেন কীভাবে শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

পরদিন চাঁদনী চকে একটি শোভাযাত্রা পরিচালনা করার সময় ১৪৪ ধারা অমান্য করার অপরাধে শ্যামাপ্রসাদ এবং তাঁর সহকারী নেতারা গ্রেপ্তার হলেন। সংসদের বিরোধী নেতার গ্রেপ্তারের সংবাদে সারা দেশে পরদিন হরতাল অনুষ্ঠিত হল। কিন্তু পুলিশ ব্যর্থ হল তাঁকে আটক রাখতে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি পতঞ্জলি শাস্ত্রী শ্যামাপ্রসাদকে নিঃশর্ত মুক্তি দিলেন। সেদিন সুপ্রিম কোর্টের গ্যালারিতে দর্শকের দাঁড়াবার ঠাঁই ছিল না। মুক্তি পাবার সঙ্গে সঙ্গে আদালত কক্ষ থেকে ওঁরা সরাসরি চলে এলেন লোকসভায়। মুক্তি পাবার খবরটা তখনো কেউ জানত না। শ্যামাপ্রসাদ লোকসভার অধিবেশনে সশরীরে উপস্থিত হওয়ায় তুমুল হর্ষধ্বনি দিয়ে সকলে তাঁকে সংবর্ধনা জানালেন।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ কালো হয়ে গেল।

প্রজা পরিষদের আন্দোলন সারা ভারতে সমর্থিত হওয়ায় কাশ্মীর সরকার জম্মুতে অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করল। তার প্রতিক্রিয়ায় প্রজা পরিষদের নেতৃবৃন্দ ধৈর্য হারিয়ে রক্তাক্ত সংগ্রামের অনুমতি চাইল। এবার প্রমাদ গণলেন শ্যামাপ্রসাদ। স্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়াতে তখন তাঁর ঘোরতর আপত্তি। তাই তিনি তাঁর দুই

সহকর্মী উমাশঙ্কর দীক্ষিত এবং ভি জি দেশপাণ্ডেকে জম্মুতে পাঠাতে চাইলেন, জম্মুর জনগণকে শান্ত করতে। দুর্ভাগ্য এমন যে, ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রক তাঁদের দুজনকে জম্মু প্রবেশের অনুমতি দিল না। তাঁদের গ্রেপ্তার করা হল।

ফলে শ্যামাপ্রসাদ স্বয়ং অকুস্থলে যেতে চাইলেন। জম্মু-যাত্রার পূর্বে পাঞ্জাবের কয়েকটি শহর পরিক্রমা করলেন শ্যামাপ্রসাদ—অমৃতসর, জলন্ধর, আম্বালা। পাঞ্জাব থেকে দু'খানি টেলিগ্রাম পাঠালেন—শেখ আবদুল্লা এবং জওহরলালকে। জানালেন যে, তিনি কয়েকজন সহচরকে সঙ্গে করে জম্মুতে যাচ্ছেন। উদ্দেশ্য : একপক্ষে প্রজা পরিষদের নেতৃস্থানীয় কিছু ব্যক্তি (যাঁরা আজও কারাগারের বাইরে আছেন) এবং অপরপক্ষে শেখ-সাহেবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে জম্মুর বিদ্রোহ যে সশস্ত্ররূপ নিতে চলেছে তা প্রতিহত করা। দু'পক্ষের মধ্যে একটা সমঝোতা আনা। জওহরলাল তাঁর টেলিগ্রামের কোনও জবাবই দিলেন না। শেখ-সাহেব জানালেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে শ্যামাপ্রসাদের জম্মু আগমন যুক্তিযুক্ত হবে না। এতে সমস্যা সমাধানের কোনও সুরাহা হবে না।

মে মাসের ৯ তারিখে শ্যামাপ্রসাদ এই টেলিগ্রামটি পান। পরের দিন ১০ মে তিনি জলন্ধর থেকে জম্মুর দিকে যাত্রা শুরু করেন। সঙ্গে চলেছেন চারজন সহকর্মী। দিল্লি জনসঙ্ঘের সভাপতি গুরুদত্ত বৈদ্য, পাঞ্জাবের জননেতা টেকচাঁদ শর্মা, অধ্যাপক বলরাজ মাধোক এবং একজন তরুণ সহকর্মী, বর্তমানে যিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী।

আশ্চর্যের কথা, ভারতে কেউ তাঁকে বাধা দিল না। জলন্ধর থেকে জম্মু সীমান্তের পথে একাধিক পদস্থ সরকারি অফিসার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। তাঁর সাফল্য কামনা করলেন। গুরুদাসপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং এস ডি ও এসে শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। তাঁর যাত্রা শুভ হোক এই কামনা করলেন এবং একটি জিপ ও রক্ষী সঙ্গে দিয়ে

তাঁদের জম্মুর দিকে রওনা করে দিলেন। নিজেও সঙ্গে সঙ্গে এলেন।

রাভী নদীর তীরে দাঁড়িয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব হাত নাড়তে থাকেন। ব্রিজের ওপারে কাশ্মীর রাজ্য। জিপটা ব্রিজের মাঝামাঝি যেতেই কাশ্মীরি পুলিশ অফিসার তাঁদের আটক করল। এবং তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করল।

সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, ভারত সরকারের—অর্থাৎ জওহরলালের নির্দেশেই মাধোপুর চেকপোস্টের আগে শ্যামাপ্রসাদকে রুখে দেওয়া হয়নি। কারণ তদানীন্তন আইনে সেই রাভী নদীর ওপারে সুপ্রিম কোর্টের কোনও এক্তিয়ার ছিল না। নদীর মাঝামাঝি পার হবার পর গ্রেপ্তার হলে শ্যামাপ্রসাদের তরফে কেউ সুপ্রিম কোর্টে হেবিয়াস কর্পাস আইনে তাঁর মুক্তি দাবি করতে পারবে না।

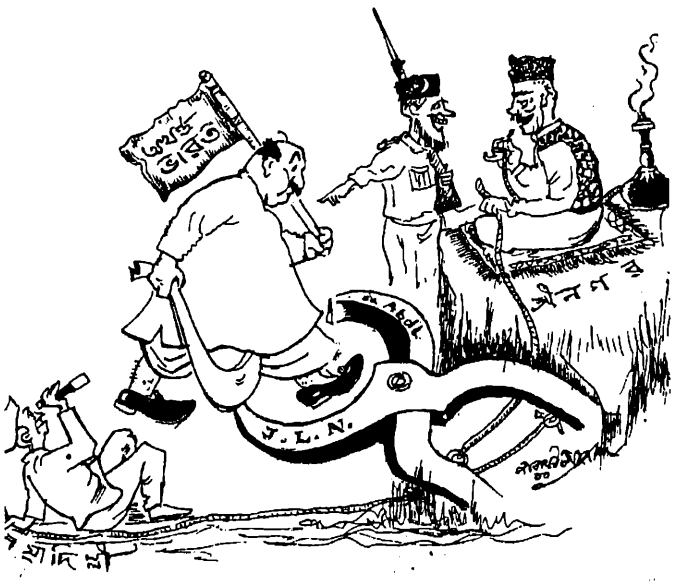

ভারতরত্ন পণ্ডিত জওহরলালের এই গোপন চক্রান্তটাও একটা মহান কীর্তি। শ্যামাপ্রসাদ বন্দি হলেন ১১ মে। এই গোপন ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে আগ্রহী পাঠক জানতে পারেন এই সব গবেষকের রচনায়। শ্যামাপ্রসাদের সহযাত্রী অধ্যাপক বলরাজ মাধোক (ভারতকেশরী

ড. *শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়*, জাতীয় অধ্যাপক মঞ্চ, কলকাতা-৬), সুশান্তকুমার সাহিত্যরত্ন (*ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ*, সাহিত্যম, কলকাতা-৭৩), রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায় (*কাশ্মীর মঞ্চে শ্যামাপ্রসাদ*, বিবেকানন্দ সাহিত্যকেন্দ্র, কলকাতা-৭৩) অথবা উমাপ্রসাদের (*শ্যামাপ্রসাদের ডায়েরি ও মৃত্যুপ্রসঙ্গ*, মিত্র ও ঘোষ) গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা পাবেন। তা থেকেই আপনারা জানতে পারবেন যে, একজন সর্বভারতীয় মহাত্মাকে কীভাবে বিনা বিচারে, বিনা চিকিৎসায়, সাধারণ সৌজন্যবঞ্চিত অবস্থায় মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। শ্রদ্ধেয় উমাপ্রসাদ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন : "শ্যামাপ্রসাদ লোকনিন্দা বা সমালোচনার পরোয়া কোনওদিন করেননি। স্বাধীনতার আগে ফজলুল হক মন্ত্রিসভায় যোগদান ও পদত্যাগ, স্বাধীনতার পর হিন্দু মহাসভার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান, নেহরুজির সঙ্গে মতবিরোধে পদত্যাগ, জনসঙ্ঘ দলের প্রতিষ্ঠা—এ সবই তাঁর জনগণের মঙ্গল-অন্বেষা ও চরিত্রদার্ঢ্যের উজ্জ্বল নিদর্শন। হিন্দু মহাসভার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে অনেকেই তাঁকে সাম্প্রদায়িক বলেন, তাঁর ব্যক্তিত্বকে ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করেছেন। শ্যামাপ্রসাদের স্মৃতিকথা, দিনলিপি ও শেষ জীবন পড়লে এই ভুল আর কারও থাকবে না।"

পরমশ্রদ্ধেয় উমাপ্রসাদের সঙ্গে আমার একটা নিবিড় স্নেহ-শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। তাঁকে আমি 'সেজদা' নামে ডাকতাম। তাই জানি, তিনি সারাজীবনে রাজনীতির ধারেকাছে ছিলেন না, সেই বিশ্বস্ত হিমালয়প্রেমিক সাত্ত্বিক মানুষটি সাংসারিক আবর্তে কোনও দিন জড়িয়ে পড়েননি। তাই তিনি আদৌ জানেন না যে, এই শ্রেণীর রাজনীতি-ব্যবসায়ী মানুষ এ দেশে চিরকাল ছিলেন, আছেন ও থাকবেন, যাঁরা রাজনৈতিক কারণে বিবেক বিক্রি করে বসে আছেন। তাঁরাও সব কিছু 'জান-বুঝ-কর' যুক্তি-তর্কের ধার ধারেন না। তাঁরা এই দেশপ্রেমিক শহিদদের শতবর্ষ উৎসবে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে আসবেন না। বস্তুত আসেননি।

সব শেষ হয়ে যাবার পর ভারতকেশরীর জননীর সঙ্গে জওহরলালের যে পত্র বিনিময় হয়েছিল, যার সম্পূর্ণ বয়ান আপনারা উল্লিখিত গ্রন্থে

বিস্তারিত পাবেন, তার কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলির সমাপ্তি টানছি। কিন্তু তার পূর্বে এই পত্রাবলীর প্রাসঙ্গিকতা অনুধাবন করতে সুবিধা হবে মনে করে আমরা ২০.৭.৫৩ তারিখে 'দ্য অর্গানাইজার' পত্রিকার সম্পাদকীয় থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি তুলে ধরছি :

"প্রধানমন্ত্রী অনুগ্রহ করে দেশবাসীকে একটি বিবৃতির মাধ্যমে জানিয়েছেন : প্রকৃত ঘটনা যাদের জানার সুযোগ হয়েছিল এমন কয়েকজন ব্যক্তিকে তিনি নাকি জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন এবং জেনেছেন যে প্রয়াত শহিদ ড. মুখোপাধ্যায়কে ডাল লেকের ধারে একটি সুন্দর বাংলোতে রাখা হয়েছিল। তাঁকে সব রকম সুযোগ-সুবিধাও দেওয়া হয়েছিল। এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত।

"প্রকৃত ঘটনা জানার সুযোগ হয়েছিল এমন কয়েকজন ব্যক্তিকে আমরাও জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। এইসব ঘটনার কয়েকটি আমরা ইতিপূর্বে প্রকাশ করেছি। এখানে আরও কয়েকটি প্রকাশিত হল :

"যে বাড়িতে আমাদের প্রিয় নেতাকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল সেটা না 'সুন্দর', না 'বাংলো'। সেটা একটা জরাজীর্ণ ছোট্ট পোড়োবাড়ি। সরকারি মোকাম নয়। বেসরকারি ভাড়াবাড়ি। কিন্তু এমনই জনশূন্য স্থানে পরিত্যক্ত অবস্থায় তা পড়েছিল যে, কোনো পর্যটক সেটা দীর্ঘদিনের মধ্যে ভাড়া নেয়নি। বাড়িটা মনুষ্যবাসের অনুপযোগী। সেটি 'ডাল লেকের ধারে' বললে অসত্য ভাষণ হয়। এমনকি সদর রাস্তার উপরও বাড়িটি অবস্থিত নয়। চারপাশটা যেমন জংলি তেমনি ভুতুড়ে— পেঁচা ও সাপের আস্তানা।... ড. মুখোপাধ্যায় কয়েকবারই তাঁর পাশ দিয়ে সাপ চলে যেতে দেখেছেন। দিনপঞ্জিকায় তা লিখেছেনও।... সমতলবাসী কোনও বয়স্ক ব্যক্তিকে এমন ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেঁতে সাপের আস্তানায় ফেলে রাখা গর্হিত অপরাধ। বিশেষত বন্দি হচ্ছেন ভারতীয় সংসদের লিডার অব দ্য অপোজিশন।

"বাইশে জুন ড. আলি মহম্মদের পরামর্শে শ্যামাপ্রসাদকে সেই বন্দিশালা থেকে একটি নার্সিংহোমে অপসারণের ব্যবস্থা করা হয়। দুপুর বারোটায় একটি ছোট ভ্যানে করে ড. মুখোপাধ্যায়কে নার্সিংহোমে নিয়ে

যাওয়া হয়। বন্দিশালা থেকে গাড়ি পর্যন্ত রুগিকে পায়ে হেঁটে যেতে বাধ্য করা হয়। স্ট্রেচারের ব্যবস্থা না থাকায়। ভ্যানে শোবার জায়গা ছিল না। কোনও বালিশ বা কম্বলও তাঁকে দেওয়া হয়নি... নেড়ু হোটেলের কাছে বেশ কয়েকজনই তাঁকে ওই ভাবে ঠায় বসে থাকতে দেখেছে।...

"এই তথাকথিত নার্সিংহোমের ছোট্ট ঘরটি ছিল শ্রীহীন, পর্যাপ্ত আসবাবহীন খোপ বিশেষ। আবদুল্লার সশস্ত্র প্রহরীর সর্বক্ষণ প্রহরার মধ্যে এই ক্ষুদ্র কক্ষে তিনি জীবনের শেষ কয়েক ঘণ্টা বন্দী ছিলেন।...

"যে খাটে ড. মুখোপাধ্যায়কে শুতে দেওয়া হয়েছিল তার কাঁচা কালো রং ড. মুখোপাধ্যায়ের হাতে লেগে যায়। তিনি জলে হাতটা সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ওই প্রতিষ্ঠানে—সেটা গৌরবে হাসপাতাল বা নার্সিংহোম যাইহোক—একটুকরো সাবানও পাওয়া যায়নি। রামদুলারি টিকু নামে একজন নার্স রুগির শুশ্রূষার জন্য নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর জবানবন্দিতে আমাদের সংবাদপ্রতিনিধিকে জানিয়েছেন যে ড. মুখোপাধ্যায় তাঁকে বলেন, তাঁর অ্যাটাচি কেসে একটি সাবান আছে, নার্স তখন অ্যাটাচি কেস খুলে সেই সাবানটি বের করে ড. মুখোপাধ্যায়ের হাতটা ধুইয়ে দেন।...

"রামদুলারি জানাচ্ছেন : মধ্যরাত্রে ড. মুখোপাধ্যায় মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর হয়ে একজন ডাক্তারকে খবর দিতে বলেছিলেন। কিন্তু সে সময় ওই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় সে বাড়িতে কোনও ডাক্তারই ছিলেন না। রামদুলারি দৌড়ে গিয়ে নূর আমেদ নামে এক ঝাড়ুদারকে ঘুম থেকে ডেকে তোলেন। তার মাধ্যমে নিকটবর্তী বাড়ি থেকে ডাঃ জুটসিকে ডেকে পাঠান। ডাঃ জুটসি ছুটে আসেন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে কী করণীয় বুঝে উঠতে পারেন না। (ডাঃ এন বি খারে, ডঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, ডঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী, ড. বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখের মতে শ্যামাপ্রসাদের হার্ট-অ্যাটাক হয়েছিল, কিন্তু ডাঃ আলি তাঁর ভুল চিকিৎসা করে বলেছিলেন : ড্রাই প্লুরিসি) তিনি কোন ঔষধপত্র বা ইঞ্জেকশন দিতে সাহস পেলেন না। ডেকে পাঠালেন মূল চিকিৎসক ডাঃ আলিকে। ইতিমধ্যে রোগীর অবস্থার

অবনতি ঘটে। নার্স বা ডক্টর জুটসি ছিলেন নীরব দর্শক।... ডাঃ আলি অকুস্থলে এসে পৌঁছাবার আগেই—রাত দুটো পঁচিশ মিনিটে হৃদরোগের আক্রমণে ভারতকেশরী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

"পরদিন সকালে মন্ত্রিদের মধ্যে কয়েকজন সংবাদ পেয়ে হাসপাতালে আসেন। কিন্তু শেখ আবদুল্লা অথবা তাঁর পাকিস্তানি-মনোভাবাপন্ন মন্ত্রী আফজল বেগ এই মৃত্যু-সংবাদ শুনেও অকুস্থলে আসেননি।

"এর পরেও কি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সন্তুষ্ট থাকবেন এই ফতোয়া জারি করে যে, আমাদের মহান নেতার জীবনরক্ষার জন্য কাশ্মীর সরকারের কর্তব্যে কোনও ঘাটতি হয়নি?"

পত্র ক্রমিক (১) প্রেরক : জওহরলাল নেহরু/প্রাপক : লেডি যোগমায়া মুখার্জি, প্রধানমন্ত্রীর পত্রসংখ্যা ৪৯৯, নয়া দিল্লি, ৩০.৬.১৯৫৩

'...শ্যামাপ্রসাদবাবুর মৃত্যু আমার কাছে আরও দুঃখের বিষয় এ-জন্য যে এটা ঘটল তাঁর বন্দিদশায়। প্রায় পাঁচ সপ্তাহ আগে আমি যখন কাশ্মীরে যাই তখন আমি বিশেষ করে তাঁকে কোথায় রাখা হয়েছে এবং তাঁর শরীর কেমন আছে সে বিষয়ে খোঁজ খবর নিয়েছিলাম। আমাকে জানানো হয়, তাঁকে কোনও কারাগারে না রেখে শ্রীনগরের বিখ্যাত ডাল লেকের ধারে একটি প্রাইভেট বাঙলোতে রাখা হয়েছে। আমি দেখলাম, কাশ্মীর সরকার তাঁকে যথাসম্ভব আরাম ও সুবিধা দেবার জন্য তৎপর এবং তাঁর স্বাস্থ্য ভাল আছে। আমি তখন এ খবর শুনে সন্তুষ্ট হই। আসলে আমি আশা করেছিলাম : কাশ্মীরের স্বাস্থ্যকর জল-হাওয়ায় শ্যামাবাবুর স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে পারে...

পত্র ক্রমিক (২) শ্যামাপ্রসাদ জননীর চিঠি প্রধানমন্ত্রীকে, তারিখ ৪.৭.১৯৫৩

'প্রিয় শ্রীনেহরু,

আপনার ত্রিশে জুন তারিখের চিঠি ড. বিধানচন্দ্র রায় আমার কাছে দোসরা জুলাই তারিখে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আপনার সান্ত্বনা ও সমবেদনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

আমার প্রিয় সন্তানের তিরোধানে সমস্ত ভারতবর্ষ আজ শোকময়। সে শহিদের মৃত্যু বরণ করেছে। আমি তার মা, আমার কাছে এই দুঃখ এত গভীর ও পবিত্র যে তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়। আমি আপনার কাছে কোন সান্ত্বনা লাভের প্রত্যাশায় এই চিঠিখানি লিখছি না। আপনার কাছে মৃতসন্তানের জননী হিসাবে যেটা আমার দাবি সেটা হচ্ছে : ন্যায় বিচার!

আমার পুত্র বন্দিদশায় মৃত্যুবরণ করেছে—যে বন্দিত্বের কোন বিচার হয়নি। আপনার চিঠিতে আপনি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, কাশ্মীর সরকারের পক্ষে যা যা করণীয় ছিল তা তারা করেছে। এই তথ্য আপনি কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন? নিশ্চিতভাবে তা কাশ্মীর সরকারের সরবরাহ করা তথ্যসূত্র—তাই নয়? আশ্চর্য! যাদের আসামীর কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়াবার কথা তাদের সরবরাহ করা তথ্যের কতটুকু মূল্য? আপনি আরও লিখেছেন আমার পুত্র যখন বিনাবিচারে বন্দি সেই সময় আপনি শ্রীনগরে গিয়েছিলেন; আরও লিখেছেন যে আমার পুত্রের প্রতি আপনার কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা-ভালবাসা ছিল। সে-ক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন : আপনি সেই বিনা বিচারে আটক বন্দির সঙ্গে দেখা করলেন না কেন? তার স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আহরণে আপনার বাধা কী ছিল? আপনি তো শ্রীনগরেই ছিলেন। তাহলে কেন পরের কথায় কান দিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীনগর থেকে ফিরে এলেন?

'অত্যন্ত রহস্যাবৃত তার মৃত্যু। আপনি সান্ত্বনা প্রসঙ্গ তুলেছেন, কিন্তু আপনি কি জানেন, তাকে বন্দি করার দীর্ঘ এগারো দিন পরে আমি—তার মা—কাশ্মীর সরকারের কাছ থেকে প্রথম যে পত্রটি পাই তাতে জানানো হয়েছে আমার পুত্র মৃত! আর কী নিষ্ঠুর, সংক্ষিপ্ত, অফিসিয়াল ভাষায় তথ্যটা মৃতপুত্রের জননীর কাছে পরিবেশিত হয়েছিল!

'আমার প্রশ্ন : সে যে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তাকে যে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেই সব তথ্য গোপন রাখা হল কেন? আমাকে না জানান, কাশ্মীর বা আপনার সরকার তা পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী

ডাক্তার বিধানচন্দ্রকে জানাতে পারল না কেন? কী বাধা ছিল?

এই পত্রে আমি আমার পুত্রের জন্য বিলাপ করতে বসিনি। স্বাধীন ভারতের এক নির্ভীক সন্তান বন্দী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। বিনা বিচারে, শোচনীয় ও রহস্যজনক অবস্থায়। সেই মহান প্রয়াত বীরের মা হিসাবে আমার একটিমাত্র দাবি : অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ এবং যোগ্যব্যক্তি দ্বারা গঠিত তদন্ত-কমিটি গঠন করুন। আমি জানতে চাই: এই মৃত্যুর পশ্চাৎপটে প্রকৃত কারণগুলি কী কী? আমি জানতে চাই : এ ঘটনায় আপনার সরকারের কী ভূমিকা ছিল?"

পত্র ক্রমিক (৩)

ব্যারিস্টার-জননীর ওই শো-কজ-মার্কা চিঠির জবাবে ভারতরত্ন জওহরলাল যে মিনমিনে জবাব দিয়েছিলেন এবার তার কিছু অংশ-বিশেষ শোনাই:

প্রিয় শ্রীমতী মুখার্জি,

আপনার চৌঠা জুলাইয়ের চিঠি...

ড. শ্যামাপ্রসাদের বন্দিদশা এবং তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে অনুসন্ধান না করে আমি আপনাকে লিখিনি। তার পরেও যাঁদের প্রকৃত ঘটনা জানার কিছু সুযোগ হয়েছিল তাঁদের কয়েকজনকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। আমি এইটুকু বলতে পারি যে, রহস্যের কিছু ছিল না। এবং ড. মুখার্জিকে যে সব রকম সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল সে বিষয়ে আমার পরিষ্কার ও যথার্থ (clear and honest) ধারণা জন্মেছে।...

পত্রক্রমিক (৪)

জওহরলালের এই পত্রের জবাব দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ জননী-তিনদিনের মধ্যেই

প্রিয় মি. নেহরু,

আপনার পাঁচই জুলাইয়ের চিঠি...

আপনার পত্রটি সমগ্র পরিস্থিতির এক দুর্বল ও দুঃখজনক ভাষ্য। আপনার এই মনোভাব রহস্যজালকে অনাবৃত না করে আরও ঘনীভূত

করে তুলেছে। আপনি কি আমার চিঠিখানি পড়েননি? আমি প্রকাশ্য তদন্ত চেয়েছিলাম—আপনার ব্যক্তিগত পরিষ্কার ও যথার্থ (clear and honest) ধারণা জানতে চাইনি।

এই মৃত্যু-সংক্রান্ত ঘটনাটির বিষয়ে আপনার মনোভাব এখন ভারতের জনগণকে এবং আমাকে—শ্যামাপ্রসাদের মাকে—বিশ্বাস করাতে হবে। বহু লোকের মনে নানা জাতের সন্দেহ দানা বেঁধেছে। তা থেকে আপনার সরকারকে মুক্ত হওয়ার জন্য একটিমাত্র পথ খোলা আছে। প্রকাশ্য ও অপক্ষপাত তদন্ত।

'আপনি আপনার চিঠিতে নিজের কারাগার ভোগের প্রসঙ্গ তুলেছেন। কিন্তু আপনি কারাভোগ করেছেন পরাধীন অবস্থায়, বিদেশি শাসনাধীনে। আর আমার পুত্রকে স্বাধীন ভারতীয় হিসাবে বিনা চিকিৎসায় বিনা বিচারে মৃত্যুবরণ করতে হল স্বাধীন স্বদেশী কারাগারে। এ দুইয়ের পার্থক্যটা আপনি বুঝতে না পারলেও নিরপেক্ষ তদন্তকারী ন্যায়াধীশ বুঝবেন। আমি তাঁকে বুঝিয়ে দেব।

আপনাকে আর বেশী কিছু লেখা নিরর্থক। আপনি ভয় পেয়েছেন, ভয় পাচ্ছেন; প্রকৃত সত্যের সম্মুখীন হতে। আমার পুত্রের মৃত্যুর জন্য আমি কাশ্মীর সরকারকে সরাসরি দায়ি করছি। তা ছাড়া আপনার সরকারকেও এই অপকর্মটির এক অংশীদার হিসেবে অভিযুক্ত করছি। আপনার হাতে অপরিসীম ক্ষমতা আছে। তার প্রয়োগে আপনি বেপরোয়া প্রচার চালাতে পারেন, কিন্তু 'সত্য' সূর্যের মতো স্বয়ম্প্রকাশ। যাবতীয় মিথ্যার মেঘ ছিন্ন করে একদিন তা প্রকাশিত হবেই। সেদিন আপনাকে ভারতবাসীর কাছে এবং পরে ঈশ্বরের কাছে মিথ্যাচারের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

আমি আমাদের এই পত্রবিনিময়ের এক সেট কপি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য প্রেরণ করছি। আমার অভিযোগ এবং আপনার কৈফিয়ৎ সম্বন্ধে দেশবাসীর অবহিত হওয়া প্রয়োজন। দেশের প্রধানমন্ত্রী যখন অকৃতকার্য হন, তখন সাধারণ ভারতবাসীই সত্যসন্ধান ও তার বিচার করুক।

যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিক।

ইতি
আপনার শোকমগ্না
যোগমায়া দেবী।

ভারতীয় কপিরাইট আইনে বলে : প্রেরকের বিনা অনুমতিতে প্রাপক কোন পত্র প্রেসকে পাঠাতে পারেন না। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সহধর্মিণী ও জননী এ তথ্যটা নিশ্চয় জানতেন। যেমন সে কথা জানতেন আইনপাস প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু ব্যারিস্টার-সাহেব নীরব রইলেন। শ্যামাপ্রসাদ-জননীর দৃপ্ত অভিযোগ এবং জওহরলালের পত্র সংসদপত্রে প্রকাশে আপত্তি করতে সাহসী হলেন না।

স্বর্গে ঈশ্বর তাঁর কী শাস্তি বিধান করেছিলেন জানা নেই; কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুটা যে হত্যা এটা মেনে নিল গোটা ভারতবর্ষ। শেখ আবদুল্লাকে জনতার আদালতে হত্যাকারী হিসাবে চিহ্নিত করল। এবং জওহরলালকে দোষী সাব্যস্ত করল—'এইডিং অ্যান্ড অ্যাবেটিং চার্জে।'

মহাত্মাজির হত্যা রহস্য গোপন করা, নেতাজির মিথ্যা-মৃত্যুকাহিনী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করার মতো এই কীর্তিটাও শাশ্বত হয়ে রইল ভারতরত্ন জওহরলালের জীবনেতিহাসে!

জন্মশতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাতে এসে তাই গোটা ভারত ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদের হত্যাকাণ্ডে আজও হাহাকার করে চলেছে।

না! গোটা ভারতবর্ষ নয়। কিছু বাঙালি রাজনীতি-ব্যবসায়ী ব্যতিরেকে।

শ্যামাপ্রসাদের জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন শাসকবৃন্দ এবং পার্টিনেতারা নাকি কেউ উপস্থিত ছিলেন না। দুর্ভাগ্যবশত আমি নিজেও সে সৌভাগ্য বঞ্চিত, কারণ সে-সময়ে আমি ছিলাম ভারতের বাইরে। ফলে প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে কিছু জানাতে পারছি না।

কিন্তু সেই মহাত্মার ১০৩ তম জন্মবার্ষিকীতে—ঘটনাচক্রে সেটাই ছিল তাঁর শহিদ হবার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ—উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ৬ জুলাই, ২০০৩ তারিখে। শ্যামাপ্রসাদ স্মারকসমিতি

মহা-আড়ম্বরে, কিন্তু বিনীত শ্রদ্ধাবনম্র পরিমণ্ডলে, কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এই জন্মজয়ন্তী পালন করল। সে সভায় অন্তত দশ-বারো হাজার বাঙালি ও অবাঙালি উপস্থিত ছিলেন। ভারতকেশরীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে। সভাপতিত্ব করেছিলেন ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শ্রীলালকৃষ্ণ আদবানিজী। পশ্চিমবঙ্গ ও গুজরাটের দুই রাজ্যপাল, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখরজী, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, সাত-আটজন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। এবারও পশ্চিমবঙ্গের শাসকবৃন্দ এবং পার্টিকর্তারা আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে অনুপস্থিত। স্মারক- সমিতি আয়োজন করেছিলেন চারজন বাঙালিকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে। একজন সঙ্গীতজ্ঞ, একজন সাহিত্যসেবী, একজন অভিনেতা এবং একজন ক্রীড়াবিদকে।

চতুর্থ ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে আদবানিজী তিনজনকে সম্মানিত করে ফিরে যান।

পরদিন, সাত তারিখের আনন্দবাজারের স্টাফ রিপোর্টার লিখলেন:

> "আমন্ত্রণ জানানো সত্ত্বেও উপ-প্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানির হাত থেকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সাম্মানিক-স্মারক নিতে নেতাজি ইন্ডোরে এলেন না ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। গায়ক অশীতিপর রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, লেখক বৃদ্ধ নারায়ণ সান্যাল বা অভিনেতা অসুস্থ তরুণকুমার যদি আসতে পারেন, তাহলে সৌরভ কেন এলেন না তা নিয়ে অনেক জল্পনা শুরু হয়েছে। বি.জে.পি.-র সূত্রে বলা হয়েছে, অসুস্থ থাকায় সৌরভ আসতে পারেননি। কিন্তু রাজনৈতিক মহলের খবর, সি.পি.এমের কেউ অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন না জেনেই সৌরভ আসেননি।
>
> মঞ্চ থেকে প্রত্যেকের নাম ঘোষণার সময় বলা হয় কিছুক্ষণের মধ্যেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় আসবেন। জনতা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে। সৌরভের জন্য পৃথক চেয়ারের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলেও সৌরভ আসেননি। সি. পি. এমের অনুষ্ঠানে, বিশেষত মুখ্যমন্ত্রী

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বা মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যের আমন্ত্রণে যে কোনও অনুষ্ঠানেই কিন্তু সৌরভ অবশ্যই উপস্থিত থাকেন।"

লাইভ-টেলিকাস্টে সমগ্র অনুষ্ঠানটি কলকাতা দূরদর্শন প্রচার করে।

সভাপতি তাঁর ভাষণে কী বলেছিলেন সে-কথা কলকাতা থেকে প্রকাশিত কোন সংবাদপত্রে পরদিন খুঁজে পাইনি। লক্ষ লক্ষ শ্রোতার শ্রুতিতে তা ধরা পড়েছে। সে ভাষণের একটি অনুচ্ছেদ, ইতিহাসের মুখ চেয়ে, এখানে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন মনে করছি। কারণ স্মরণে আছে সেই ল্যাটিন প্রবাদটি : Scripta manet, verba volant (লিখিত বক্তব্য স্থায়ী হয়, মুখের কথা হারিয়ে যায়)।

আদবানিজি তাঁর ভাষণে প্রসঙ্গক্রমে তাঁর নিজের জীবনের একটি অভিজ্ঞতার কথা বলেন। তিনি যেদিন প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদগ্রহণ করেন সেদিনই সন্ধ্যাবেলায় তিনি প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীজির একটি টেলিফোন বার্তা পান, "একটা অত্যন্ত দুঃসংবাদ আছে আদবানিজি! কেরালায় প্রখ্যাত কম্যুনিস্ট-নেতা ই.এম.এস. নাম্বুদ্রিপাদ ঘন্টাখানেক আগে প্রয়াত হয়েছেন। এক্ষেত্রে—আমার মনে হয়—সৌজন্যের নির্দেশে ক্যাবিনেট পর্যায়ের কোন পূর্ণমন্ত্রীর এখনি কেরালায় চলে যাওয়া প্রয়োজন। কাকে পাঠানো যায় বলুন?

আদবানি বলেছিলেন, নাম্বুদ্রিপাদ একজন সর্বভারতীয় নেতা। আমিই সেখানে যাব।

—আপনি? কিন্তু আপনি তো আজই কর্মভার বুঝে নিলেন! আপনার সময় কোথায়?

—তা হোক। এটাই সবচেয়ে বড় কর্তব্য।

আদবানিজি সেই রাত্রিতেই কেরালায় চলে যান। কমরেড নাম্বুদ্রিপাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত থেকে বি.জে.পি. সরকারের তরফে তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেন। লোকান্তরিত আত্মার শান্তিকামনায় প্রার্থনা করেন।

সভাপতি সক্ষোভে বলেছিলেন, কই আমরা তো সেদিন মনে রাখিনি ওই প্রয়াত দেশনেতা জীবনভর আমাদের শুধু বিরুদ্ধাচরণই করে গেছেন! তাহলে পশ্চিমবাংলার শাসক আর পার্টিনেতারা শ্যামাপ্রসাদের প্রয়াণের পঞ্চাশ বছর পরেও এটুকু সৌজন্য দেখাতে পারলেন না কেন?

প্রশ্নটি বোধহয় লা-জবাব! তাই পরদিন কলকাতার কোন সংবাদপত্রে এই খবরটা প্রকাশিত হতে দেখিনি।

আর ক্রিকেট? আটদশকের দুনিয়াদারী কালে অনেক অনেক টেস্ট ম্যাচ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। দেখেছি, সি.কে. নাইডু, লালা অমরনাথ, পাতিয়ালার মহারাজা এবং নবাব অব পাতৌদিকে ভারতের অধিনায়কত্ব করতে। তাঁরা অবশ্য কেউ রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, নজরুল, সুভাষ বা শ্যামাপ্রসাদের মাতৃভাষায় কথা বলতেন না। জানতেন শুধু ক্রিকেট খেলাটা।

সে-যুগে ক্রিকেট শব্দটার একটা আলাদা যোগরূঢ় মর্যাদা ছিল : ভদ্রতাবোধ, শালীনতা-জ্ঞান, ভব্যতা। কেউ অন্যায় করলে যদি বলা হত : 'দিস ইজ নট ক্রিকেট!'—তখন অপরাধী অধোবদন হত। এখন হয় না। এখন তারা উল্টে ধমক দেয় : 'অফকোর্স নট! ইট্‌স্ আ পাপেট শো, য়ু নো!—আ শো-পীস অ্যারেঞ্জড্ বাই বিজনেস-টাইকুন্‌স্ ফর দেয়ার ঔন প্রফিট! দ্য প্লেয়ার্স আর বাট ডান্সিং স্ট্রিং-ম্যারিওনেটস্। [নিশ্চয় নয়। এটা ধনকুবেরদের ব্যবস্থাপনায় একটা লাভজনক 'ব্যাওসা'! ক্রিকেট তো আর খেলা নেই, এখন ওটা পুতুল নাচ—'যেমন নাচাও তেমনি নাচি!']

আমি আশাবাদী। তাই বিশ্বাস রাখি : নিষ্প্রভাত রাত্রি হয় না। পশ্চিমদিগন্তে ঢলে পড়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আশা রাখব—পূর্বদিগন্ত আবার রাঙা হয়ে উঠবে একদিন। বাঙালি মরে—তেতাল্লিশের মন্বন্তরে মরেছে, ছেচল্লিশের দাঙ্গায় মরেছে, সাতচল্লিশের দেশভাগে মরেছে, সত্তর-একাত্তরের ডামাডোলে মরেছে! জৈবিক নিয়মে। ওরা মরবেই!

কিন্তু বাঙালিয়ানার মৃত্যু নেই।

Chandi